جاء الحق وزهق الباطل

(সত্যের আবির্ভাবে বাতিল তিরোহিত)

জা'আল হক

(প্রথমাংশ)

মূল

হযরাতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

অনুবাদ

(শাহযাদা) মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আলম

ও

মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা

জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা,

চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায় ঃ আরিফুর রহমান নিশান
নিশান প্রকাশনী
শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ	ঃ	৩০শে সেপ্টেম্বর	১৯৮৮ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	২৫শে মে,	১৯৯০ ইং
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	২৩ শে সেপ্টেম্বর	১৯৯৩ ইং
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	২৯শে জুলাই	১৯৯৯ ইং
পুণঃ মুদ্রণ	ঃ	৪ঠা সেপ্টেম্বর	২০০১ ইং
পুণঃ মুদ্রণ	ঃ	১৫ই ফেব্রুয়ারী	২০০৬ ইং

হাদিয়া ঃ ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা

শব্দ বিন্যাস ঃ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান
এনাসম্ কমিপউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

ফিত্না ফ্যাসাদের এ যুগসন্ধিক্ষণে ঈমান-আকীদা নিয়ে টিকে থাকা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতিল দলের ব্যাপক তৎপরতার ফলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভেদাভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায় জায়গায় নানা মতাদর্শ জনিত বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে। মাঝে মাঝে কোন কোন মহল থেকে এ ভেদাভেদ ভুলে একই পতাকাতলে জমায়েত হবার আহবানও জানানো হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, কেউ এসব দল উপদলের অভ্যুদয় ও ভেদাভেদের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করেন না। আবার কেউ এগুলোকে নিছক মামুলী ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেন। যার ফলে আজ পর্যন্ত এর কোন সুরাহা হলোনা। হাকীমুল উম্মত হযরাতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেব (রহঃ) ইসলাম ধর্মের প্রধান বিতর্কিত বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করে উর্দুভাষায় একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, যার নামকরণ করেন "জা'আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল" (সত্যের আবির্ভাবে বাতিল তিরোহিত)। এতে ধর্মীয় মতানৈক্য বিষয়সমূহের চূড়ান্ত ফায়সালা কুরআন হাদীছের আলোকে ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি দ্বারা সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। যে কেউ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিতাবটি একবার অধ্যয়ন করলে মতভেদের মূল কারণগুলো খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন এবং গলদ কোথায় তা অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

আকীদা হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি। আকীদার ব্যাপারে আপোষের কোন প্রশ্নই আসেনা। সঠিক আকীদা গ্রহণ করার আর বাতিল আকীদা পরিহার করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে পাপ হতে পারে, কিন্তু আকীদার ব্যাপারে ভিন্নমত

পোষণ করলে খোদাদ্রোহী ও ঈমান হারা হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। হযরাতুল আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেব রচিত এ গ্রন্থটি যুগোপযোগী অনন্য এক সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে ভ্রান্ত আকীদার খোলস উম্মোচন করে বিশুদ্ধ আকীদার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত এ কিতাবটি কয়েকটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেকেই উর্দুভাষা পড়তে ও বুঝতে সক্ষম ছিলেন বিধায় আগে কেউ এ কিতাবটির বঙ্গানুবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কালের আবর্তনে ইদানীং উর্দুভাষার চর্চা ও অনুশীলনের পথ রূদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থেই আমরা কিতাবটির বঙ্গানুবাদে হাত দিয়েছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাকে মার্জিত, সহজবোধ্য ও মূল বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুটিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমরা একেবারে শাব্দিক অনুবাদও করিনি, যাতে পাঠকদের কাছে বিরক্তকর হয়। আবার এতটা স্বাধীন অনুবাদও করিনি, যা মুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমরা প্রধানতঃ মুরাদাবাদ (ভারত) থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত মূল গ্রন্থ অবলম্বনেই বাংলায় অনুবাদ করেছি। খোদার লাখো শুকরীয়া, বইটি পাঠক সমাজের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এ পর্যন্ত চারবার সংস্করণ করা হয়েছে, পুনঃমুদ্রিত হয়েছে অনেকবার। প্রত্যেক বার ভুলক্রুটি মুক্ত করার জন্য যথাযত চেষ্টা করেছি। এরপরও একেবারে নির্ভুল বলে দাবী করতে পারি না। আশা করি সুধী পাঠকবৃন্দ শাব্দিক ভুলক্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, তবে তথ্যগত কোন ভুলক্রুটি ধরা পড়লে অবহিত করে বাধিত করবেন যেন পরবর্তী সংস্করণে শোধরিয়ে নিতে পারি।

—অনুবাদক

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
❑ ভূমিকা	
➧ সমস্ত ফিত্নার মধ্যে ওহাবী-নজদীদের ফিত্না সর্বাধিক-বিপজ্জনক	১
মুসলমানদের উপর বিশেষ করে হেরেমাইন শরীফাইনে বসবাস	
➧ কারীদের উপর অত্যাচার	৪
➧ লা-মাযহাবী ও দেওবন্দীদের মধ্যে পার্থক্য	৬
➧ 'জা'আল হক' নামকরণের তাৎপর্য	৯
❑ পেশ কালাম	১০
➧ তাফসীর, তাবীল ও তাহরীফের মধ্যে পার্থক্য	১০
➧ মনগড়া তাফসীর হারাম, তাফসীরের স্তর বর্ণনা	১১
❑ তাকলীদের বর্ণনা	১৭
➧ তাকলীদের অর্থ ও প্রকার ভেদ	১৭
➧ কোন্ ধরণের মাসাইলে তাকলীদ করা হয়	২০
➧ তাকলীদ কার জন্য ওয়াজিব আর কার জন্যে ওয়াজিব নয়	২৩
➧ মুজতাহিদের ছয়টি শ্রেণী ও তাদের পরিচয়	২৪
➧ তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার দলিলাদির বিবরণ	২৭
➧ ব্যক্তিগত তাকলীদের বর্ণনা	৩৫
➧ তাকলীদ সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ এবং উহাদের উত্তর	৪০
➧ পরিশিষ্টঃ কিয়াস সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা	৫১
❑ ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞানের বর্ণনা	৫৬
➧ 'গায়ব' এর সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদের বর্ণনা	৫৬
➧ প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় উপকারী বিষয় সমূহের বর্ণনা	৫৯
➧ ইলমে গায়ব সম্পর্কিত আকীদা ও ইলমে গায়বের বিবিধ পর্যায়ের বর্ণনা	৬১
➧ ইলমে গায়বের প্রমাণ সম্বলিত বর্ণনা	৬৪
➧ কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রমাণ	৬৪

- ইলমে গায়ব সম্পর্কিত হাদীছ সমূহের বর্ণনা — ১০১
- ইলমে গায়ব সম্পর্কে হাদীছ ব্যাখ্যাকারীদের উক্তি সমূহের বর্ণনা — ১১০
- ইলমে গায়ব সম্পর্কে বিশিষ্ট ওলামায়ে উম্মতের অভিমত — ১১৪
- বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের ভাষ্য থেকে ইলমে গায়বের সমর্থন — ১২৫
- ইলমে গায়বের সমর্থনে যুক্তি নির্ভর প্রমাণ সমূহ ও আওলিয়া কিরামের ইলমে গায়বের বর্ণনা — ১২৭
- অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিবরণ — ১৩৬
- প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াতের বিবরণ — ১৩৮
- অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের অস্বীকৃতি সূচক হাদীছ সমূহের বর্ণনা — ১৯০
- ইলমে গায়বের বিপক্ষে ফকীহগণের বিবিধ উদ্ধৃতির বিবরণ — ২০৮
- ইলমে গায়ব সম্পর্কে উত্থাপিত যুক্তি নির্ভর আপত্তি সমূহের বিবরণ — ২১২

হাযির -নাযির এর আলোচনা — ২১৮
- হাযির -নাযির সম্পর্কিত বিষয়ের প্রামান্য বিবরণ — ২১৯
- কুরআনের আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণ — ২১৯
- হাযির-নাযির বিষয়ক হাদীছ সমূহের বর্ণনা — ২২৮
- ফকীহ ও ওলামায়ে উম্মতের উক্তিসমূহ থেকে 'হাযির-নাযির' এর প্রমাণ — ২৩৫
- ভিন্নমতাবলম্বীদের রচিত পুস্তকসমূহ থেকে 'হাযির-নাযির' এর প্রমাণ — ২৪৮
- হাযির-নাযির সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের বিবরণ — ২৫৬

হুযুর (দঃ) কে মানুষ কিংবা ভাই বলে আখ্যায়িত করা সম্পর্কে আলোচনা — ২৭৩
- হুযুর পুর নুর (দঃ) এর মানব হওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিবরণ — ২৮০

'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে আহবান করা বা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' শীর্ষক শ্লোগান প্রসঙ্গে আলোচনা — ২৯৪
- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিবরণ — ৩০০
- আল্লাহর ওলী ও নবীগণ থেকে সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গে আলোচনা — ৩১১
- খোদা ভিন্ন অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনার স্বীকৃতসূচক প্রমাণ সমূহ — ৩১১
- আল্লাহর ওলীগণ থেকে সাহায্য প্রার্থনার স্বীকৃতিসূচক যুক্তি সঙ্গত প্রমাণাদি ৩৩০
- আল্লাহর ওলীগণের কাছ হতে সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিবরণ — ৩৩৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ اَجْمَلِ الْاَجْمَلِيْنَ اَكْمَلِ الْاَكْمَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

ভূমিকা

প্রায় পৌনে চৌদ্দশ' বছর গত হলো ইসলাম ধর্ম এ পৃথিবীতে এসেছে। এর মধ্যে অনেক বিপদাপদের মুকাবেলা করতে হয়েছে এ পবিত্র ধর্মকে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সুশোভিত এ উদ্যানের উপর দিয়ে অনেক প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফান বয়ে গেছে। কিন্তু খোদার লাখো শুকরিয়া যে, এ বাগান পূর্ববৎ সজীব ও প্রাণবন্ত রয়েছে। ইসলাম-রবি বার বার কালো মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছে, কিন্তু এ সূর্য পূর্ববৎ আলোক উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত রয়ে গেছে। উজ্জ্বল থাকবে না বা কেন? আল্লাহ স্বয়ং এ ধর্মের হিফাজতকারী ও সাহায্যকারী। আল্লাহ পাক ফরমানঃ-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

(আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এটির হিফাযতকারী।)

এ ধর্ম কখনো কুখ্যাত ইয়াযীদের শাসনামলে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে, কখনও হাজ্জাজের আমলের নির্যাতনে ধূলিধুসরিত হয়েছে, কখনো খলীফা মামুনের আমলে বাতিলপন্থীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে, আবার কখনো তাতারীগণ বীর-বিক্রমে এর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, কখনও খারেজীগণ এর মুকাবেলা করেছে, রাফেজীরাও একে সমূলে বিনাশ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু এটি এমনই এক পাহাড়, যার সম্মুখে কোন শক্তিই টিকে থাকতে পারেনি। এটা যেমনি ছিল তেমনি মজবুত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা একে স্থির ও অটল রাখুন।

এ সমস্ত ফিতনা ও হুমকী সমূহের মধ্যে ওহাবী নজদীদের ফিতনা ছিল সর্বাধিক বিপজ্জনক। এ ব্যাপারে আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রথম থেকেই সতর্ক করে গেছেন, নানাভাবে মুসলমানদেরকে সজাগ করে দিয়েছেন। মিশকাত শরীফের ২য় খণ্ডের 'ইয়ামন ও শামের বর্ণনা' অধ্যায়ে বুখারী

শরীফের বরাত দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত "একদিন দয়ার সাগর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হাত তুলে আল্লাহর দরবারে দু'আ করছিলেন- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا হে আল্লাহ! আ-মাদের শাম প্রদেশে বরকত দাও) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا (হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামন প্রদেশে বরকত দাও)। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নজদের জন্য দু'আ করুন। পুনরায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দু'আ করলেন, শাম ও ইয়ামনের নাম উল্লেখ করলেন কিন্তু নজদের নাম নিলেন না। পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নজদের জন্য দু'আ করার অনুরোধ করার পরেও হুযুর শাম ও ইয়ামনের জন্য উপর্যুপরি ৩ বার দু'আ করলেন কিন্তু বারংবার নজদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্বেও নজদের জন্য দু'আ করলেন না। বরং শেষে বললেন,

هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطٰنِ

যে অঞ্চল সৃষ্টির আদিকালেই আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত, সে ভুখণ্ডের জন্য দু'আ কিভাবে করি? ওখানেই ইসলামের ভিত্‌কে নাড়াদানকারী ভূমিকম্প ও ফিত্‌না আরম্ভ হবে, ওখানেই শয়তানী দলের আবির্ভাব ঘটবে।" এ থেকে বোঝা গেল হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র দৃষ্টিতে (পথভ্রষ্ট ও ঈমান নষ্ট করার দিক থেকে) দাজ্জালের ফিতনার পরে ছিল নজদের ফিত্‌নার স্থান, যার সম্পর্কে তিনি এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন।

অনুরূপ, মিশকাত শরীফের ১ম খণ্ডের কিসাস শীর্ষক আলোচনায় "মুরতাদদের (ধর্মদ্রোহীদের) হত্যা" অধ্যায়ে নাসায়ী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু বরযা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু গণীমতের মাল বণ্টন করছিলেন, তখন পেছন থেকে একজন লোক বললেন- হে মুহাম্মদ! আপনি ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টন করেননি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমার পরে আমার থেকে বেশী কোন ইনসাফকারী ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। তারপর বললেন,শেষ যামানায় এর বংশ থেকে একটি গোত্রের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু

কুরআন তাদের কণ্ঠদেশের নিচে পৌছবে না। অধিকন্তু, তারা ইসলাম থেকে এম-নিভাবে দূরে সরে যাবে, যেমনি করে তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারপর বললেনঃ-

سِيْمَا هُمُ التَّحْلِيْقُ لَا يَزَالُوْنَ يَخْرُجُوْنَ حَتّٰى يَخْرُجَ اٰخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَّالِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ.

(মাথামুণ্ডানো হলো এদের বিশেষ চিহ্ন; এদের একের পর এক বের হতেই থাক্‌বে। শেষ পর্যন্ত এদের শেষ দলটি দাজ্জালের সংগে মিলিত হবে। যদি তোমরা তাদের সাক্ষাত পাও, জেনে রেখো, তারা হলো সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচে নৃশংস।) এ হাদীছের মধ্যে এদের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। মাথামুণ্ডানো ছাড়া এখনও কোন ওহাবীকে পাওয়া মুশকিল। অন্য জায়গায় তিনি আরও বললেন, তারা মুর্তি পুজারীদেরকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। (বুখারী শরীফঃ ১ম খণ্ড, কিতাবুল আম্বিয়া, ইয়াজুজ মাজুজের কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত বর্ণনা; মুসলিম শরীফ ও মিশকাত শরীফঃ আল-মুজিযাত-অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন) উক্ত জায়গায় মিশকাত শরীফে আরও উল্লেখিত আছেঃ-

لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَ قْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"যদি আমি তাদেরকে পেতাম, 'আদ' গোত্রের মত হত্যা করতাম।' এখনও দেখা যায় যে দেওবন্দীরা সাধারণভাবে হিন্দুদের সাথে বেশী সংশ্রব রাখে, মুসলমানদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা সবসময় মুসলমানদের উপর বিশেষ করে হেরমাইন শরীফাইনের অধিবাসীদের ইযযত, আবরুর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন।

উপরোক্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দ্বাদশ হিজরীতে নজদে মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওহাবের জন্ম হয়। তিনি আহলে হেরমাইন ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর কি ধরনের অত্যাচার করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে "সায়ফুল জব্বার" ও "বোয়ারেকে মুহাম্মদীয়া আলা ইরগামাতিন নজদিয়াহ" ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থাবলী দেখুন। তাদের অত্যাচার নিপীড়নের কিঞ্চিত বর্ণনা আল্লামা শামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব রদ্দুল মুখতার এর ৩য় খণ্ডে বাবুল বুগাতের শুরুতে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ-

كَمَا وَقَعَ فِىْ زَمَانِنَا فِىْ اَتْبَاعِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ نَّجْدٍ وَّتَغَلَّبُوْا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوْا يَنْتَحِلُوْنَ اِلَى الْحَنَابِلَةِ لٰكِنْ هُمْ اعْتَقَدُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَنَّ مَنْ خَالَفَ اِعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَاسْتَبَاحُوْا بِذٰلِكَ قَتْلَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَاءِ هِمْ حَتّٰى كَسَرَ اللّٰهُ شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ وَظَفَرَ بِهِمْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَ ثُلُثٍ وَّثَلٰثِيْنَ وَمِائَتَيْنِ وَاَلْفٍ.

(যেমন আমাদের সময়ে সংঘটিত আবদুল ওহাবের অনুসারীদের লোমহর্ষক ঘটনা প্রবাহ প্রণিধানযোগ্য। তারা নজদ থেকে বের হয়ে মক্কা-মদীনার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী মায্হাবের অনুসারী বলে দাবী করতো। আসলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারাই শুধু মুসলমান আর বাকী সব মুশরিক। এজন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের হত্যা করা জায়েয মনে করেছে এবং এদের অনেক আলেমকে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতাআলা তাদের অহংকার চূর্ণ করে তাদের শহরগুলোকে বিরান করে দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী সেনাবাহিনীকে জয়যুক্ত করেছেন। এ লোমহর্ষক ঘটনাটি ১২৩৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

'সায়ফুল জব্বার' ও অন্যান্য কিতাবে তাদের অত্যাচারের অগণিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে-তারা পবিত্র মক্কা-মদীনার নিরীহ লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে; হেরমাইন শরীফাইনে বসবাসকারী স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করেছে; পুরুষদেরকে দাস আর নারীদেরকে দাসীতে পরিণত করেছে। সৈয়দ বংশের অনেককে হত্যা করেছে; এমনকি মসজিদে-নব বীর সমস্ত ঝাড়-লণ্ঠন ও গালীচা উঠিয়ে নজদে নিয়ে যায়, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের কবর সমূহ ভেঙ্গে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে; এমন কি, যে পবিত্র রওযা শরীফকে কেন্দ্র করে প্রতি দিন সকাল-সন্ধ্যায় ফিরিশতাগণ সালাত ও সালাম পাঠ করেন, সেটাও ধরাশায়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু যেই লোকটি সেই অসৎ উদ্দেশ্যে রওযা পাকের কাছে গিয়েছিল, আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োজিত একটি সাপের কামড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আল্লাহ তাআলাই তাঁর হাবীবের শেষ বিশ্রামস্থলকে ওদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন।

মোট কথা, ওদের অত্যাচার-নিপীড়ন ছিল সীমাহীন পীড়াদায়ক। যার বর্ণনা করতে গেলে হৃদয় ব্যথিত হয়ে যায়। কুখ্যাত ইয়াযীদ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পরিবারবর্গের সঙ্গে শত্রুতা করেছে তঁদের জীবদ্দশায়, কিন্তু তাঁদের ইন্তেকালের ১৩০০ বছর পরেও ওহাবীদের হাতে সাহাবায়ে কেরাম ও মহমান্য আহলে বাইত (রাদিআল্লাহু আনহুম) লাঞ্ছিত হয়েছেন কবরের মধ্যে। ইবনে সাউদ হেরমাইন শরীফাইনে যে ন্যাক্কারজনক বীভৎস কাণ্ড করেছেন, তা এখনও প্রত্যেক হাজীর চোখে ধরা পড়ে। পবিত্র মক্কা নগরীতে আমি নিজেই স্বচক্ষে দেখেছি যে, কোথাও কোন সাহাবীর পবিত্র কবরের চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্দেশ্য, কেহ যেন ফাতিহা পাঠ করার সুযোগ না পায়। যে স্থানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সে পবিত্র জায়গায় একটি তাবু খাটানো দেখেছি, যেখানে কুকুর ও গাধার অবাধ আনাগোনা চলছে। আগে এখানে একটি গুম্বদ বিশিষ্ট ঘর নির্মিত ছিল, যেখানে গিয়ে মানুষ নামায পড়তো, যিয়ারত করতো। এটিই ছিল আমেনা বিবির ঘর। এ ঘরেই ইসলাম রবি আলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু আজ সে পবিত্র জায়গার এহেন বে'ইযযতী ও অবমাননা হচ্ছে। আল্লাহর কাছেই এর অভিযোগ রইল।

এতো গেল আরবের ঘটনাবলী। হিন্দুস্থান সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা দরকার। দিল্লী শহরে মওলবী ইসমাইল নামে একজন লোক জন্ম গ্রহণ করে। তিনি মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওহাব নজদী প্রণীত "কিতাবুত তাওহীদ" এর উর্দু ভাষায় খোলাসা করে অনুবাদ করে ও "তাকবিয়াতুল ঈমান" নামে প্রকাশ করে হিন্দুস্থানে এর ব্যাপক প্রচারের আয়োজন করে। এ তাকবিয়াতুল ঈমান প্রকাশ করার কারণে তিনি সীমান্তের পাঠানদের হাতে নিহত হয়। তাই ওহাবীগণ তাকে শহীদ বলে গণ্য করে শিখদের হাতে নিহত হন বলে প্রচারণা চালায়। ("আনোয়ারে আফতাবে ছাদাকত" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) আলা হযরত (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ঠিকই বলেছেনঃ-

وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید وذبیح کا

وہ شہید لیلۓ نجد تھا وہ ذبیح تیغ خیارہے

অর্থাৎ ওহাবীরা যাকে 'শহীদ বা জবীহ' বলে আখ্যায়িত করেছে, আসলে তিনি নজদের 'লায়লী'র প্রেমে বিভোর হয়ে ধার্মিকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। যদি (তাদের কথামত) শিখেরাই নিহত করতো তাহলে অমৃতসর বা পূর্ব পাঞ্জাবের কোন শহরে তিনি মারা যেত। কেননা, পূর্ব পাঞ্জাবই হলো শিখদের কেন্দ্র। সীমান্ত

তো পাঠানদের এলাকা, সেখানেই তিনি মারা যায়। অতএব বোঝা গেল, তিনি মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। তার মৃত দেহও উধাও করে ফেলা হয়েছিল। এ জন্য কোথাও তার কোন কবর নেই।

মওলবী ইসমাইলের ভক্ত-অনুসারীবৃন্দ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল মাযহাবী ইমামদের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। এরা লা-মায্হাবী হিসেবে পরিচিত। অপরদল মুসলমানদের ঘৃণা থেকে বাঁচার জন্যে নিজেদেরকে হানাফী বলে দাবী করে, আমাদেরই মত নামায-রোযা পালন করে। তারাই গোলাবী ওহাবী বা দেওবন্দী হিসেবে পরিচিত। আকা মাওলা হযরত মাহবুবে কিবরিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মুজিযা দেখুন; তিনি বলেছিলেন, "সেখান থেকে শয়তানী দলের আবির্ভাব ঘটবে", قَرْنُ الشَّيْطَانِ (করনুশ শয়তান) এর উর্দ্দু অনুবাদ হচ্ছে-'দেও বন্দ'। 'দেও' অর্থ শয়তান আর 'বন্দ' অর্থ দল বা অনুসারী। কিংবা 'দেওবন্দ' শব্দ দ্বয়ের মধ্যে সম্পর্কে হচ্ছে اضافت مقلوبی। (ইযাফতে মকলুবী'র) অর্থাৎ দেওবন্দ শব্দটি 'বন্দেদেও শব্দ হতে গঠিত, যার অর্থ হচ্ছে-শয়তানের দল বা স্থান। এ উভয় দলের ধর্মীয় কাজ-কর্ম ও আচার আচরণে বাহ্যিকভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও তাদের আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করে এবং তার আকীদারই পৃষ্ঠপোষক। বস্তুতঃ দেওবন্দীদের মুরব্বী মওলবী রশীদ আহমদ সাহেব গানগুহী তাঁর 'ফতুয়ায়ে রশীদিয়া' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের তাকলীদ শীর্ষক আলোচনার ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীদের ওহাবী বলা হয়। তাঁর আকীদা ভাল ছিল। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য তিনি উগ্র মেযাজের লোক ছিলেন। তবে হ্যাঁ, যারা সীমা অতিক্রম করেছে, তারা ফিত্না ফ্যাসাদের শিকার হয়েছে। তাদের সবার আকীদা ছিল অভিন্ন। শুধু আমলের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কেউ ছিল হানাফী, কেউ শাফিঈ কেউ বা মালেকী আর কেউ হাম্বলী"। (রশীদ আহমদ)

বর্তমান যুগে লা-মাযহাবী ওহাবীদের তুলনায় দেওবন্দীরা অপেক্ষাকৃত বিপজ্জনক। কেননা সাধারণ মুসলমান তাদেরকে সহজে চিনতে পারে না। তাঁরা তাদের রচিত কিতাব সমূহে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শানে যে ধরনের বে-আদবী করেছে, তা' করতে কোন মুশরিকও কখনও সাহস পাবে না। এর পরেও এরা নিজেদেরকে মুসলমানের কাণ্ডারী ও ইসলামের একমাত্র এজেন্ট বলে দাবী করে থাকে।

মওলবী আশরাফ আলী সাহেব থানভী তাঁর 'হিফজুল ঈমান' নামক কিতাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞানকে পশুদের জ্ঞানের মত বলেছেন; মওলবী খলিল আহমদ সাহেব আমবেটী তাঁর 'বরাহিনে কাতেয়া' কিতাবে শয়তান ও হযরত আযরাইল (আলাইহিস্ সালাম) এর জ্ঞান হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞানের তুলনায় বেশী বলে মত প্রকাশ করেছেন। মওলবী ইসমাইল সাহেব দেহলবী তাঁর 'তাকবিয়াতুল ঈমান, কিতাবে নামাজের মধ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খেয়াল আসাটা গাধা-গরুর খেয়াল আসা অপেক্ষা খারাপ বলেছে। মওলবী কাসেম সাহেব নানুতবী 'তাহযিরুন নাস' কিতাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে শেষ নবী হিসাবে স্বীকার করেনি। তাঁর কথা হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পরে কোন নবী এসে গেলেও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব পড়বে না। (তাঁর মতে) খাতেম অর্থ আসল নবী এবং অন্যান্য নবীগণ হচ্ছেন আরেযী- (মূখ্য নবীর ভূমিকা অনুসরণকারী নবী)। মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ঠিক এ কথাই বলেছে- আমি আরেযী নবী। মির্জা গোলাম আহমদকে এ ক্ষেত্রে মওলভী রশীদ আহমদ সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

এসব মওলভীদের কাছে তাওহীদ হচ্ছে নবীগণহেয় প্রতিপন্ন করা, যেমন রাফেজীগণ হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) এর প্রতি ভালবাসা বলতে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এর প্রতি শত্রুতা পোষণ মনে করে থাকে। বস্তুতঃ এ তাওহীদ হলো শয়তানী তাওহীদ। শয়তান আদম (আলাইহিস সালাম) কে সম্মান করতে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে মাথা নত করেনি সে। এর পরিণাম কি হয়েছে, সকলেই জানেন। প্রত্যেকে لاحول (লা-হাওলা) বলে একে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে থাকে। ইসলামী তাওহীদ হলো আল্লাহকে এক স্বীকার করা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ইয্যত ও সম্মান করা। এ তাওহীদের শিক্ষা হচ্ছেঃ-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه উক্ত কলেমার প্রথমাংশে আল্লাহর একত্বের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে শানে মুস্তাফা প্রকাশ করা হয়েছে।

আজকাল প্রত্যেক জায়গায় মুসলিম জাতির মধ্যে বিশেষতঃ দেওবন্দী ও সুন্নীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগেই আছে। কোন জায়গায় ভাল কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, কোন জায়গায় অদৃশ্য জ্ঞান নিয়ে আলোচনা সমালোচনা; কোন জায়গায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর হাযির নাযির হওয়া সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা;

আবার কোন ক্ষেত্রে মীলাদ মাহফিল ও ফাতিহা সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক; কোন কোন ক্ষেত্রে আওলিয়া কেরামের মাযারের উপর গুম্বদ তৈরী করা সম্পর্কে মুনাজিরা। যদিও উল্লেখিত প্রত্যেক বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের উচ্চমানের কিতাবাদি রয়েছে, যেমন তাকলীদ সম্পর্কে মাওলানা ইরশাদ হোসাইনের ইনতিসারুল হক,'ইল্‌মে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে আমার উস্তাদ ও মুরশিদ সদরুল আফাজেল আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন সাহেব মুরাদাবাদীর 'আল কালিমাতুল উল্‌ইয়া', ফাতিহা যিয়ারত ইত্যাদি সম্পর্কে মাওলানা আবদুস সমিহ বে-দীল রামপুরীর 'আনোয়ারে সাতেয়া', এবং হাযির নাযির, উরস,যিয়ারত ইত্যাদি সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীর মুজদ্দিদ আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব বেরলভী (রহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর গ্রন্থাবলী। তথাপি আমার ইচ্ছে হলো এমন একটি কিতাব লিখতে, যেখানে আলোচ্য যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত করা হবে। যা'র হাতে এ কিতাবটি থাকবে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে বিরোদ্ধাচারণকারীর মুকাবিলা করতে পারবেন, ওদের খপ্পর থেকে মুসলমানদের আকীদা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। একমাত্র এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে এ কিতাবটি রচনায় হাত দিয়েছি।

স্বীয় স্বল্প জ্ঞান ও আর্থিক অসঙ্গতির সম্যক ধারণা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ প্রণয়নের সাহস করলাম। প্রারম্ভ আমার কাজ, ইহার পরিপূর্ণ রূপদান আমার মহাপ্রভুর দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমি আমার সম্মানিত বন্ধু জনাব মুন্সী আহামদ দ্বীন সাহেব, সেক্রেটারী আঞ্জুমানে খুদ্দাআমুস সুফীয়া, গুজরাট এর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে এ কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দান করে এ কিতাব ছাপানোর সুব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি ও ঈমানে বরকত দান করুক।

এ কিতাবে উপরোল্লিখিত প্রত্যেক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। তবুও যারা আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চান, তা'রা ইলমে গায়ব সম্পর্কে আল কালিমাতুল উল্‌ইয়া' নামক গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। এ বিষয়ে এ ধরনের গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এ ছাড়া অপরাপর বিষয়েও আ'লা হযরত বেরলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করতে পারেন।

এ কিতাব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

এ কিতাবে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছেঃ

- আপন বক্তব্যের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ;
- বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন-হাদীছ, বুযুর্গানেদ্বীন, হাদীছ বিশারদ ও তাফসীরকারীদের উক্তি থেকে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করন;
- বিরুদ্ধমতালম্বীদের কিতাব সমূহ থেকে বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন;
- কুরআন-হাদীছ ও ফিকহ-শাস্ত্রবিদদের উক্তি হতে বিরুদ্ধাচারণ কারীদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের আলোচনা;
- কুরআন-হাদীছ ও উলামায়ে কেরামের উক্তির আলোকে আপত্তিসমূহের জবাব দান;
- নিজ বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদান;
- বিরোধিতাকারীদের যুক্তির নিরিখে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ;
- সে সমস্ত আপত্তির যুক্তিসংগত উত্তর।

এ কিতাবে আরও একটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যে কোন উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সময় যতটুকু সম্ভব সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়েছে। পৃষ্ঠার পরিবর্তন হতে পারে, তাই পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়নি। আর তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় পারা, সুরা ও আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠকবর্গ যদি একটু মনোযোগ সহকারে কিতাবটি অধ্যায়ন করে ন, তবে ইন্‌শাআল্লাহ তা'আলা তাঁদের নিকট এ গ্রন্থটি জ্ঞানের সাগর বলে মনে হবে এবং এ থেকে অনেক মুল্যবান মণিমুক্তা আহরণ করতে পারবেন। অত্র গ্রন্থকে কঠিন শব্দ প্রয়োগ ও বিরক্তিকর, অযৌক্তিক বর্ণনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আশা করি, বিজ্ঞ সুধী সমাজ সত্যকে গ্রহণ ও ভ্রান্তকে পরিহার করতে পারবেন। এতেই দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে,

وَمَا تَوْفِيقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ.

(আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ছাড়া আমার কিছু সাধ্য নেই, তাঁর উপরই আমি নির্ভর করছি ও তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি)

হযরত কিবলায়ে আলম, আমীরে মিল্লাত, শায়খুল মাশায়িখ, কুতুবে যামান আলেমে রব্বানী, পীর সৈয়দ জমায়াত আলী শাহ সাহেব, মুহাদ্দিছ আলীপুরী (দামত বরকাতুহুমুল কুদসিয়াহ) এ কিতাবের নাম জা'আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল' রাখার প্রস্তাব দেন। আমি অতি গর্ব ভরে এ নামেই কিতবের নামকরণ করেছি। আশা করি, আল্লাহ পাক এ নামের সার্থকতা বজায় রেখে, স্বীয় অনুগ্রহে একে আমার গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করবেন ও ঈমান সহকারে জীবনাবসান করাবেন। আমীন!

পেশ কালাম

যেহেতু এ কিতাবে প্রত্যেক মাস্আলার ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত সমূহ পেশ করা হবে এবং সাথে সাথে উক্ত আয়াত সমূহের তাফসীরও বর্ণনা করা হবে, সেহেতু কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত দরকারঃ-

একটি হচ্ছে কুরআনের তাফসীর, আর একটি হচ্ছে তাবীল ও ৩য়টি হচ্ছে কুরআনের তাহরীফ। এ তিনটির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে। মনগড়া তাফসীর করা হারাম। এর জন্য ঐতিহ্যের (রিওয়ায়েত কৃত তথ্যাদি) প্রয়োজন। নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বলে কুরআনের বৈধ তাবীল করা জায়েয ও ছওয়াবের কাজ। কুরআনের তাহরীফ অর্থাৎ মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান কুফরী।

১) তাফসীর হচ্ছে ঐতিহ্যের সাহায্যে কুরআনের ওই সব বিষয় বর্ণনা করা, যেগুলো জ্ঞানের সাহায্যে বোধগম্য হয় না। যেমন আয়াতের শানে নযুল, কিংবা নাসিখ ও মানসুখ (রহিতকারী আয়াতসমূহ ও রহিত আয়াতসমূহ)। যদি কেউ কোন ঐতিহ্যের উল্লেখ ছাড়া মনগড়াভাবে বলে যে, অমুক আয়াত মানসুখ হয়েছে (রহিত হয়েছে) বা অমুক আয়াতের শানে নযুল এরূপ হবে, তাহলে তা' কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না বরং এরূপ বর্ণনাকারী গুনাহের ভাগী হবেন।

মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ইলম ২য় পরিচ্ছেদে আছেঃ-

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ .

(যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় মনগড়া কিছু বলে, সে যেন জাহান্নামে নিজ ঠিকানা বানিয়ে নেয়)। মিশকাত শরীফের ওই একই জায়গায় আরও উল্লিখিত আছেঃ-

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاءَ .

(যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় মনগড়া কিছু বলে এবং তা যদিও সঠিক হয়, তবুও সে ভুল করেছে বলে সাব্যস্ত হবে।

তাফসীরে কুরআনে কয়েকটি স্তর আছেঃ কুরআনের সাহায্যে কুরআনের তাফসীরের স্থান সর্বোর্দ্ধ। এর পরে হলো হাদীছের আলোকে কুরআনের তাফসীর। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হলেন ছাহেবে কুরআন বা কুরআনের ধারক। সুতরাং হাদীছের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যাও উচ্চমার্যাদার অধিকারী। এর পর হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম বিশেষতঃ ফকীহ সাহাবা ও খুলাফায়ে রাশেদীনের উক্তিসমূহের সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা।

তারপর হলো তাবেয়ীন ও তব'ই তাবেয়ীনের উক্তি সমূহের সাহায্যে তাফসীরের স্থান। যদি উক্তি সমূহ নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়, তা'হলে গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়। (আল্লামা গোলড়বী (কুঃ) এর রচিত ইলায়ে কালেমাতুল্লাহ নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

২) তাবীল-কুরআনের তাবীল হলো কুরআনের আয়াতের বিষয়াবলী ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের বর্ণনা করা এবং আরবী ভাষার ব্যাকরণের (নাহাব ও ছরফ) বিধানাবলীর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা। বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য এ তাবীল জায়েয। এর জন্য কোন ঐতিহ্যের প্রয়োজন হয় না। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদের উক্তির মধ্যেও এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا .

(তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে অবতীর্ণ হতো, তাহলে এর মধ্যে অনেক গরমিল ও মতভেদ দেখতে পেতো)।

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

يَتَاَمَّلُوْنَ وَيَتَبَصَّرُوْنَ مَافِيْهِ .

অর্থাৎ কেন তারা কুরআনের অর্থকে তলিয়ে দেখে না এবং এর বিচিত্র সৌন্দর্যাদি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে অবলোকন করে না?

মিশকাত শরীফের কিসাস শীর্ষক আলোচনায় ১ম পরিচ্ছেদে আছেঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁর কাছে কুরআন শরীফ ব্যতীত হযরত মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত অন্য কোন দান আছে কিনা। এর প্রত্যুত্তরে এর হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেছিলেনঃ

مَاعِنْدَنَا اِلَّا مَافِى الْقُرْاٰنِ اِلَّا فَهْمًا يُعْطٰى رَجُلٌ فِىْ كِتَابِهٖ

অর্থাৎ আমার কাছে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এমন জ্ঞান ও বোধশক্তি আমার রয়েছে, যা আল্লাহর কালামের মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য কাউকে দান করা হয়।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মিরকাত (শরহে মিশকাত) এ উল্লেখিত আছেঃ

وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا يُسْتَنْبَطُ بِهِ الْمَعَانِىْ وَيُدْرَكُ بِهِ الْاِشَارَاتُ وَالْعُلُوْمُ الْخَفِيَّةُ.

(বোধশক্তি বলতে ঐ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যাদ্বারা কুরআনের গুঢ়মর্ম উদ্‌ঘাটন করা যায়, কালামের ইঙ্গিত ও ভাবার্থ উপলব্ধি করা যায় ও অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ও রহস্যাবৃত জ্ঞানের সন্ধান মিলে।)

উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে বোঝা গেল, কুরআনের ভাবার্থে চিন্তাভাবনা করা, স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ ও এ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য উদ্‌ঘাটন অবৈধ নহে। সবক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রয়োজন পড়ে না।

সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জালালাইনের টীকায়, যা 'জুমল' নামে খ্যাত উল্লেখিত আছেঃ-

اَصْلُ التَّفْسِيْرِ الْكَشْفُ وَاَصْلُ التَّاوِيْلِ الرُّجُوْعُ وَعِلْمُ التَّفْسِيْرِ عِلْمٌ عَنْ اَحْوَالِ الْقُرْاٰنِ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهٖ عَلٰى مُرَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِحَسْبِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ ثُمَّ هُوَ قِسْمَانِ تَفْسِيْرٌ وَهُوَ مَا لَا يُدْرَكُ اِلَّا بِالنَّقْلِ كَاَسْبَابِ النُّزُوْلِ، وَتَاوِيْلٌ وَهُوَ مَا يُمْكِنُ اِدْرَاكُهٗ بِالْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالدِّرَايَةِ وَالسِّرُّ فِىْ جَوَازِ التَّاوِيْلِ بِالرَّاْىِ بِشُرُوْطِهٖ

دُوْنَ التَّفْسِيْرِ اَنَّ التَّفْسِيْرَ كَشَهَادَةٍ عَلَى اللّٰهِ قَطَعَ بِاَنَّهٗ عَنٰى بِهٰذَا اللَّفْظِ هٰذَا الْمَعْنٰى وَلَا يَجُوْزُ اِلَّا بِتَوْفِيْقٍ وَلِذَا جَزَمَ الْحَاكِمُ بِاَنَّ تَفْسِيْرَ الصَّحَابِىْ فِىْ حُكْمِ الْمَرْفُوْعِ وَالتَّاوِيْلُ تَرْجِيْحٌ لِاَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ بِلَا قَطْعٍ

(অর্থাৎ- 'তাফসীর' এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রকাশ করা আর 'তাবীল' এর অর্থ হলো ফিরে আসা বা যাওয়া। তাফসীরের জ্ঞান হলো কুরআন পাকের ঐ সমস্ত অবস্থা জানা, যা জ্ঞাত হলে মানুষ নিজ শক্তি সামর্থ অনুসারে আল্লাহর নির্দেশিত লক্ষ্যার্থ অনুধাবন করতে পারে। ইহা দু'প্রকারঃ তফসীর ও তাবিল। তাফসীর ঐতিহ্য ব্যতীত জ্ঞাত হওয়া যায় না আর তাবীল হলো যা' আরবী ব্যাকরণের ভিত্তিতে জানা যায়। সুতরাং তাবীলের সম্পর্ক রয়েছে বোধশক্তির সঙ্গে। নিজস্ব মতানুযায়ী তাবীল জায়েয কিন্তু তাফসীর না জায়েয। এর পিছনে রহস্য হলো এ যে, তাফসীর হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য দেয়া ও বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তা'আলা এ শব্দের দ্বারা এ অর্থ বুঝায়েছেন। ইহা জ্ঞাত না হলে স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা বলা বৈধ নহে। এ জন্য হাকিম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এ ক্ষেত্রে মীমাংসা করে দিয়েছেন, যে কোন সাহাবীর তাফসীর মরফু হাদীছের মর্যাদা প্রাপ্ত। আর তাবীল হলো, অনিশ্চতভাবে সম্ভাব্য কয়েকটি অর্থের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেয়া।)

মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে 'ইলম' শীর্ষক আলোচনার ২য় পরিচ্ছেদে مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

اَىْ تَكَلَّمَ فِىْ مَعْنَاهُ اَوْفِىْ قِرَاَتِهٖ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهٖ مِنْ غَيْرِتَتَبُّعِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ مِنْ اَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ بَلْ بِحَسْبِ مَايَقْتَضِيْهِ عَقْلُهٗ وَهُوَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّقْلِ كَاَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ.

(এ হাদীছের আসল কথা হলো-কুরআনের অর্থে কিংবা ক্বিরাত সম্পর্কে নিজের মতানুযায়ী কথা বলা, আরবী ভাষায় পারদর্শী ইমামগণের উক্তি সমুহের অনুসন্ধান না করে এবং শরীয়তের নীতিমালার প্রতি দৃষ্টি না রেখে নিজ বুদ্ধি বলে ব্যাখ্যা করা। অথচ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যথার্থভাবে বুঝতে হলে ঐতিহ্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

যেমনঃ বিভিন্ন আয়াত সমূহের শানে নুযুল ও নাসিখ-মানসুখ (রহিতকারী ও রহিত আয়াত সমূহ) সম্পর্কিত জ্ঞান।

তিরমিযী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের কিতাবুত তাফসীরের শুরুতে আছেঃ-

وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَيْرِهِمْ اَنَّهُمْ اَشَدُّوْا فِىْ هٰذَا فِىْ اَنْ يُّفَسِّرِ الْقُرْاٰنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

অর্থাৎ-কোন কোন জ্ঞানী সাহাবী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যেন রিওয়ায়েতকৃত তাফসীরের জ্ঞান ছাড়া কুরআনের তাফসীর না করেন। সে জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) কঠোরতা অবলম্বন করতেন।

এ হাদীসের টীকায় 'মজমাউল বিহার' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

لَايَجُوْزُ اَنْ يُّرَادَ اَنْ لَّايَتَكَلَّمَ اَحَدٌ فِى الْقُرْاٰنِ اِلَّابِمَا سَمِعَهُ فَاِنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ فَسَّرُوْا وَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ عَلٰى وُجُوْهٍ وَّ لَيْسَ كُلُّ مَا قَالُوْاهُ سَمِعُوْهُ مِنْهُ وَلِاَنَّهُ لَا يُفِيْدُ دُعَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ ط

অর্থাৎ-উল্লেখিত তিরমিযী (রঃ) এর বক্তব্য হতে এ ধারণা করা যাবে না যে, না শুনে কেউ কুরআনের ব্যাখ্যায় কোনরূপ মন্তব্য করতে পারবে না। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (রঃ) কুরআনের তাফসীর করেছেন এবং পরস্পরের মধ্যে অনেক মত পার্থক্যও বিদ্যমান ছিল। তাঁদের সব কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে শ্রুত ছিল না। অধিকন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দু'আ-'হে খোদা! এদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান এবং তাবীল করার শক্তিদান কর'-বৃথা পরিণত হবে।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) ও তাঁর 'ইহ্য়াউল উলুম' গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ শুধু এ কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন যে, ঐতিহ্য ছাড়াও কুরআন বোঝা সম্ভবপর। তিনি বলেন-কুরআনের একটি বাহ্যিক অর্থ ও আর একটি অভ্যন্তরীন অর্থ রয়েছে। উলামা সম্প্রদায় জাহেরী অর্থের উপর গবেষণা করেন আর সূফী সম্প্রদায় অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। হযরত আলী (কাঃ) বলেছেন-"আমি ইচ্ছে করলে 'সুরায়ে ফাতিহা'র এমন তাফসীর করতে পারি, যা গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত হলে ৭০টি উটের বোঝাই হবে"। তিনি (কাঃ) আরও বলেছেন- 'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ বুঝতে পারবে, সে তাবৎ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে। এখন স্বভাবতঃ এ প্রশ্ন জাগে যে হাদীছে বলা হয়েছে যে, 'কুরআনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তাধারায় কিছু মন্তব্য করা ভুল হবে'-এ কথার তাৎপর্য কি? উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ঐতিহ্য ছাড়া সম্ভবপর নয়, শুধু সে সমস্ত বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া হারাম। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য ইহ্য়াউল উলুমের উপরোক্ত অধ্যায়ের উল্লেখিত পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

কুরআনের আয়াত সমূহের ব্যাপারে দ্বীনি ইমামগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেউ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ওয়াক্ফ করেন, কেউ অন্য জায়গায়, আবার কেউ কোন এক আয়াত থেকে একটি অনুশাসন বের করেন, অন্যজন এর বিপরীত ভাব ব্যক্ত করেন। যেমনঃ যীনার অপবাদ দানকারীর সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা, দ্ব্যর্থবোধক আয়াত সমূহের জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় সমূহ। অতএব, যদি নিজ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে খোদার কালামে একদম কিছু বলা না যায় এবং প্রত্যেক কথার জন্য ঐতিহ্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে এত মত পার্থক্য কেন?

(৩) তাহ্রীফঃ তাহ্রীফ হলো, কুরআনের এমন অর্থ বা মর্মার্থ বর্ণনা করা, যা উম্মাহর সর্বসম্মত মত, ইসলামী আকীদা বা তাফসীরকারকদের সর্বসম্মত অর্থের বিপরীত ঠেকে, কিংবা তাফসীরে কুরআনের বিপরীত কেউ বলে যে, এ আয়াতের তাফসীরে ব্যক্ত অর্থ ঠিক নয়, বরং আমি যা বলছি তাই সঠিক। এ ধরনের উক্তি স্পষ্ট কুফরী। কুরআনী আয়াত সমূহের ও কি্বরাতে মুতাওয়াতির অস্বীকার করা যেমন কুফরী, তেমনি কুরআন শরীফের মুতাওয়াতির অর্থকে অস্বীকার করাও কুফরী। যেমন মওলবী কাসেম (নানুতবী) সাহেব খাতেমুন নবীয়ীন' এর অর্থ করেছেন-মুখ্য নবী; যুগযুগ ধরে এর প্রচলিত ও শ্রুত 'শেষ নবী' অর্থে ব্যবহার করাটা সাধারণ লোকদের ধারণা অর্থাৎ ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নবুওতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন-আসলী (মুখ্য) ও আরেযী (গৌণ)। অথচ খাতেমুন নবীয়ীন এর অর্থ সম্পর্কে অনেক হাদীছের ও উম্মতগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে 'শেষ নবী'। অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর যামানায় বা পরে কোন

নতুন নবী আসতে পারে না। মওলবী কাসেম সাহেবের এ ধরনের অর্থ হচ্ছে তাহ-রীফ। অনুরূপ, কুরআন শরীফের যে সমস্ত আয়াতে খোদা ভিন্ন অন্যকে ডাকা নিষেধ করা হয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাফসীরকারকগণের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা হচ্ছে-খোদা ভিন্ন অন্য কারো পূজা না করা। যেমন-

وَلَاتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

(অর্থাৎ-খোদা ভিন্ন অন্য কিছুর পূজা করিও না, যেগুলো উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। কুরআন শরীফেও উক্ত আয়াতের তাফসীর বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

(অর্থাৎ-যে ব্যক্তি খোদার সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে ....।)

এখন উক্ত তাফসীর ও তাফসীরকারকদের এ তাফসীরে সর্বসম্মত অভিমত থাকা সত্বেও কেহ যদি বলে, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা নিষেধ, তাহলে সে কুরআনের তাহরীফ বা অপব্যাখ্যা করল। এ আলোচনাটুকু যথার্থরূপে স্মরণ রাখা দরকার। এটা খুবই উপকারী এবং সুধী পাঠকবৃন্দের কাজে আসবে।

তাকলীদের বর্ণনা

তাকলীদ অধ্যায়ে পাঁচটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

(১) তাকলীদের অর্থ ও প্রকারভেদ; (২) কোন্ ধরনের তাকলীদ প্রয়োজন ও কোন্ ধরনের তাকলীদ নিষিদ্ধ; (৩) কার জন্য তাকলীদ জরুরী আর কার জন্য নিষ্প্রয়োজন; (৪) তাক্লীদ ওয়াজিব হবার সমর্থনে দলীলাদি ও (৫) তাক্লীদ সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ এবং ওদের পূর্ণাঙ্গ উত্তর। এ জন্য তাক্লীদের বর্ণনাকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

১ম অধ্যায়

(তাকলীদের অর্থ ও প্রকারভেদ)

তাকলীদের দু'টো অর্থ আছে-একটি আভিধানিক, অপরটি পারিভাষিক বা শরীয়তে ব্যবহৃত। তাকলীদের আভিধানিক অর্থ হলো গলায় বেষ্টনী বা হার লাগানো। শরীয়তের পরিভাষায় তাকলীদ হলো-কারো উক্তি বা কর্মকে নিজের জন্য শরীয়তের জরুরী বিধান হিসেবে গ্রহণ করা, কেননা তাঁর উক্তি বা কর্ম আমাদের জন্য দলীলরূপে পরিগণিত। কারণ উহা শরীয়তে গবেষণা প্রসূত। যেমন, আমরা ইমাম আজম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উক্তি ও কর্মকে শরীয়তের মাস'আলার দলীলরূপে গণ্য করি এবং সংশ্লিষ্ট শরীয়তের দলীলাদি দেখার প্রয়োজন বোধ করি না।

'হুস্সামীর' টীকায় 'রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ' অধ্যায়ের ৮৬ পৃষ্ঠায় 'শরহে মুখতাসারুল মানার' হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

اَلتَّقْلِيْدُ اِتِّبَاعُ الرَّجُلِ غَيْرَهٗ فِيْمَا سَمِعَهٗ يَقُوْلُ اَوْفِىْ فِعْلِهٖ عَلٰى زَعْمٍ اَنَّهٗ مُحَقِّقٌ بِلَا نَظَرٍ فِى الدَّلِيْلِ

অর্থাৎ-তাকলীদ হলো কোন দলীল প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কোন গবেষকের উক্তি বা কৃত কর্ম শুনে তাঁর অনুসরণ করা।

'নূরুল আন্ওয়ার' গ্রন্থে তাকলীদের বর্ণনায় একই কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম গায্যালী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)-ও 'কিতাবুল মুস্তাফা' এর ২য় খণ্ডের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন- اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ

অর্থাৎ তাকলীদ হলো কারো উক্তিকে বিনা দলীলে গ্রহণ করা।

মুসাল্লামুসছবুত' গ্রন্থে বলা হয়েছে

اَلتَّقْلِيْدُ اَلْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ

(অর্থাৎ-তাকলীদ হলো কোন দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্যের কথানুযায়ী আমল করা।)

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর 'আলাইহিস সালামের অনুসর্ণকে তাকলীদ বলা যাবে না। কেননা তাঁর প্রত্যেকটি উক্তি ও কর্ম শরীয়তের দলীল। আর তাকলীদের ক্ষেত্রে শরীয়তের দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। সুতরাং আমাদেরকে হুযুর আলাইহিস সালামের উম্মত হিসেবে অভিহিত করা হবে, তাঁর 'মুকাল্লিদ' বা অনুসরণকারী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও দ্বীনের ইমামগণও হুযুর আলাইহিস সালামের উম্মত, মুকাল্লিদ ন'ন। এরূপ সাধারণ মুসলমানগণ যে কোন আলিমেদ্বীনের অনুসরণ করে থাকেন, এটাকেও তাকলীদ বলা যাবে না। কেননা কেউ আলিমদের কথা বা কর্মকে নিজের জন্য দলীল রূপে গ্রহণ করে না। আলিমগণ কিতাব দেখে কথা বলেন-এ কথা উপলব্ধি করে তাঁদেরকে মান্য করা হয়। যদি তাঁদের ফাত্ওয়া ভুল কিংবা কিতাবের বিপরীত প্রমাণিত হয়, তখন কেউ তা গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যদি কুরআন বা হাদীছ বা উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত দেখে কোন মাসআলা ব্যক্ত করেন, তা'ও যেমনি গ্রহণযোগ্য, আবার নিজস্ব কিয়াস বা যুক্তিগ্রাহ্য কোন মত প্রকাশ করলে, তাও গ্রহণীয় হবে। এ পার্থক্যটা স্মরণ রাখা একান্ত দরকার।

তাকলীদ দুই রকমের আছে-'তাকলীদে শারঈ' ও তাকলীদে গায়র শারঈ'।

শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত ব্যাপারে কারো অনুসরণ করাকে 'তাকলীদে শারঈ' বলা হয়। যেমন রোযা, নামায, যাকাত ইত্যাদি মাসাইলে ধর্মীয় ইমামদের অনুসরণ করা হয়। আর দুনিয়াবী বিষয়াদিতে কারো অনুসরণ করাকে তাকলীদে গায়র শারঈ বলা হয়। যেমন চিকিৎসকগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে বু'আলী সীনাকে, কবিগণ দাগ, আমীর বা মির্যা গালিবকে এবং আরবী ভাষার দ্বিবিধ ব্যাকরণ-নাহ্ব ও ছরফের পণ্ডিতগণ সীবওয়াই ও খলীলকে অনুসরণ করে থাকেন। এ রকম প্রত্যেক পেশার লোকেরা তাদের নিজ নিজ পেশার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে থাকে। এ গুলো হলো দুনিয়াবী তাকলীদ।

আবার সুফীয়ানে কিরাম তাদের ওয়াজীফা ও আমলের ব্যাপারে নিজ নিজ মাশায়িখের উক্তি ও কর্মের অনুসরণ করে থাকেন। এটা অবশ্য দ্বীনী তাকলীদ, কিন্তু শারঈ তাকলীদ নয়। বরং একে তাকলীদ ফিত্ তারীকত বলা হয়। কেননা এখানে শরীয়তের মাসাইলের হালাল-হারামের ব্যাপারে অনুসরণ করা হয় না। হ্যাঁ, যে কর্ম পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় উহাও ধর্মীয় কাজ বৈকি।

তাক্লীদে গায়র শারঈ কোন ক্ষেত্রে যদি শরীয়তের পরিপন্থী হয়, তাহলে সে তাক্লীদ হারাম। যদি ইসলাম বিরোধী না হয়, তাহলে জায়েয। বৃদ্ধা মহিলারা আনন্দ বিষাদের সময় বাপ-দাদাদের উদ্ভাবিত কতগুলো শরীয়ত বিরোধী প্রথার অনুসরণ করে, ইহা হারাম। চিকিৎসকগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপারে বু'আলী সীনা প্রমুখের অনুসরণ করে থাকেন, ইহা ইসলাম বিরোধী না হলে জায়েয। প্রথম প্রকারের হারাম তাকলীদকে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ধরনের তাকলীদকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করা হলো-

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا (ط)

(তার কথা শুনবেন না, যার দিলকে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ করেছি, যে নিজ প্রবৃত্তির বশীভূত ও যা'র কাজ সীমা লঙ্ঘন করেছে।)

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (ط)

এবং যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে এমন কোন বস্তুকে আমার

অংশীদাররূপে স্বীকার করানোর চেষ্টা করে, যা'র সম্পর্কে তোমার সম্যক ধারণা নেই, তবে তাদের কথা শুনিও না।)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَلَوْكَانَ اٰبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ط

(এবং যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, সে দিকে এবং রসুলের দিকে আগমন কর, তখন তারা বলতো, ওই কর্মপন্থাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, যা' আমাদের বাপ-দাদাদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে। যদিও তাদের বাপ-দাদাগণ না কিছুই জানতো, না সৎপথে ছিল।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ط

(যখন তাদেরকে বলা হতো; আল্লাহ্র অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ অনুযায়ী চলো, তখন তারা বলতো, আমরা আমাদের বাপ-দাদাগণকে যে পথে পেয়েছি, সে পথেই চলবো।

উল্লেখিত আয়াত ও এ ধরনের অন্যান্য আরও আয়াতে শরীয়তের মুকাবিলায় মূর্খ বাপ-দাদাগণের হারাম ও গর্হিত কার্যাবলীর অনুসরণ করার নিন্দা করা হয়েছে। তারা বলতো, আমাদের বাপ-দাদাগণ যেরূপ করতেন, আমরাও সেরূপ করবো-সে কাজ জায়েয হোক বা না জায়েয। উল্লেখ্য যে উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে শারঈ তাকলীদ এবং ধর্মীয় ইমামগণের অনুসরণের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব ঐ সমস্ত আয়াতের ভিত্তিতে ইমামগণের তাকলীদকে শিরক কিংবা হারামরূপে গণ্য করা ধর্মহীনতার নামান্তর। এ কথাটুকু স্মরণ রাখা দরকার।

২য় অধ্যায়

(কোন্ ধরনের মাসাইলে তাকলীদ করা হয়, আর কোন্ ধরনের মাসাইলে তাকলীদ করা হয় না)

শারঈ তাকলীদ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন। শরীয়তের মাসাইল হচ্ছে তিন রকমের-(১) আকায়িদ, (২) ঐ সমস্ত বিধি বিধান যেগুলো কোন গবেষণা ছাড়াই কুরআন হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, (৩) ঐ সমস্ত আহকাম, যেগুলো কুরআন হাদীছ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়েছে।

'আকায়িদের ব্যাপারে কারো তাকলীদ বা অনুসরণ নাজায়েয। তফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা হুদের শেষাংশের আয়াতঃ- نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

وَفِى الْاٰيَةِ ذَمُّ التَّقْلِيْدِ وَهُوَقَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا دَلِيْلٍ وَهُوَ جَائِزٌ فِى الْفُرُوْعِ وَالْعَمَلِيَّاتِ وَلَا يَجُوْزُ فِى اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَالْاِعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظْرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ

(এ আয়াতে তাক্লীদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। তাক্লীদ হচ্ছে অপরের উক্তিকে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা। এটা ধর্মের মৌলিক ও আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত সম্পর্কিত বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে (আনুসাঙ্গিক ও ধর্মীয় কাজ কর্ম সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে) বৈধ, কিন্তু ধর্মীয় বুনিয়াদী বিষয়াদি ও আকায়িদের ক্ষেত্রে এটা বৈধ নয়। বরং এ ক্ষেত্রে দলীল প্রমাণ ও চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন থেকে যায়।)

যদি কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, আমরা তাওহীদ, রিসালত ইত্যাদি কিভাবে স্বীকার করে নিয়েছি? এর প্রত্যুত্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর উক্তি বা তাঁর রচিত ফিক্‌হে আকবরের নাম উল্লেখ করলে চলবে না। বরং বলতে হবে যে তাওহীদ ও রিসালাতের দলীলাদির ভিত্তিতে এগুলো স্বীকার করে থাকি। কেননা এগুলো হচ্ছে আকায়িদ সম্পর্কিত বিষয়, 'আকায়িদের ক্ষেত্রে তাক্লীদ হয় না।

ফাত্ওয়ায়ে শামীর মুকাদ্দামায় اَلتَّقْلِيْدُ الْمَفْضُوْلِ مَعَ الْاَفْضَلِ

এর বর্ণনায় উল্লেখ আছেঃ

(عَنْ مُعْتَقَدِنَا) اَىْ عَمَّا نَعْتَقِدُهٗ مِنْ غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهٗ عَلٰى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِلَا تَقْلِيْدٍ لِاَحَدٍ وَّهُوَ مَا عَلَيْهِ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمُ الْاَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ

(অর্থাৎ শারয়ী আনুষঙ্গিক মাসাইল ব্যতীত যে সব বিষয়ে আমরা বিশ্বাস রাখি এবং কারো অনুসরণ ছাড়াই যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস রাখাটা প্রত্যেক মুকাল্লাফ (বালিগ ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি) এর জন্য ওয়াজিব, সেগুলো হলো,-'আকায়িদের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়, যার ধারক ও বাহক হচ্ছে-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত অর্থাৎ আশা'ইয়রা ও মাতুরীদিয়াহ সম্প্রদায়।) 'তাফসীরে কবীরে'-১ম পারার আয়াত- فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ এর তাফসীলে লিপিবদ্ধ আছেঃ-

هٰذِهِ الْاٰيَةُ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ التَّقْلِيْدَ غَيْرُ كَافٍ فِى الدِّيْنِ وَاَنَّهٗ لَابُدَّ مِنَ النَّظْرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ

অর্থাৎ-এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে ধর্মীয় ব্যাপারে তাকলীদ বা অনুসরণ যথেষ্ট নয়, যুক্তি প্রমাণ অন্বেষণেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

শরীয়তের সুস্পষ্ট আহ্কামে কারো তাকলীদ জায়েয নয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নামাযের নির্ধারিত রাক্আত সমূহ, ত্রিশ রোযা রাখা অবস্থায় খানাপিনা হারাম হওয়া ইত্যাদি মাসাইল কুরআন-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রমাণিত। এ জন্য এ সমস্ত ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলবে না যে নামায দিনে পাঁচ বার বা রোযা এক মাস এ জন্য নির্ধারিত, যেহেতু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন বা তাঁর রচিত 'ফিক্হে আকবরে' লিখা হয়েছে। বরং এ ক্ষেত্রে কুরআন থেকে সংশ্লিষ্ট দলীল প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে।

যে সব মাসাইল কুরআন হাদীছ বা 'ইজমায়ে উম্মত থেকে গবেষণা ও ইজতিহাদ প্রয়োগ করে বের করা হয়েছে, ঐ সমস্ত মাসাইলে মুজতাহিদ নয় এমন লোকের জন্য তাকলীদ ওয়াজিব।

আমি মাসাইলকে যে ভাবে ভাগ করে দেখিয়েছি ও উল্লেখ করেছি যে কোন্

ধরনের মাসাইলে অনুসরণ করতে হবে আর কোন্ প্রকারের মাসাইলে তাকলীদ বা অনুসরণ করা যাবে না, এ বিষয়ের প্রতি যথার্থরূপে খেয়াল রাখতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে লা-মাযহাবীগণ আপত্তি উত্থাপন করেন যে দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে মাসাইল বের করার মুকাল্লিদের কোন অধিকার নেই। তথাপি আপনারা কেন নামায-রোযার সমর্থনে কুরআনের আয়াত বা হাদীছ সমূহ পেশ করেন? এর উত্তরও উপরে বর্ণিত হয়েছে যে নামায-রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারটা তাকলীদী মাসাইলের অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরের বর্ণনা থেকে এ কথাও জানা গেল যে আহকাম ছাড়া কোন ঘটনার খবর ইত্যাদিতে তাকলীদ হয় না। যেমন ইয়াযীদ প্রমুখের কাফির হওয়া সম্পর্কিত মাসআলা। কিয়াসের ভিত্তিতে বের করা মাসাইলেও ফকীহগণ কুরআন হাদীছ থেকে দলীলাদি পেশ করে থাকেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীকৃত মাসাইলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ঐ সব মাসাইল আগে থেকে ধর্মীয় ইমামের কথা অনুযায়ী স্বীকৃত হয়ে থাকে। সুতরাং দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার অর্থ মুকাল্লিদের দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা চলবে না।

৩য় অধ্যায়

(তাক্লীদ কার জন্য ওয়াজিব আর কার জন্য ওয়াজিব নয়)

প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেকের অধিকারী মুসলমানকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-মুজতাহিদ ও গায়র মুজতাহিদ। মুজতাহিদ হলো-এমন মুসলমান যিনি নিজ জ্ঞান ও যোগ্যতায় কুরআনী ইঙ্গিত ও রহস্যাবলী বুঝতে পারেন, কালামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার যোগ্যতা রাখেন, গবেষণা করে মাসাইল বের করতে পারেন, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, 'ইলমে ছরফ, নাহ্‌র বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, যাবতীয় আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত আয়াত ও হাদীছসমূহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখেন, সর্বোপরি যিনি মেধা, প্রজ্ঞা ও বোধশক্তির অধিকারী হন। (তাফসীরাতে আহমদীয়া ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ দেখুন) আর যে ব্যক্তি ঐ স্তরে পৌছতে পারেনি যায় মধ্যে উল্লেখিত যোগ্যতা নেই, সে হলো গায়র-মুজতাহিদ বা মুকাল্লিদ (অনুসারী)। গায়র-মুজতাহিদের জন্য মুজতাহিদের তাক্লীদ একান্ত জরুরী। আর মুজতাহিদের জন্য তাক্লীদ বা অপরের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। মুজতাহিদের ছয়টি শ্রেণী আছে। যথাঃ- (১)

শরীয়তের মুজতাহিদ, (২) মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মুজতাহিদ, (৩) মাসাইলের মুজতাহিদ, (৪) আসহাবে তাখ্রীজ, (৫) আসহাবে তারজীহ ও (৬) আসহাবে তমীয (মুকাদ্দমায়ে শামী 'তবকাতে ফুকহা' এর বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

(১) শরীয়তের মুজতাহিদ হলেন ঐ সমস্ত জ্ঞানী-গুণী জন, যারা ইজতিহাদের নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যেমন-ধর্মীয় চার ইমামগণ হযরত আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে), হযরত শাফিঈ (রহমতুল্লাহে আলাইহে), হযরত মালিক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও হযরত আহমদ ইবন হাম্বাল (রহমতুল্লাহে আলাইহে)।

(২) মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মুজতাহিদ হলেন ঐ সমস্ত ধর্মীয় ইমাম, যাঁরা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মুজতাহিদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার অনুসরণ করেন ও ঐ সমস্ত নীতিমালার অনুসরণ করে নিজেরাই শরীয়তের আনুষাঙ্গিক মাসাইল বের করতে পারেন। যেমন-ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও ইবন মুবারক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আল-ইহে) এর অনুসারী। কিন্তু মাসাইলে নিজেরাই মুজতাহিদ।

(৩) মাসআলাসমূহের মুজতাহিদ হলেন ঐ সকল ইমামগণ, যাঁরা মৌলিক নীতিমালা ও আনুষাঙ্গিক মাসাইলের ক্ষেত্রে অন্যের অনুসারী কিন্তু তাঁরা যে সব মাসাইলে ইমামগণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, ওগুলোর সমাধান কুরআন হাদীছ প্রভৃতি প্রামাণ্য দলীলাদি থেকে বের করতে পারেন। যেমন-ইমাম তাহাবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে), কাযী খাঁন (রহমতুল্লাহে আলাইহে), শামসুল আইম্মা সরখসী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখ।

(৪) আসহাবে তাখ্রীজ হলেন ঐ সকল মুজতাহিদ, যাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেননি, তবে ধর্মীয় ইমামগণের কারো অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত উক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের যোগ্যতা রাখেন। যেমন-ইমাম করখী (রহমতুল্লাহে আ-লাইহে) প্রমুখ।

(৫) আসহাবে তারজীহ হলেন ঐ মুজতাহিদ, যাঁরা ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর একাধিক রিওয়ায়াত সমূহ থেকে একটিকে প্রাধান্য দিতে পারেন। অর্থাৎ যদি কোন একটি মাস্আলায় ইমাম আবু হানীফার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) দু'ধরনের রিওয়ায়াত থাকে, তাঁরা কোন্‌টাকে প্রাধান্য দেয়া যাবে, তা বলতে পারেন। অনুরূপ কোন মাস্আলায় ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও সাহিবায়নের (ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও ইমাম আবু ইউসুফ

(রহমতুল্লাহে আলাইহে) মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হলে, তাঁরা যাচাই করে যে কোন একজনের উক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে মন্তব্য করতে পারেন যে উক্তি সমূহের মধ্যে এ উক্তিটাই অধিক গ্রহণযোগ্য কিংবা অমুকের উক্তিই সর্বাধিক সঠিক। যেমন-'কুদুরী' ও 'হিদায়া' গ্রন্থদ্বয়ের মাননীয় প্রণেতাদ্বয়।

(৬) আসহাবে তামীয হলেন ঐ সমস্ত মুজতাহিদ, যাঁরা জাহির মাযহাব ও কম গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়াত সমূহের মধ্যে, কিংবা দুর্বল, জোরালো ও সর্বাধিক জোরালো উক্তি সমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন। এ যোগ্যতার ভিত্তিতে অগ্রাহ্য উক্তি ও দুর্বল রিওয়ায়াতসমূহ বর্জন করে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য উক্তি সমূহ গ্রহণ করেন। যেমন-কনযুদ দাকাইক ও দুবরুল মুখতার ইত্যাদির প্রণেতাগণ।

যাদের মধ্যে উল্লেখিত ছয়টি স্তরের কোনটির যোগ্যতা নেই, তারা নিছক অনুসারী বা মুকাল্লিদ হিসেবে পরিগণিত। যেমন-আমরা ও আমাদের যুগের সাধারণ আলিমগণ। তাঁদের একমাত্র কাজ হলো কিতাব দেখে বা অধ্যয়ন করে জনগণকে মাসাইল শিক্ষা দেয়া।

আমি আগেই বলেছি যে, মুজতাহিদের জন্য অপরকে অনুসরণ করা হারাম। অতএব, উল্লেখিত ছয় স্তরের মধ্যে যিনি যেই স্তরের মুজতাহিদ হবেন, তিনি সে স্তরের অন্য কারো তাকলীদ করবেন না; তিনি উপরের স্তরের মুজতাহিদের তাকলীদ করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মুকাল্লিদ বা অনুসারী, কিন্তু মাসাইলের ক্ষেত্রে নিজেরাই মুজতাহিদ। এ জন্য মাসাইলের ব্যাপারে তাঁরা কারো অনুসারী নন।

আমার উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে নিম্নবর্ণিত লা-মাযহাবীদের অনেক অবান্তর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা প্রশ্ন করে থাকেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যখন হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তখন তাঁরা বিভিন্ন মাসাইলে ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বিরোধিতা করেন কেন? এর উত্তরে বলতে হবে যে তাঁরা মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা(রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর অনুসারী, যার জন্য নির্ধারিত নীতিমালার ক্ষেত্রে কোন বিরোধিতা করেন না। তবে আনুসাঙ্গিক অনেক মাসাইলে ভিন্নমত পোষণ করেন, কেননা এ গুলোর ব্যাপারে তাঁরা নিজেরাই মুজতাহিদ, অন্য কারো অনুসারী নন।

নিম্নে উল্লেখিত প্রশ্নেরও অবতারণা করার আর অবকাশ রইল না। তারা প্রশ্ন করতে পারেন-আপনারা অনেক মাসাইলে ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আল-

ইহে) এর উক্তিকে বাদ দিয়ে সাহেবান (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উক্তি অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। এর পরেও আপনারা হানাফী মতাবলম্বী হলেন কিভাবে? এর উত্তর হলো-ফকীহগণের মধ্যে আসহাবে তারজীহ এর যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী ফকীহ বিদ্যামান আছেন, যাঁরা কয়েকটি উক্তির মধ্য থেকে একটিকে প্রাধান্য দেন। এ জন্য আমরা তাঁদের প্রাধান্য দেয়া উক্তি অনুসারে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকি।

তারা আরও প্রশ্ন করতে পারেন-আপনারা নিজেদেরকে হানাফী বলে কেন দাবী করেন, আপনাদের ইউসুফী বা মুহাম্মদী বা ইবনে মুবারকী বলাই বাঞ্ছনীয় নয় কি? কেননা অনেক জায়গায় আপনারা ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উক্তিকে বাদ দিয়ে উনাদের উক্তি অনুযায়ী আমল করে থাকেন। এর উত্তর হলো ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও ইবনে মুবারক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখের সমস্ত উক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর নির্ধারিত নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং, তাদের উক্তিকে গ্রহণ করা মানে প্রকৃত পক্ষে ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উক্তিকে গ্রহণ করা। যেমন-হাদীছ অনুযায়ী আমল করা মানে প্রকৃতপক্ষে কুরআন অনুযায়ী আমল করা। কেননা, মহাপ্রভুইতো এ নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন-"যদি কোন হাদীছ সহীহ প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সেটাই হবে আমার মাযহাব।" এমতাবস্থায় যদি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত কোন মুজতাহিদ কোন সহীহ হাদীছ পেয়ে সে অনুসারে আমল করেন, তাহলে তিনি লা-মাযহাবী হবেন না বরং হানাফীই থেকে যাবেন। কেননা, তিনি ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। মুকদ্দমায়ে শামীতে صَحَّ عَنِ الْاِمَامِ اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ

এর বর্ণনা প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বিবরণ দেখুন। ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উপরোক্ত উক্তির মর্ম এও হতে পারে যে, যখন কোন হাদীছ নির্ভুল প্রমাণিত হলো, তখনই সেটা আমার মাযহাবরূপে গণ্য হল। অর্থাৎ প্রত্যেক মাস-আলা ও হাদীসকে আমি পর্যাপ্ত বিচার বিশ্লেষণ ও খুটিনাটি সব কিছুর পর্যালোচনা করে গ্রহণ করেছি। বস্তুতঃ ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর নিকট প্রত্যেকটি মাসআলা নিয়ে ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ করা হতো, এবং মুজতাহিদ শিষ্যদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সব কিছুর ব্যাপক তাত্ত্বিক পর্যালোচনার পর ওটা গ্রহণ করা হতো।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু স্মরণ রাখলে ইন্‌শা আল্লাহ অনেক সমস্যার সমাধান করা যাবে, সুধী পাঠকমণ্ডলীর অনেক কাজে আসবে।

কোন কোন লা-মাযহাবী আলিম বলে থাকেন-যেহেতু আমাদের ইজতিহাদ প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে, সেহেতু আমরা কাউকে অনুসরণ করি না। এ অবান্তর উক্তির জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। ইজতিহাদের জন্য কতটুকু জ্ঞান দরকার আর তারা কতটুকু জ্ঞানের অধিকারী শুধু সে প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

হযরত ইমাম রাযী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ইমাম গায্যালী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহে আলাইহে), ইমাম আবু দাউদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) গাউছে পাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বায়যীদ বুস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শাহ বাহাউল হক নকশবন্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখ ইসলামে এত উন্নত মর্যাদার অধিকারী ও মাশায়িখ্ ছিলেন যে, তাঁদের নিয়ে মুসলমানগণ যতই গর্ববোধ করুক না কেন, তা তাঁদের জ্ঞান গরিমা ও প্রজ্ঞার তুলনায় নেহায়ত কিঞ্চিতকররূপে প্রতিভাত হবে। অথচ উনাদের মধ্যে কেউ মুজতাহিদরূপে স্বীকৃতি পাননি। বরং তাঁরা ছিলেন মুকাল্লিদ বা অনুসারী। কেউ ইমাম শাফেয়ীর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আর কেউ ইমাম আবু হানীফার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) অনুসারী ছিলেন। বর্তমান জামানায় উনাদের সমপরিমাণ মর্যাদা ও যোগ্যতার অধিকারী কেউ আছেন? যখন উনাদের জ্ঞান মুজতাহিদ এর স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, তখন যারা বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের নামগুলো পর্যন্ত ঠিকমত বলতে পারে না, তারা কোন পর্যায়ে পড়বেন?

জনৈক ভদ্রলোক মুজতাহিদ হওয়ার দাবী করেছিলেন। আমি তাকে শুধু এতটুকু জিজ্ঞাসা করেছিলাম আচ্ছা বলুন দেখি, সুরা তাকাছুর থেকে কয়টি মাস-ইল বের করতে পারেন এবং এর মধ্যে 'হাকীকত', 'মাজায' 'সরীহ' 'কিনায়া', জাহির' ও 'নাস' কয়টি আছে? সে বেচারা নাকি (উসুলে ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত উক্ত পারিভাষিক) শব্দগুলোর নামও শুনেনি।

৪র্থ অধ্যায়

(তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার দলীলাদির বিবরণ)

এ অধ্যায়কে দু'টো পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সাধারণ

তাকলীদের দলীল সমূহ এবং ২য় পরিচ্ছেদে ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ সম্পর্কে দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ

তাকলীদ যে ওয়াজিব, এটা কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীছ, উম্মতের কর্মপন্থা ও তাফসীরকারকদের উক্তিসমূহ থেকে প্রমাণিত। সাধারণ তাকলীদ হোক বা মুজতাহিদের তাকলীদ হোক, উভয়ের প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। (নিম্নে ওগুলো উপস্থাপন করা হল।)

(১) اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎঃ "আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত কর। ওনাদের পথে, যাঁদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।"

এখানে সোজা পথ বলতে ওই পথকে বোঝানো হয়েছে, যে পথে আল্লাহর নেক বান্দাগণ চলেছেন। সমস্ত তাফসীর কারক, মুহাদ্দিছ, ফিক্‌হবিদ ওলীউল্লাহ গাউছ কুতুব ও আবদাল হচ্ছেন আল্লাহর নেক বান্দা। তাঁরা সকলেই মুকাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন। সুতরাং, তাকলীদই হলো সোজা পথ। কোন মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির ও ওলী লা-মাযহাবী ছিলেন না। লা-মাযহাবী হলো ঐ ব্যক্তি যে মুজতাহিদ না হয়েও কারো অনুসারী নয়। অবশ্য মুজতাহিদ হয়ে কারো অনুসরণ না করলে তাকে লা-মাযহাবী বলা যাবে না। কেননা মুজতাহিদের জন্য তাকলীদ নিষিদ্ধ।

(২) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

(আল্লাহ তা'আলা কারো উপর ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা কারো উপর সাধ্যাতীত কার্যভার চাপিয়ে দেন না। সুতরাং, যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে পারে না; কুরআন থেকে মাসাইল বের করতে পারে না, তার দ্বারা তাকলীদ না করিয়ে প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান বের করানো তার উপর ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যভার চাপানোর নামান্তর। যখন গরীবের উপর যাকাত ও হজ্জ ফরয নয়, তখন অজ্ঞ লোকের মাসাইল বের করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে কি?

(৩) وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ -

(যে সকল মুহাজির এবং আনসার অগ্রগামী-যারা প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যারা সৎ উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীদের অনুগামী হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তার (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট।)

বোঝা গেল যে, যারা মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণ বা তাকলীদ করেন, আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। এখানেও তাকলীদের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৪) اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

(আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রদানকারী রয়েছেন, তাদেরও।) এ আয়াতে তিনটি সত্বার আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

(১) আল্লাহর (কুরআনের) আনুগত্য, (২) রসুলের (হাদীছের) আনুগত্য, এবং (৩) আদেশ দাতাগণের (ফিকহবিদ মুজতাহিদ আলিমগণ) আনুগত্য। লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত আয়াতে اَطِيْعُوْا (আতীউ) শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে-আল্লাহর জন্য একবার এবং রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও আদেশ প্রদানকারীদের জন্য একবার। এর রহস্য হলো আল্লাহ যা হুকুম করবেন, শুধু তাই পালন করা হবে, তার কর্ম কিংবা নীরবতার ক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবে না। তিনি কাফিরদেরকে আহার দেন, কখনও কখনও তাদেরকে বাহ্যিকভাবে যুদ্ধে জয়ী করান। তারা কুফরী করলেও সাথে সাথে শাস্তি দেন না। এসব ব্যাপারে আমরা আল্লাহকে অনুসরণ করতে পারি না। কেননা এতে কাফিরদেরকে সাহায্য করা হয়। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও মুজতাহিদ ইমামের প্রত্যেকটি হুকুমে, প্রত্যেকটি কাজে, এমন কি যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করেন, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও তাঁদের আনুগত্য করা যায়। এ পার্থক্যের জন্য اَطِيْعُوْا (আতীউ) শব্দটা দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে।

যদি কেউ বলে,- اُوْلِى الْاَمْرِ (উলীল আমর) দ্বারা ইসলামী শাসন কর্তাকে বোঝানো হয়েছে, এতে উপরোক্ত বক্তব্যে কোন রূপ তারতম্য ঘটবে না। কেননা শুধু শরীয়ত সম্মত নির্দেশাবলীতেই শাসনকর্তার আনুগত্য করা হবে, শরীয়ত

বিরোধী নির্দেশাবলীর ক্ষেত্রে আনুগত্য করা হবে না। ইসলামী শাসনকর্তা হচ্ছেন কেবল হুকুম প্রয়োগকারী। তাঁকে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম মুজতাহিদ আলিমগণের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। দেখা যাচ্ছে, আসল আদেশ প্রদানকারী হচ্ছেন ফিক্‌হবিদ। ইসলামী সুলতান ফিক্‌হবিদ 'আলিমের বর্ণিত অনুশাসন জারী করেন মাত্র। সমস্ত প্রজাদের হাকিম বাদশাহ হলেও বাদশাহের হাকিম হচ্ছেন মুজতাহিদ আলিম। শেষ পর্যন্ত أُوْلِى الْأَمْرِ (উলীল আমর) হলেন মুজতাহিদ আলিমগণই। أُوْلِى الْأَمْرِ (উলীল আমর) বলতে যদি কেবল ইসলামী বাদশাহ ধরে নেয়া হয়, তাতেও তাকলীদ প্রমাণিত হয়। 'আলিমের না হলেও অন্ততঃ বাদশাহের তাকলীদতো প্রমাণিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, এ আয়াতে আনুগত্য বলতে শরীয়তের আনুগত্যই বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে যে অনুশাসন তিন রকমের আছে, কতগুলো সরাসরি কুরআন থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। যেমন অন্তঃসত্ত্বা নয়, এমন মহিলার স্বামী মারা গেলে, তাকে চার মাস দশদিন 'ইদ্দত পালন করতে হয়। এদের প্রতি আল্লার নির্দেশ أَطِيْعُوا اللّٰهَ (আতীউল্লাহ) থেকে এ অনুশাসন গৃহীত হয়েছে। আর কতগুলো অনুশাসন সরাসরি হাদীছ থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত। উদাহরণ স্বরূপ, সোনারূপা নির্মিত অলংকার ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম। এ ধরনের অনুশাসন মেনে চলার জন্য أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ (আতীউর রসুল) বলা হয়েছে। আর কতকগুলো অনুশাসন আছে যেগুলো স্পষ্টভাবে কুরআন বা হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয়না। যেমন- স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুকামে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে হারাম হওয়ার বিধান। এ ধরনের অনুশাসন মেনে চলার জন্য أُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (উলীল আমরে মিনকুম) বলা হয়েছে। এ তিন রকম শরীয়ত বিধির জন্য তিনটি আদেশ দেয়া হয়েছে।

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (৫)

(হে লোক সকল! তোমাদের যদি জ্ঞান না থাকে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।)

এ আয়ত থেকে বোঝা গেল যে, যে বিষয়ে অবহিত নয়, সে যেন সে বিষয়ে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে নেয়। যে সব গবেষণালব্ধ মাসাইল বের করার ক্ষমতা আমাদের নেই, ঐগুলো মুজতাহিদগণের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে

নিতে হবে। কেউ কেউ বলেন যে, এ আয়াতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জেনে নেয়ার কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে, এর পূর্ববর্তী আয়াত থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা এ আয়াতের শব্দগুলো বিশেষিত বা শর্তযুক্ত নয়। আর না জানাটাই হলো জিজ্ঞাসা করার মূল কারণ। সুতরাং, যে বিষয়ে আমরা জানি না, সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা একান্ত প্রয়োজন।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ (৬)

(যিনি আমার দিকে (আল্লাহর দিকে) রুজু করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ কর।)

এ আয়াত থেকে এও জানা গেল যে আল্লাহর দিকে ধাবিত ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ (তাকলীদ) করা আবশ্যক। এ হুকুমটাও ব্যাপক, কেননা আয়াতের মধ্যে বিশেষত্ব জ্ঞাপক কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا (৭)
وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

এবং তাঁরা আরয করেন-হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দ্বারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে পারহেযগারদের ইমাম বানিয়ে দাও।

'তাফসীরে মাআলিমুত তানযীলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

فَنَقْتَدِىْ بِالْمُتَّقِيْنَ وَيَقْتَدِىْ بِنَا الْمُتَّقُوْنَ

অর্থাৎ-যাতে আমরা পারহেযগারদের অনুসরণ করতে পারি, আর পারহেযগারগণও আমাদের অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

এ আয়াত থেকেও বোঝা গেল যে, আল্লাহ ওয়ালাদের অনুসরণ বা তাকলীদ করা একান্ত আবশ্যক।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى (৮)
الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

(সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে তাদের প্রত্যেক গোত্র হতে একটি দল ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বের হয়ে পড়তো এবং ফিরে এসে নিজ গোত্রকে ভীতি প্রদর্শন করতো। যাতে গোত্রের অন্যান্য লোকগণ মন্দ, পাপ কার্যাবলী থেকে দূরে

সরে থাকতে পারে।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল প্রত্যেকের মুজতাহিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ ফিক্‌হবিদ হবেন, অন্যরা কথায় ও কর্মে তাঁদের অনুসরণ করবে।

(৯) وَلَوْرَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ.

(এবং যদি এ ক্ষেত্রে তারা রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)· ও আদেশদানকারী যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি রুজু করতো তাহলে নিশ্চয় তাদের মাঝে যারা সমস্যার সমাধান বের করার যোগ্যতা রাখেন, তাঁরা এর গুঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন।)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, হাদীছ, ঘটনাবলীর খবর ও কুরআনের আয়াত সমূহকে প্রথমে মুজতাহিদ আলিমদের আছে পেশ করতে হবে। এরপর তাঁরা যে রকম বলবেন, সেভাবে আমল করতে হবে। শ্রুত খবর থেকে কুরআন-হাদীছের স্থান অনেক উর্ধে। সুতরাং উহাকে মুজতাহিদের কাছে পেশ করা দরকার।

(১০) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

(যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ ইমাম সহকারে ডাকবো..।) 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে-

اَوْمُقَدَّمٍ فِى الدِّيْنِ فَيُقَالُ يَا حَنَفِىُّ يَاشَافِعِىُّ

(কিংবা ইমাম হচ্ছেন ধর্মীয় পথের দিশারী, তাই কিয়ামতের দিন লোকদিগকে 'হে হানাফী' হে শাফেঈ! বলে আহবান করা হবে।)

এ থেকে বোঝা গেল, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইমামের সাথে ডাকা হবে। ডাকা হবে হে হানাফী মতাবলম্বীগণ! হে মালিকী মযহাবের অনুসারীগণ! চলো। এখন প্রশ্ন হলো, যে ইমাম মানেনি, তাকে কার সাথে ডাকা হবে? এ সম্পর্কে সুফীয়ানে কিরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন যে, যার ইমাম নেই, তার ইমাম হলো শয়তান।

(১১) وَاِذَاقِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ

(এবং যখন তাদেরকে বলা হয়-'তোমরা ঈমান আন, যেরূপ সত্যিকার বিশুদ্ধ চিত্ত মু'মিনগণ ঈমান এনেছেন। তখন তারা বলে-আমরা কি বোকা ও বেওকুফ লোকদের মত বিশ্বাস স্থাপন করব?)

বোঝা গেল যে, ঐ ধরনের ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যে ঈমান নেক বান্দাগণ পোষণ করেন। অনুরূপ, মাযহাব ওটাই, যেটার অনুসারী হচ্ছেন নেক বান্দাগণ। উহাই হলো তাকলীদ।

তাফসীরকারক ও মুহাদ্দিছগণের অভিমত

প্রখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ 'দারমী'র الاقتداء بالعلماء (আল ইকতিদাউ বিল উলামা) অধ্যায়ে আছেঃ

اَخْبَرَنَا يَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ قَالُوْا اُوْلُوالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ

অর্থাৎ-আমাদেরকে ইয়া'লা বলেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল মালিক বলেছেন, আবদুল মালিক 'আতা' থেকে বর্ণনা করেছেন, ''আল্লাহর আনুগত্য কর, রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দাতা আছেন, তাদের আনুগত্য কর।'' 'আতা' বলেছেন এখানে জ্ঞানী ও ফিক্‌হবিদগণকে আদেশ প্রদানের অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাফসীরে খাযিনে فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

(যদি তোমরা না জান, জ্ঞানীদের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করিও) আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ فَاسْئَلُوا الْمُؤْمِنِيْنَ الْعٰلِمِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ-তোমরা ঐ সকল মুমিনদের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা কর, যারা কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী।

তাফসীরে দুররে মানসুরে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে-

اَخْرَجَ اِبْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّىْ وَيَصُوْمُ وَيَحُجُّ وَيَغْزُوْ وَاِنَّهُ لَمُنَافِقٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِمَا ذَا دَخَلَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ قَالَ لِطَعْنِهِ عَلٰى اِمَامِهِ وَاِمَامُهُ مَنْ قَالَ قَالَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

(অর্থাৎ-ইবনে মারদাওয়াই হযরত আনাস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন-আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, কতেক লোক নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্ব ও জিহাদ করে; অথচ তারা মুনাফিক গণ্য হয়। আরয করা হলঃ ইয়া রসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), কি কারণে তাদের মধ্যে নিফাক (মুনাফিকী) এসে গেল? প্রত্যুত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন, নিজ ইমামের বিরূপ সমালোচনা করার কারণে। ইমাম কে? এ কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ ফরমান-আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ (الاية)

অর্থাৎ আয়াতে উল্লেখিত আহলে যিকরকে ইমাম বলা হয়।)

তাফসীরে সাবীতে 'সুরা কাহাফের وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

আয়াত এর ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ আছে

وَلَايَجُوْزُ تَقْلِيْدُ مَاعَدَا الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَلَوْوَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ وَالْاٰيَةَ فَالْخَارِجُ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَرُبَمَا اَدَّاهُ ذَالِكَ اِلَى الْكُفْرِ لِاَنَّ الْاَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ اُصُوْلِ الْكُفْرِ ط

অর্থাৎ চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণ জায়েয নয় যদিও সে মাযহাব সাহাবীদের উক্তি, সহীহ হাদীছ ও কুরআনের আয়াতের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যে এ চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী নয়, সে পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। কেননা হাদীছ ও কুরআনের কেবল বাহ্যিক অর্থ গ্রহণই হলো কুফরীর মূল।

সংশ্লিষ্ট হাদীছ সমূহঃ

মুসলিম শরীফের ১ম খণ্ডে ৫৪ পৃষ্ঠায় اِنَّ الدِّيْنَ نَّصِيْحَةٌ এর বর্ণনা অধ্যায় আছে-

عَنْ تَمِيْمُ الدَّارِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

অর্থাৎ-তামীম দারী থেকে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, 'ধর্ম হলো কল্যাণ কামনা। আমরা (উপস্থিত সাহাবীগণ) আরয করলাম, কার কল্যাণ কামনা? তিনি ফরমালেন, আল্লাহর, তার কিতাবের, তার রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর, মুসলমানদের মুজতাহিদ ইমামগণের এবং সাধারণ মুসলমানদের। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নববীতে' এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

وَقَدْ يَتَنَاوَلُ ذٰلِكَ عَلَى الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ هُمْ عُلَمَاءُ الدِّيْنِ وَاَنَّ مِنْ نَصِيْحَتِهِمْ قَبُوْلَ مَارَوَوْهُ وَتَقْلِيْدَهُمْ فِى الْاَحْكَامِ وَاِحْسَانَ الظَّنِّ بِهِمْ.

(অর্থাৎ-এ হাদীছ 'উলামায়ে দ্বীন'কেও ইমামদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'উলামায়ে দ্বীন এর কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে তাদের বর্ণিত হাদীছ সমূহ গ্রহণ করা, শরীয়ত বিধিতে তাঁদেরকে অনুসরণ করা এবং তাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা।

২য় পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত তাকলীদের বর্ণনা

'মিশকাত শরীফের' কিতাবুল ইমারাতে' মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত আছে যে হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

অর্থাৎ–তোমরা সর্ব সম্মতিক্রমে কোন এক জনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছ, এমতাবস্থায় যদি অন্য কেউ তোমাদের নিকট এসে তোমাদের লাঠি (ঐক্য) ভেঙ্গে দিতে ও তোমাদের মাঝে দলাদলি সৃষ্টির প্রয়াস পায়, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করে দাও।

এখানে ব্যক্তি বিশেষ বলতে ইমাম ও উলামায়ে দ্বীনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা শরীয়ত বিরোধী কাজে সমকালীন শাসকের আনুগত্য জায়েয নয়।

ইমাম মুসলিম (রমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর সংকলিত 'মুসলিম শরীফে, ইমারত শীর্ষক আলোচনায়,

بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ الْاُمَرَاءِ فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

পাপাচার ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজির নামে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় একজনের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু।

মিশকাত শরীফে কিতাবুল 'বুয়ূ' 'বাবুল ফারাইযে' বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছেঃ হযরত আবু মুসা আশআরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হযরত ইবন মাসউদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সম্পর্কে বলেছি-লেনঃ لَا تَسْئَلُوْا نِىْ مَادَامَ هٰذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ

অর্থাঃ-যতদিন এ 'আল্লামা (হযরত ইবন মাসউদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আপনাদের মধ্যে থাকবেন, ততদিন আমার নিকট মাসাইল জিজ্ঞাসা করবেন না। এতে বোঝা যায় সর্বোত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম মাহাত্ম্যের অধিকারী ব্যক্তির আনুগত্য করতে নেই এবং প্রত্যেক অনুসারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে স্বীয় ইমাম সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন।

ফাতহুল কাদীরে আছেঃ

مَنْ تَوَلّٰى اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَّيَعْلَمُ اَنَّ فِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَوْلٰى بِذٰلِكَ وَاَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهٖ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

(অর্থাৎ-মুসলমানদের শাসনকর্তা যখন জেনে শুনে মুসলমানদের জন্য এমন

একজন প্রশাসক নিয়োগ করলেন, যা'র থেকে অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত ও কুরআন হাদীছে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন, তখন তিনি আল্লাহ, রসুল আলাইহিস সালাম এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

মিশকাত শরীফে 'কিতাবুল ইমারাত' এর ১ম পরিচ্ছেদে আছেঃ

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

(যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তাঁর গলে বায়'আত বন্ধন রইল না, সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করলো।)

এখানে বায়'আত বলতে ইমামের বায়'আতের অর্থাৎ তাকলীদ বা অনুসরণ ও আওলিয়া কিরামের হাতে বায়'আত গ্রহণ-এ উভয় প্রকারের বায়'আতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন বলুন, এ যুগে ভারতীয় ওহাবীগণ কোন্ সুলতানের বায়'আত গ্রহণ করেছেন?

তাকলীদের সমর্থনে এ কয়েকটি আয়াত ও হাদীছের বর্ণনা করা হলো। এগুলো ছাড়া আরও অনেক আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু বক্তব্য সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এখানে ইতি টানা হলো। এখন উম্মতের আমল পর্যালে-াচনা করে দেখুন-তবে 'তাবিয়ীনদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত তাকল-ীদের পথে চলে আসছে অর্থাৎ যে নিজে মুজতাহিদ নয়, সে অপর একজন মুজতাহিদের অনুসরণ করছে। উম্মতের ইজমা'র উপর আমল করার বিষয়টা কুরআন হাদীছ থেকে প্রমাণিত ও আবশ্যকীয়ও বটে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

(সঠিক পথ প্রকাশিত হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি রসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরোধিতা করে, মুসলমানদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চলে, তাকে আমি তার স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দিব, এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। এটা

কতই না নিকৃষ্ট স্থান।)

এ আয়াত থেকেও বোঝা গেল, সাধারণ মুসলমানদের জন্য মনোনীত যে পথ, সে পথ অবলম্বন করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। তাকলীদের ব্যাপারে মুসলমানদের সার্বিক সম্মতি বা ইজমা রয়েছে।

মিশকাত শরীফের 'আল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ' অধ্যায়ে আছে-

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ ـ

(সর্ববৃহৎ দলের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কেননা, যে মুসলমানদের দল থেকে পৃথক রয়েছে, তাকে পৃথকভাবে জাহান্নামে পাঠানো হবে।)

অন্য এক হাদীছে আরও আছে-

مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ-যে পথ ও মতকে মুসলমানরা ভাল জানেন, উহা আল্লাহর কাছেও ভাল ও পছন্দনীয় হিসেবে গণ্য।

এখন ভেবে দেখুন, বর্তমানে এবং এর আগেও সাধারণ মুসলমানগণ ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদকে ভাল জ্ঞান করে আসছেন; মুকাল্লিদ বা অনুসারী হয়ে কালাতিপাত করছেন। এখনও আরব-'আজমের মুসলমানগণ ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ বা অনুসরণ করে থাকেন। সুতরাং, যে লা-মাযহাবী হল, সে 'ইজমায়ে উম্মত'কে অস্বীকার করলো। ইজমা বা সর্বসম্মত মতকে স্বীকার না করলে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত 'উমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকে কিরূপে প্রমাণ করবেন? তাঁদের খিলাফতও ইজমায়ে উম্মত থেকেই প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এ দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের খিলাফতকে অস্বীকার করে, সে কাফির হিসেবে গণ্য। (ফাতওয়ায়ে শামী ইত্যাদি কিতাব দেখুন) একই-ভাবে তাকলীদের ব্যাপারেও উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তাফসীরে খাযিনে وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, কুরআন শরীফে মুহাজিরগণকে

صّٰدِقِيْنَ (সত্যবাদী) আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে- اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (তাঁরাই সত্যবাদী) এর পর তিনি বলেছিলেন, وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (সত্যবাদীদের সাথে থাকুন) সুতরাং আপনারাও পৃথক খিলাফত কায়েম করবেন না, আমাদের সাথে থাকুন। অনুরূপ আমিও লা-মাযহাবীদেরকে বলছি সত্যবাদীরা তাকলীদ করেছেন, আপনারাও তাদের পথ অনুসরণ করুন অর্থাৎ মাযহাবের অনুসারী হোন।

আক্‌লী বা জ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণঃ এ পৃথিবীতে কোন লোক অপরের অনুসরণ ছাড়া কোন কাজই করতে পারে না। প্রত্যেক পেশা ও বিদ্যার নির্ধারিত রীতিনীতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোকদের নির্দেশ পালন করতেই হয়। ধর্মীয় বিষয়সমূহ পার্থিব কর্মকাণ্ডের তুলনায় অনেক জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল। অতএব, এতেও অভিজ্ঞ ধর্মীয় মনীষীদের অনুসরণ করতে হবে বৈকি। ইলমে হাদীছের মধ্যেও তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেমন, বলা হয় অমুক হাদীছটি যাঈফ (দুর্বল), কেননা ইমাম বুখারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বা অমুক মুহাদ্দিছ অমুক বর্ণনাকারীকে য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন। এখানে তাঁর অভিমতটা গ্রহণ করাটাই হলো তাকলীদ। কুরআনের কিরা'তের ব্যাপারেও ক্বারীদের তাকলীদ করা হয়। যেমন, বলা হয়ে থাকে, অমুক ক্বারী অমুক আয়াতটাকে এভাবে পড়েছেন। কুরআনের স্বরচিহ্ন, اِعْرَاب আয়াত اٰيَات। ইত্যাদির ব্যাপারেও তাকলীদ করা হয়। যখন জামাআতে নামায আদায় করা হয়, তখন সমস্ত মুক্তাদী ইমামেরই তাকলীদ করেন। ইসলামী রাজ্যে সমস্ত মুসলমান একজন বাদশাহের তাকলীদ করে থাকেন। রেল গাড়ীর সমস্ত যাত্রী এক ইঞ্জিনেরই তাকলীদ করেন। মোট কথা, মানুষ প্রত্যেকটি কাজেই অপরের অনুসারী বা মুকাল্লিদ।

স্মর্তব্য যে, উল্লেখিত সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের তাক্‌লীদের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে। নামাযের মধ্যে ইমাম একজন ছাড়া দু'জন হয় না, ইসলামী রাজ্যের বাদশাহ দু'জন হয় না। সুতরাং শরীয়তের ইমামও একজন ছাড়া দুইজন কি করে সম্ভব?

মিশকাত শরীফে 'কিতাবুল জিহাদ' এর 'আদাবুস সফর' অধ্যায়ে আছেঃ

اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ـ

অর্থাৎ- যখন তিনজন লোক ভ্রমণে বের হয়, একজনকে আমীর বা নেতা মনোনীত করা বাঞ্ছনীয়।

৫ম অধ্যায়

তাক্‌লীদ সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ এবং উহাদের উত্তর

তাক্‌লীদের বিরোধিতাকারীদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহ দু'ধরনের। কতগুলো হচ্ছে অবান্তর, বাজে সমালোচনামূলক কিংবা বিদ্রুপাত্মক। এগুলোর উত্তরের প্রয়োজন নেই। আর কতোগুলো হচ্ছে প্রতারণামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করে গায়র মুকাল্লিদগণ মাযহাবের অনুসারীগণকে ধোঁকা দিয়ে থাকে এবং সাধারণ মুকাল্লিদগণ তাদের প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ে। এ শেষোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর নিম্নে পেশ করা হলো।

১নং আপত্তিঃ তাকলীদ যদি একান্ত প্রয়োজন হতো, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহু) কেন কারও তাক্‌লীদ করেননি?

উত্তরঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কারো তাকলীদ করার প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা হুযুর আলইহিস সালামের সাহচর্য প্রাপ্ত হওয়ায় সমস্ত মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা বা ইমাম হিসেবে গণ্য। ফলস্বরূপ ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে), শাফি'ঈ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখ ধর্মীয় ইমামগণ তাঁদেরই অনুসরণ করেছিলেন।

মিশকাত শরীফের "ফযাইলুস সাহাবা" অধ্যায়ে আছেঃ

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اقْتَدَ يْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

(অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ তারকারাজির মত। তোমরা যে কারো অনুসরণ করো না কেন, সঠিক পথের সন্ধান পাবে।। উল্লেখিত হাদীছ গ্রন্থের একই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছেঃ-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

অর্থাৎ- তোমরা আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আকড়ে ধর। উত্থাপিত আপত্তিটার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কেউ বলতে পারে 'আমরা কারো উম্মত নই। কেননা আমাদের নবী আলাইহিস সালাম কারো উম্মত ছিলেন না। সুতরাং, উম্মত না হওয়াটা রসুল আলাইহিস সালামের সুন্নত।' এর উত্তরে বলতে হবে- হুজুর আলাইহিস সালাম নিজেই নবী, সবাই তাঁর উম্মত। অতএব, তিনি কার উম্মত হবেন? তদ্রূপ সাহাবায়ে কিরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) হলেন সবার ইমাম। সুতরাং, তাঁদের ইমাম আবার কে হবে?

ঐ শস্য ক্ষেতেই নদী-নালা থেকে পানি সরবরাহ করা হয়, যার অবস্থান সাগর থেকে অনের দূরে। মুকাব্বিরের তাকবীর শুনে ঐ সকল মুক্তাদীরাই নামায পড়েন, যারা ইমাম থেকে দূরে থাকেন। সাগর পাড়ের নিকটে অবস্থিত শস্য ক্ষেতের জন্য নদী-নালার পানির প্রয়োজন হয় না। আর প্রথম কাতারের মুক্তাদীগণের জন্য মুকাব্বিরের প্রয়োজন পড়ে না। সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহু) হচ্ছেন প্রথম কাতারের মুক্তাদী। তাঁরা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র সিনা মুবারক থেকে ফয়েয প্রাপ্ত। আমরা যেহেতু ঐ সাগর (হুযুরের সিনা মুবারক) থেকে অনেক দূরে, সেহেতু আমাদেরকে খালের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সাগর থেকে হাজার হাজার নদীর উৎপত্তি হয়, সেগুলোতে একই সাগরের পানি প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু নাম ও গতিপথ ভিন্ন ভিন্ন। কোনটাকে গংগা, কোনটাকে যমুনা বলা হয়। অনুরূপ, হুযুর আলাইহিস সালাম হলেন রহমতের সাগর। তাঁর সিনা মুবারক থেকে যে নদী উৎপত্তি হয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর পবিত্র বক্ষ মুবারক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, উহাকে হানাফী নামকরণ করা হয়েছে, আর যেটি ইমাম মালিক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সিনা মুবারক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, উহাকে মালিকী মায্‌হাব বলা হয়েছে। সব নদীর পানি এক ও অভিন্ন, কেবল নাম ভিন্ন ভিন্ন। ঐ সব নদীর পানির প্রয়োজন হয়েছে আমাদের, সাহাবায়ে কিরামের নয়। যেমন হাদীছের সনদ বা সূত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় আমাদের নিকট; সাহাবায়ে কিরামের নিকট উহার আদৌ প্রয়োজন নেই।

২য় আপত্তিঃ সঠিক পথের সন্ধানের জন্য কুরআন ও হাদীছই যথেষ্ট। কুরআন হাদীছে এমন কি বিষয় নেই, যার জন্য ফিক্‌হের সাহায্য নিতে হবে? কুরআনেই ইরশাদ করা হয়েছেঃ-

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

(আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোন কিছু বাকী নেই, যা' ঐশী নূরে আলোকিত

কুরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়নি) আরও বলা হয়েছেঃ-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

(আমি কুরআনকে শেখার বা স্মরণ রাখার বা মুখস্থ করার সুবিধার্থে সহজ করে দিয়েছি। স্মরণ করার কেউ আছে কি?)

এ আয়াত সমূহ থেকে বোঝা গেল, কুরআনের মধ্যে সব কিছু আছে এবং কুরআন প্রত্যেকের জন্য সহজ। তাই মুজতাহিদের নিকট যেতে হবে কি জন্য?

উত্তরঃ হিদায়তের জন্য কুরআন ও হাদীছ নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। এও ঠিক যে কুরআন-হাদীছের মধ্যে সব কিছু আছে। কিন্তু এ থেকে মাসাইল বের করার উপযুক্ততা থাকা চাই। সমুদ্রে অনেক মণিমুক্তা রয়েছে। এগুলো খুঁজে আনার জন্য ডুবুরীর প্রয়োজন। ইমামগণ হলেন সমুদ্রের ডুবুরীর মত। চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে সব কিছুর উল্লেখ আছে; তবুও আমাদেরকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়, ব্যবস্থাপত্র নিতে হয়। ধর্মীয় ইমামগণই হলেন আমাদের ডাক্তার সদৃশ। আর কুরআনের আয়াত وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ এ বলা হয়েছে কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য বা হিফ্জ করার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে; মাসাইল বের করার ক্ষেত্রে সহজ করে দেয়া হয়নি। যদি মাসাইল বের করা এতো সহজ হয়, তা'হলে হাদীছের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। কুরআনে সবকিছু আছে আর কুরআন সহজও। তবুও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কেন এলেন? কুরআনেই আছে وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (অর্থাৎ সেই নবী তাদেরকে আল্লাহর কালাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন।) কুরআন ও হাদীছ হলো রুহানী ঔষধ, আর ইমাম হলেন রুহানী ডাক্তার।

৩য় আপত্তিঃ কুরআন শরীফে মাযহাবের অনুগামীদের নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ-

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদরী ও ঋষিদেরকে খোদা মেনে নিয়েছে)

আরও বলা হয়েছেঃ-

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِهِ.

যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে ঝগড়া-ঝাটি হয়, সেটার মীমাংসার জন্য

আল্লাহ ও রাসূল (আলাইহস সালাম) এর শরাণাপন্ন হও।

আরোও ইরশাদ করা হয়েছেঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ.

(এটাই হলো আমার সরল পথ। এ পথেই চলো। অন্যান্য পথে চলিও না, অন্যান্য পথে গেলে এ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।)

আরও ইরশাদ করা হয়েছেঃ-

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا

(তারা বলে, আমরাতো ওই পথেই চলবো, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে চলতে দেখেছি।)

এ সমস্ত আয়াত ও এ ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের সামনে ইমামগণের নির্দেশ অনুযায়ী চলা কাফিরদেরই অনুসৃত পন্থা। সহজ সরল পথ একটিই। শাফেঈ, হানাফী, ইত্যাদি পথ চতুষ্টয় হলো বাঁকা পথ।

উত্তরঃ কুরআন করীম যে তাকলীদের নিন্দা করেছে, সেই সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কুরআনের আয়াত وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (অন্যান্য পথে চলিও না) দ্বারা ইহুদীবাদ, খৃষ্টাবাদ ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী মতাদর্শকে বোঝানো হয়েছে। আর হানাফী, শাফে'ঈ ইত্যাদি কয়েকটি পথ নয়, বরং একই স্টেশনগামী চারটি সড়ক বা একই নদী হতে উৎপন্ন চারটি খাল। তা না হলে গায়র মুকাল্লিদদের মধ্যে 'ছনায়ী' ও 'গযনবী' নামে যে দু'টো দল রয়েছে, সে সম্পর্কে কি বলা হবে? ভিন্ন ভিন্ন পথের প্রশ্ন একমাত্র 'আকাইদ' বা বিশ্বাসের বিষয়বস্তু সমুহের পরিবর্তনের সহিত সম্পৃক্ত। চার মাযহাবের আকীদাহ এক। আমলের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের ব্যাপারটিও গৌণ। এ ধরনের মতভেদ স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও বিরাজমান ছিল।

চতুর্থ আপত্তিঃ- এ আপত্তিটা নিম্নে উল্লেখিত চার পংক্তি বিশিষ্ট কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছেঃ-

ہوتے ہوئے مصطفے کی گفتار – مت مان کسی کاقول وکردار،

دین حق راچار مذہب ساختند – فتنہ دردین نبی انداختند،

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আলাইহিস সালামের নির্দেশাবলী যখন আছে, অন্য কারো উক্তি বা কর্মকে গ্রহণ করো না। ধর্মীয় ইমামগণ সত্য ধর্ম ইসলামে চারটি মাযহাব সৃষ্টি করে প্রিয় নবী আলাইহিস সালামের ধর্মে এক নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।

উত্তরঃ পথভ্রষ্ট চকড়ালবীদের রচিত কবিতার সাহায্যে উক্ত আপত্তি খণ্ডন করা হল। কবিতাটি নিম্নে উল্লেখিত হলো-

ہوتے ہوئے کبریاکی گفتار– مت مان بنی کاقول وکردار،

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী কুরআন যখন আছে, তাই নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কথা ও কর্ম অনুযায়ী চলো না। চকড়ালবীদের এ অবান্তর কথা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি লা-মাযহাবীদের কথাও বর্জনীয়।

উপরের প্রশ্নে উল্লেখিত কবিতার ২য় লাইনের সহিত সঙ্গতপূর্ণ আর এক লাইন এভাবে রচিত হলোঃ

مسجد دوخشت علیحدہ ساختند – فتنہ دردین بنی انداختند،

অর্থাৎ (লা-মাযহাবীগণ) দু'ইটের মসজিদ পৃথকভাবে নির্মাণ করে নবী (আলাইহিস সালাম) এর ধর্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

মাযহাব চারটি হওয়ার রহস্য আমি স্বরচিত কাব্য গ্রন্থে (দ্বীওয়ানে সালিক) নিম্নে বর্ণিত কবিতার দু'টো লাইনে এভাবে উদঘাটন করার প্রয়াস পেয়েছিঃ

چاررسل فرشتے چار چارکتب ہیں دین چار
سلسلے دونوں چار چار لطف عجب ہےچار میں
آتش وآب وخاک وباد سب کا انہی سے ہے ثبات
چار کاسارا ماجراختم ہے چار یار ہیں"

অর্থাৎঃ চারজন রসুল, চারজন ফিরিশ্‌তা, চারটি কিতাব, চারটি ধর্ম, শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে যথাক্রমে চারটি মাযহাব ও তারীকা। চার সংখ্যাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারের মধ্যে এক অপুর্ব মাধুর্য ও তৃপ্তিবোধ রয়েছে। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস-এ চার উপাদানের বদৌলতে সবকিছু অস্তিত্ববান হয়েছে। 'চার'

সংখ্যাটির বিশেষত্ব চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর (চার আসহাব) মধ্যেও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

চার সংখ্যাটি খোদার কাছে অতীব পছন্দনীয়। তিনি আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন চারটি, ঐশী ধর্মও সৃষ্টি করেছেন চারটি, মানুষকেও চারটি উপদানের সমন্বয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন, ইত্যাদি....। মানযিলে মাকসুদে পৌছার পথ চতুষ্টয় যদি বিলীন হয়ে যায়, তা'হলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, পথ চারটিই হতে পারে। কা'বা ঘরের চার দিক থেকে নামায পড়া হয়। কিন্তু সবার দৃষ্টি কা'বার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। অনুরূপ হুযুর আলাইহিস সালাম হলেন ঈমানের কা'বা। মাযহাব চারটি উক্ত কাবাগামী পথ চারটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। এমতাবস্থায় আপনারা (চারটি পথই রুদ্ধ বিধায়) কোন্ রাস্তা দিয়ে সেখানে পৌছবেন?

কোন এক কবি সুন্দর বলেছেনঃ

مذہب چار چوں چہار راہ اند – بہر منت جو جادہ پیمائی
خود یکے بینی ازچہار طرف – کعبہ راچوں تو سجدہ بنمائی

(অর্থাৎ চার মাযহাবই যখন চারটি পথ হিসেবে চিহ্নিত হল, কাজেই অনুগ্রহ লাভের জন্য যে কোন একটি পথ অবলম্বন কর। চর্তুদিক থেকে সিজ্‌দা দিলেও একটি মাত্র কা'বাই দৃশ্যমান হবে।

কুরআন থাকা সত্বেও যেমন হাদীসের প্রয়োজন হয়, অদ্রূপ হাদীছ থাকা সত্বেও ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা থাকে। ফিক্‌হ হলো কুরআন হাদীছের তাফসীর। যেই বিধি-বিধান আমরা কুরআন হাদীছে পাই না, ফিক্‌হ শাস্ত্রই উহাকে পরিস্ফুষ্ট করে তোলে।

৫ম আপত্তিঃ তাকলীদে খোদা ভিন্ন অন্যকে নির্দেশ প্রদানকারী মানা হয়, ইহা শিরক। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদও শিরক। মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমানঃ- إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

(আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ হুকুম করার অধিকারী নয়।)

উত্তরঃ যদি খোদা ভিন্ন অন্যকে বিচারক বা ফায়সালা করার অধিকারী নিযুক্ত

করা শিরক হয়, তাহলে হাদীছ মান্য করাও শিরকে পরিণত হল। অধিকন্তু, সমস্ত হাদীছবেত্তা, তাফসীরকারকগণও মুশরিক সাব্যস্ত হয়ে গেলেন; কেননা ইমাম তিরমীযী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আবু দাউদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে), মুসলিম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণও মুকাল্লিদ ছিলেন। আর ইমাম বুখারী (রহতুল্লাহে আলাইহে) প্রমুখ হাদীছ বিশারদগণও মুকাল্লিদ মুহাদ্দিছগণের শিষ্য ছিলেন। (তাইনী শরহে বুখারী দেখুন) আমি আমার রচিত দীওয়ানে সালেকে' এর উত্তর এ ভাবে দিয়েছিঃ

جوتیری تقلید شرک هوتی محدثین سارے هوتے مشرك

بخاری مسلم ابن ماجه امام اعظم ابو حنیفه،

که جتنے فقهاء محدثین هیں تمهارے خرمن سے خوشه چین هیں،

هوں واسطے سے که بے وسیله امام اعظم ابوحنیفه،

অর্থাৎ হে ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যদি আপনার তাকলীদ বা অনুসরণ করা শিরক হতো, তাহলে ইমাম বুখারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে), মুস-লিম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও ইবনে মাজা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মুশরিক বলে গণ্য হবেন। যত ফিক্হ বিশারদ ও হাদীছ বেত্তা আছেন, সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনারই সঞ্চিত স্তুপীকৃত জ্ঞান ভাণ্ডার হতে জ্ঞানরূপ সম্পদ আহরণ করে ধন্য হয়েছেন।

যে রিওয়ায়াতে (বা হাদীছ বর্ণনায়) একজন ফাসিক রাবী বা বর্ণনাকারীর উল্লেখ থাকে; সেই রিওয়ায়াত যাঈফ (দুর্বল) বা মাওযু (বানোয়াট) বলে গণ্য হয়। এম-তাবস্থায় যে রিওয়ায়াত কোন মুকাল্লিদ থাকে, সে রিওয়ায়াত মুশরিক (?) বর্ণনাকারীর সংশ্লিষ্টতার জন্য বাতিল (?) বলে গণ্য হবে। যেহেতু ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মুকাল্লিদ বিধায় মুশরিক (?) হয়ে গেলেন, সেহেতু তাঁদের রিওয়ায়াত সমূহ গ্রহণযোগ্য হবার কোন প্রশ্নই উঠে না। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ আগেই বাদ পড়ে গেলেন, কেননা তাঁরা মুকাল্লিদের তথা মুশরিকদের শিষ্য (?) এখন হাদীছ কোথেকে সংগ্রহ করবেন?

কুরআন পাক ইরশাদ করছেঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا.

(যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদের আশংকা কর, তাহলে পুরুষের পক্ষে একজন ও মেয়ের পক্ষের একজন শালিসকার নিযুক্ত করে পাঠাও।)

সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত 'আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও হযরত মু'আবিয় (রাদিআল্লাহু আনহু) শালিসকার নিয়োগ করেছিলেন। হুযুর আলাইহিস সালাম নিজেই বনী কুরায়জার ঘটনায় হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রাদিআল্লাহু আনহু) কে বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। উল্লেখিত আয়াত اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ এর অর্থ হলো আসল হুকুম আল্লাহরই। খোদা ভিন্ন অন্যান্য যে সব ব্যক্তিবর্গের নির্দেশাবলী রয়েছে, যেমন 'উলামা, ফিক্হবিদ ও মাশায়িখের নির্দেশাবলী; এরূপ হাদীছের নির্দেশমালা সবগুলোই পরোক্ষভাবে খোদার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদি উক্ত আয়াত দ্বারা খোদা ব্যতীত অন্যের হুকুম মানা শিরক বলে গণ্য করি, তাহলে বর্তমানে সারা দুনিয়ার লোক, যারা কোর্ট-কাচারীতে দায়েরকৃত মামলা মুকদ্দমায় বিচারকের রায়কে মেনে চলছেন, সবাইতো, মুশরিক (?) হয়ে গেলেন।

৬নং আপত্তিঃ মুজতাহিদের কিয়াস হচ্ছে এক প্রকারের ধারণা। ধারণা করাটা পাপ। কুরআন শরীফে ধারণা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কুরআন ইরশাদ করছেঃ-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

(হে ইমানদারগণ অনেক ধরনের ধারণা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন কোন ধারণা পাপ হিসেবে গণ্য হয় এবং কারো দোষক্রটি তালাশ করো না। এবং একে অপরের গীবত বা নিন্দা করো না।) সুতরাং, ধর্মের ব্যাপারে কেবল কুরআন সুন্নাহ মুতাবিক 'আমল করা চাই'; অন্য কাউকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন নিম্নে উল্লেখিত কবিতার একটি লাইনে ব্যক্ত হয়েছেঃ-

اصل دین آمد کتاب الله مقدم داشتن،

پس حدیث مصطفی از جان مسلم داشتن،

অর্থাৎ ধর্মের মূল কথা হলো আল্লাহর কিতাবকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া, এর পর হাদীছকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা।

উত্তরঃ এ প্রশ্নের উত্তর এ অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত পরিশিষ্টে প্রদান করা হবে, যেখানে 'কিয়াস' কাকে বলে, এর বৈশিষ্ট সমূহ কি কি-সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৭নং আপত্তিঃ ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন-যদি কোন হাদীছ সহীহ প্রমাণিত হয়, তখন সেটাই হবে আমার মাযহাব। অতএব আমরা (যারা তাকলীদের সমর্থক নই) ইমাম আবু হানীফার (রহমতুল্লাহে আলাই-হে) উক্তিকে হাদীছের বিপরীত·পাওয়ায় বর্জন করেছি। এগুলোই হলো গায়র মুকাল্লিদদের উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ। এর অতিরিক্ত আর কোন প্রমাণ তারা দিতে পারেন না। এ গুলোকেই সাজিয়ে গুজিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে বারবার বর্ণনা করে থাকেন।

উত্তরঃ এ কথা সত্য যে, ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন যদি আমার উক্তি কোন সহীহ হাদীছের পরিপন্থী প্রমাণিত হয়, তাহলে হাদীছ অনুযায়ী আমল করাটাই হবে আমার মাযহাব,এটি ইমাম সাহেবের (রহমতুল্লাহে আলাইহে) চুড়ান্ত পর্যায়ের খোদা ভীতির ইঙ্গিত প্রদান করে। এ ও ঠিক যে, মুজতাহিদের কিয়াস বা রায় ওখানেই প্রযোজ্য, যেখানে কোন 'নস' (সুস্পষ্ট আয়াত, হাদীছ ইত্যাদি) বিদ্যমান নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ যুগে সারা পৃথিবীতে এমন কোন মুহাদ্দিছ কি পাওয়া যাবে, যিনি সনদ সহ সমস্ত হাদীছ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত আছেন, যিনি বলতে পারেন যে ইমাম আ'জম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কোন্ হাদীছ থেকে কোন্ নির্দেশটি গ্রহণ করেছেন? আমাদের দৃষ্টি হাদীছের সুপ্রসিদ্ধ ৬টি গ্রন্থ 'সিহাহ সিত্তহ' এর সীমা পর্যন্ত প্রসারিত, এর বাইরে আমাদের দৃষ্টি পৌছায় না। তাই আমরা কিভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ইমাম সাহেবের এ নির্দেশ/উক্তি কোন এক হাদীছ থেকে গৃহীত হয়নি? হাদীছ শরীফেই তো বলা হয়েছেঃ-

اِذَا بَلَغَكُمْ مِنِّىْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوْهُ وَاِلَّا فَرُدُّوْهُ (مقدمه تفسيرات احمديه ص٤)

অর্থাৎ (নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যখন তোমাদের কাছে আমার কোন হাদীছ বর্ণিত হয়, তবে উহাকে আল্লাহর কালামের

সহিত মিলিয়ে দেখো। যদি কুরআনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে গ্রহণ করো; অন্যথায় বর্জন করো (তাফসীরাতে আহমদীয়ার মুকাদ্দমার ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এ হাদীছকে সামনে রেখে কোন চকড়ালভী মতাবলম্বী যদি বলে যে অনেক হাদীছ যেহেতু কুরআনের বিপরীত পাওয়া যায়, সেহেতু আমরা হাদীছকে বর্জন করে থাকি। যেমন, কুরআনে নির্দেশ আছে- মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন কর। আর হাদীছে আছে-নবীর পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হয় না। চকড়ালভীদের এ বক্তব্য যেমন গ্রণযোগ্য নয়, (হে গায়র মুকাল্লিদগণ) আপনাদের বক্তব্যও তেমনি অগ্রাহ্য।

৮নং আপত্তিঃ ইমাম আ'জম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীছ জানা ছিল না। এ জন্যইতো তাঁর রিওয়ায়াতসমূহ খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়; যে কয়টি আছে, সেগুলোও যা'ঈফ বা দুর্বল।

উত্তরঃ ইমাম আ'জম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) খুব উঁচুস্তরের মুহাদ্দিছ ছিলেন। হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এতগুলো মাসাইল বের করতে পারলেন কি করে? তাঁর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ 'মসনদে ইমাম আবু হানীফা' ও ইমাম মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ 'মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ' থেকে তাঁর হাদীছ সম্পর্কিত অনন্য সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত সিদ্দীক আকবরের (রাদআল্লাহু আনহু) রিওয়ায়াত খুব কমই দেখা যায়। তাই বলে কি তিনি মুহাদ্দিছ ছিলেন না? অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বনের কারণে রিওয়ায়াত স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইমাম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সমস্ত রিওয়ায়াতই বিশুদ্ধ। কেননা তাঁর জীবনকাল ছিল হুযুর আলাইহিস সালামের ইহক-ালীন জীবনের খুবই নিকটবর্তী। পরবর্তী কালে কোন কোন রিওয়ায়াতে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে ইমাম সাহেবের (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কিছু আসে যায় না। সনদ বা সূত্র যতই দীর্ঘতর হয়েছে, ততই দুর্বলতার মাত্রাও বেড়েছে।

সুক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নঃ কেউ কেউ এও প্রশ্ন করে যে, আপনাদের কথা মতো চার মাযহাবই সঠিক, এটা কিরূপে হতে পারে? যে কোন একটিই হক বা সঠিক হবে। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, 'ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহ তাহরীমী; আর ইমাম শাফি'ঈ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, ওটা ওয়াজিব। হয় ওয়াজিব

হবে, না হয় মাকরূহ হবে, দুটোই কি করে সঠিক হতে পারে?

উত্তরঃ এখানে 'হক' বা সঠিক বলতে যথার্থ বা প্রকৃত সত্য অর্থে বুঝানো হয়নি। 'হক' বলতে যা বুঝানো হয়েছে, তা হলো চার মাযহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করলে খোদার কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে না কেননা মুজতাহিদের ভুলত্রুটিও ক্ষমাযোগ্য। এক দিকে আমির মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও মওলা 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মধ্যে, অপর দিকে হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ও হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) এর মধ্যে গৃহযুদ্ধও হয়েছে। ন্যায় ও প্রকৃত সত্যের উপর যে কোন একজনই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু উভয়কে 'হকের' উপর প্রতিষ্ঠিত বলা হয়- এ অর্থে যে আল্লাহর কাছে কাউকে তজ্জন্য জওয়াবদিহি করতে হবে না। গভীর জংগলের মধ্যে এক ব্যক্তি কিবলার দিক নির্ণয় করতে পারছে না। সে নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চার রাকআত চার দিকে মুখ করে আদায় করেছে। কেননা যখনই তার ধারণা পাল্টে যায়, তখনই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাতে থাকে। কিবলা নিশ্চয় এক দিকেই ছিল, চতুর্দিকে ছিল না। তথাপি তার নামায শুদ্ধ হয়েছে, চতুর্দিকেই তার কিবলা ঠিক হয়েছে। মুজতাহিদের ইজতিহাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এতটুকু বলা হয়েছে যে, মুজতাহিদ ভুল করলেও একটি ছওয়াব পান। কুরআন করীম ইজতিহাদ প্রয়োগে হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর ভুল এবং হযরত সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এর সঠিক রায়ের কথা বর্ণনা করেছে। কিন্তু কারো উপর যৎসামান্য দোষারোপও করা হয়নি। বরং ইরশাদ করা হয়েছে كُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا (অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেককে আমি বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছি।)

মিশকাত শরীফের ইমারত' শীর্ষক আলোচনায় 'আল-আমল ফিল কাযা' অধ্যায় বর্ণিত আছেঃ-

اِذَا حَكَمَ الْحَكِمُ فَاجْتَهَدَ وَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَاَخْطَا فَلَهُ اَجْرٌ وَّاحِدٌ، (متفق عليه)

অর্থাৎ যখন বিচারক চিন্তাভাবনা করে রায় দেন, এবং রায়টা সঠিক হয়, তখন তিনি দু'টো ছওয়াব পাবেন! পক্ষান্তরে, বিচারক যখন সঠিক রায়ের জন্য চিন্তাভাবনা করেন কিন্তু সঠিক রায়টা অনুধাবন করতে ভুল করে ফেলেন, তখনও তিনি একটি ছওয়াবের ভাগী হবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে নিম্নোক্ত আপত্তিটা উত্থাপনের আর অবকাশ

রইল না। আপত্তিটা হচ্ছে কোন শাফে'ঈ মতাবলম্বী কর্ণমূল পর্যন্ত দুহাত উঠালে (নামাযের সময়) সঠিক বিবেচিত হয় কিন্তু কোন লা-মাযহাবী হাত উঠালে দূষণীয় হয়। এর পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? এর উত্তর হলো শাফে'ঈ মতাবলম্বী শরীয়তের হাকিম তথা মুজতাহিদ দ্বারা ফায়সালা করিয়ে হাত উঠায়। মুজতাহিদ ভুল করলেও তা ক্ষমাযোগ্য। অপরদিকে লা-মাযহাবী যেহেতু কোন মুজতাহিদের মতামত নেয়নি, সেহেতু সে সঠিক কাজ করলেও দোষী সাব্যস্ত হবে।

যেমন বিচারকের রায় ব্যতিরেকে নিজের হাতে আইনকে তুলে নিয়ে কোন কাজ করলে সেটা অপরাধ। কিন্তু কোর্ট থেকে বিচারকের রায় নিয়ে ঐ একই কাজ করলে কোন অপরাধ হয় না। বিচারকই এ ক্ষেত্রে দায়ী থাকেন, বিচারক ন্যায় নির্ণয়ে ভুল করলেও সেটা ধর্তব্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হুযুর আলাইহিস সালাম বদরের যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে কিয়াস বা যুক্তির ভিত্তিতে ফিদ্‌য়া (মুক্তিপণ) আদায় করেছিলেন, পরে এর বিপরীত কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। এতে বোঝা গেল, হুযুর আলাইহিস সালামের স্বীয় যুক্তিগ্রাহ্য এ কাজে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তা সত্তেও মুক্তপণ ফেরৎ দেওয়ার কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং ইরশাদ করেনঃ-

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا

অর্থাৎ এ সব মালামাল তোমরা ভোগ কর। এগুলো হালাল ও পবিত্র। বোঝা গেল ইজতিহাদ প্রয়োগে ভুল হলে, সে ভুলের জন্য কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না।

ঃ পরিশিষ্ট ঃ

'কিয়াস' সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা-

শরীয়তের দলীল চারটি- কুরআন, হাদীছ, ইজমা'য়ে উম্মত ও কিয়াস। ইজমা'র দলীল সমূহ আমি আগেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআন হাদীছের হুকুম হলো, "সাধারণ মুসলমানদের দলের অন্তর্ভুক্ত থাকো। যে এদের দল থেকে পৃথক হয়েছে, সে জাহান্নামী।" কিয়াসের আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় কিয়াস হলো মৌলিক মাসআলার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে ওটার সহিত কোন অমৌলিক মাসআলার কারণ ও বিধির দিক থেকে সমন্বয় সাধন করা। অর্থাৎ (মনে করুন) এমন একটি মাসআলা বা সমস্যার সমাধান বের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল, যার সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তখন কুরআন বা হাদীছে বর্ণিত আলোচ্য মাসআলার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ কোন

'আমল খুঁজ করে বের করা হল এবং এর কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় পূর্বক বলা হল যে, যেহেতু একই কারণ আলোচ্য মাসআলায় বিদ্যমান আছে, সেহেতু এ মাসআলায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরিকৃত হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ (১) কেউ জিজ্ঞাসা করলো, স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুকামের মাধ্যমে যৌনমিলন উপভোগ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? আমি উত্তর দিলাম যে ঋতু স্রাবের সময় অপবিত্রতার কারণে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হারাম। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও ঐ একই কারণে উক্ত কর্ম হারাম হবে। (২) কেউ জিজ্ঞাসা করলোঃ পিতা যদি কোন নারীর সহিত অবৈধভাবে ব্যভিচার করে তাহলে তার ছেলের সহিত উক্ত নারীর বিবাহ বৈধ হবে কিনা? উত্তরে আমি বললাম যে সঙ্গম ও পিতা-পুত্রের মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছেদ্য শারীরিক সম্পর্কের কারণে বাপের বিবাহিত স্ত্রী ছেলের জন্য হারাম। সুতরাং, এখানেও যেহেতু একই কারণ বিদ্যমান সেহেতু উক্ত মেয়েটি ছেলের জন্য হারাম হবে। এটাকেই 'কিয়াস' বলা হয়। কিন্তু শর্ত হলো যিনি কিয়াস করবেন, তাকে মুজতাহিদ হতে হবে। যার তার কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। কিয়াস আসলে শরীয়তের হুকুমকে প্রকাশ করে থাকে। ইহা স্বতন্ত্র বা স্বয়ং সম্পূর্ণ কোন বিধি প্রকাশ করে না। ইহা কুরআন,হাদীছ ও সাহাবীগণের কার্যাবলীতে বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

فَاعْتَبِرُوْا يَاُوْلِى الْاَبْصَارِ

(হে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, শিক্ষা গ্রহণ করো।) অর্থাৎ কাফিরদের অবস্থার সঙ্গে তোমাদের নিজেদের অবস্থা যাচাই করো। তোমরাও যদি তাদের মত আচরণ কর, তাহলে তোমাদেরও একই পরিণতি হবে। এ ছাড়াও কুরআনে মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার ঘটনাকে নিদ্রার সঙ্গে ও ক্ষেত শুকায়ে পুনরায় সবুজ শ্যামল রূপ ধারণ করার সঙ্গে তুলনা করেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

কুরআন শরীফে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাফিরদের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও কিয়াস।

বুখারী শরীফের কিতাবুল ইতিসামে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করা হয়েছে এবং নাম দেয়া হয়েছেঃ

بَابُ مَنْ شَبَّهَ اَصْلاً مَعْلُوْمًا بِاَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ حُكْمَهَا لِيُفْهِمَ بِهِ السَّائِلُ.

(যে কোন নির্দিষ্ট সুবিদিত নীতিকে এমন একটি রীতির সঙ্গে তুলনা করা, যার হুকম আল্লাহ তা'আলা ব্যক্ত করেছেন, যাতে প্রশ্নকারী বুঝতে পারে- এর বিবরণ সম্পর্কিত অধ্যায়)

উক্ত অধ্যায়ে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে, যেখানে হুযুর আলাইহিস সালাম কর্তৃক একটি মেয়ে লোককে কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা উল্লেখিত আছে। হাদীছটি হলোঃ

اِنَّ اِمْرَأةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ اَفَاَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّىْ عَنْهَا اَرَئَيْتِ لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اِقْضُوا الَّذِىْ لَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

অর্থাৎ একজন মেয়ে লোক হুযুর আলাইহিস সালামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল-আমার মা হজ্বের মান্নত করেছিলেন, এখন আমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব সমাপন করবো? ইরশাদ ফরমালেন- হ্যাঁ, হজ্ব করো, (এর পর বললেন) তোমার মায়ের কর্‌য থাকলে, তুমি তা পরিশোধ করতে কিনা? মেয়েটি আরয করলো জী হ্যাঁ। নবী করীম আলইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন, আল্লাহর কর্‌যও আদায় কর। কেননা আল্লাহ তা'আলার কর্‌য আদায়ের ব্যাপারটি সর্বাগ্রেই বিবেচ্য।

মিশকাত শরীফের কিতাবুল ইমারাত ماعلى الولاة অধ্যায়ে তিরমিযী শরীফের ১ম খণ্ডের ابواب الاحكام এর শুরুতে ও দারমী শরীফে উল্লেখিত আছে যে, যখন হুযুর আলাইহিস সালাম হযরত মু'আয ইবন জবল (রাদিআল্লাহু আনহু) কে ইয়ামনের বিচারক নিয়োগ করে পাঠালেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে? আরয করলেন-আল্লাহর কালাম দ্বারা। নবী আলাইহিস সালাম ফরমালেনঃ যদি আল্লাহর কালামে না পাও? আরয করলেন, তাঁর রসুলের সুন্নাত দ্বারা। নবী আলাইহিস সালাম ফরমালেনঃ যদি সেখানেও না পাও? আরয করলেনঃ

اَجْتَهِدُ بِرَائِىْ وَلَا اٰلُوْ قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى صَدْرِهِ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يَرْضٰى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

অর্থাৎ নিজের রায়কে সম্বল করে ইজতিহাদ প্রয়োগ করবো। (বর্ণনাকারী

বলেন) তখন হুযুর আলাইহিস সালাম তার বুকে হাত মারলেন এবং ফরমালেন খোদার শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দূতকে এমন কাজের উপযুক্ততা দিয়েছেন, যে কাজে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্ট হন।

এ থেকে কিয়াসের সমর্থনে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেল। যেহেতু হুযুর আলাইহিস সালামের ইহকালীন জীবনে 'ইজমা' হতে পারে না, সেহেতু মু'আয (রাদিআল্লাহু আনহু) ইজমার উল্লেখ করেননি! এরূপ সাহাবায়ে কিরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) কিয়াস করে এমন একটি মেয়েকে, যে মহর ধার্যকরণ ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, ও পরে স্বামী মারা গিয়েছিল, মহরে মিছল (উক্ত মেয়ের নিকট আত্মীয়ার ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মহরের সমপরিমাণ মহর) প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। (নাসায়ী শরীফ ২য় খণ্ড ৮৮ প্রষ্ঠা দেখুন) লা-মাযহাবীরা কুরআনের আয়াত اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ (অধিকাংশ ধারণার বশবর্তী হওয়া থেকে বিরত থাকো) এর ভিত্তিতে যে আপত্তিটা উত্থাপন করে থাকে, এর উত্তর হলো আয়াতে উল্লেখিত ধারণা বলতে খারাপ বা বিরূপ ধারণা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করো না। এ জন্যই তো উক্ত আয়াতের পরে গীবত (পরনিন্দা) ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে। তা না হলে কিয়াস ও গীবতের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান ঃ

انما النجوى من الشيطن

অর্থাৎ পরামর্শ করাটা শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। তাহলে কি প্রত্যেক পরামর্শই শয়তানী কাজ? কখনও নয়। বরং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক যে পরামর্শ, সেটাই হলো শয়তানী কাজ। তদ্রূপ যে সকল ক্ষেত্রে কিয়াসের নিন্দা করা হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে ওই কিয়াসের কথাই বলা হয়েছে, যা খোদার হুকুমের মুকাবিলায় প্রয়োগ করা হয়। যেমন শয়তান সিজদার নির্দেশ পাবার পর 'কিয়াস' করে, আল্লাহর হুকুমকে অগ্রাহ্য করল। এ ধরনের কাজ কুফর বৈ আর কি! লা মাযহাবীরা আরও বলে যে আল্লাহ তা'আলা ফরমান- انما اتبع مايوحى الى (আমার কাছে যে ওহী আসে আমি সেটারই

অনুসরণ করি) انما (ইন্নামা) শব্দটি حصر অর্থাৎ একটা বিশেষ দিককেই সীমাবদ্ধ করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ انما শব্দটি দ্বারা এ কথার উপর জোর দেয়া হয়েছে যে ওহী ছাড়া যেন আর কোন কিছু, যথাঃ- ইজমা, কিয়াস ইত্যাদির অনুসরণ করা না হয়। শুধু কুরআন-হাদীছেরই যেন অনুসরণ করা হয়। কিন্তু তাদের জানা দরকার যে ইজমা-কিয়াসের উপর 'আমল করা মানে কুরআন-হাদীছের উপরই 'আমল করা। কিয়াসের কাজ হলো কেবল পরিস্ফুট করে ব্যক্ত করা।

পরিশেষে কিয়াস অস্বীকারকারীদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ কুরআন হাদীছে পাওয়া না যায়, কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীছ সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিবৃত হয়, তখন কি করবেন? যেমন বিমানে নামায পড়ার কি নিয়ম? অনুরূপ জুমার নামাযে প্রথম রাকআতে জামাআতের মুসল্লীগণ মওজুদ ছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় রাক্আতে জামাআতের মুসাল্লীগণ পেছন থেকে চলে যান। তখন কি জুমা'র নামায আদায় করবেন, না জুহরের নামায? এ রকম অন্যান্য কিয়াস নির্ভর মাসাইলের বেলায় আপনাদের কি উত্তর হবে? এ জন্যই বলছি, কোন ধর্মতাত্ত্বিক ইমামের দামান দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরুন-এটাই সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।

ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞানের বর্ণনা

.এতে একটি ভূমিকা, দু'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্ট রয়েছে।

ভূমিকা

একে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

'গায়ব' এর সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদের বর্ণনা

'গায়ব' হচ্ছে এমন এক অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়, যা' মানুষ চোখ, নাক, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারে না এবং যা' কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিধিতেও আসে না। সুতরাং, পাঞ্জাবীদের জন্য বোম্বাই গায়ব বা অদৃশ্য নয়। কেননা হয়তো কেউ নিজ চোখে দেখে বা কারো কাছ থেকে শুনে বলছে যে বোম্বাই একটি শহর। ইহা হচ্ছে ইন্দ্রীয়লব্ধ জ্ঞান। অনুরূপ খাদ্যসামগ্রীর স্বাদ, সুঘ্রাণ ইত্যাদি অদৃশ্য নয়, কেননা এগুলো যদিও বা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে জ্বিন, ফিরিশতা, বেহেশ্‌ত-দোযখ এখন আমাদের জন্য গায়ব বা অদৃশ্য। কেননা এ গুলোকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিংবা বিনা দলিলে বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করা যায় না।

গায়ব দুই প্রকারঃ (১) এক ধরনের গায়ব আছে, যা যুক্তি প্রমান ভিত্তিক অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা অনুভব করা যায় (২) আর এক ধরনের গায়ব আছে, যা, দলি-লের সাহায্যেও অনুভব করা যায় না। প্রথম প্রকারের গায়বের উদাহরণঃ বেহেশ্‌ত-দোযখ এবং আল্লাহ পাকের স্বত্ত্বা ও গুণাবলী। এগুলো সম্পর্কে জগতের সৃষ্ট বস্তু ও কুরআনের আয়াতসমূহ দেখে জ্ঞান লাভ করা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের গায়বের উদাহরণঃ মহাপ্রলয় কখন সংঘঠিত হবে, মানুষ কখন মারা যাবে, স্ত্রীর গর্ভে ছেলে না মেয়ে, ভাগ্যবান না হতভাগ্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান। এ গুলো সম্পর্কে দলিল প্রমাণের সাহায্যেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হবে না। এ দ্বিতীয় প্রকারের গায়বকে (مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ) মাফাতিহুল গায়ব বা 'অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডার' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ ধরনের গায়ব সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلاَّمَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(তিনি (আল্লাহ) তাঁর গায়বী বিষয়াদি সম্পর্কে কাকেও অবগত করান না, তবে তাঁর মনোনিত রসুলকে (অদৃশ্য জ্ঞান দান করেন) যাকে তিনি রসুল রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন।)

তাফসীরে বয়যাবীতে يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

وَالْمُرَادُبِهِ الْخَفِىُّ الَّذِىْ لاَ يُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلاَ تَقْتَضِيْهِ بِدَاهَةُ الْعَقْلِ.

অর্থাৎ 'গায়ব শব্দ দ্বারা অদৃশ্য বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যা' ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না ও সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানানুভূতির আওতায়ও আসে না।

তাফসীরে কবীরে 'সূরা বাকারা'র শুরুতে ওই একই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ

قَوْلُ جُمْهُوْرِ الْمُفَسِّرِيْنَ اَنَّ الْغَيْبَ هُوَالَّذِىْ يَكُوْنُ غَائِبًا عَنِ الْحَاسَّةِ ثُمَّ هٰذَا يَنْقَسِمُ اِلٰى مَاعَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَّاِلٰى مَالاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ সাধারণতঃ তাফসীরকারকদের মতে গায়ব হলো এমন বিষয় যা' ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে গোপন থেকে যায়। অতঃপর গায়বকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ এক প্রকারের গায়ব হচ্ছে-সে সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াদি, যেগুলোর অবগতির জন্য কোনরূপ দলীল প্রমাণ নেই।

'তফসীরে রুহুল বয়ানে' সূরা বাকারার শুরুতে সেই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছেঃ

وَهُوَمَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيْبَةً كَامِلَةً بِحَيْثُ لاَ يُدْرَكُ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِبْتِدَاءً بِطَرِيْقِ الْبَدَاهَةِ وَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ وَهُوَالَّذِىْ اُرِيْدَ بِقَوْلِهٖ عِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهٖ وَهُوَ الْمُرَادُ.

(অর্থাৎ গায়ব হচ্ছে উহাই, যা' ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানানুভূতি থেকে সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে গোপন থাকে যে, কোন উপায়ে প্রথমদিকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না। গায়ব দুই প্রকারঃ এক প্রকারের গায়ব হলো যা'র সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত وَعِنْدَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (আল্লাহর কাছেই রয়েছে গায়বের চাবি সমূহ) এ ধরনের গায়বের কথাই বলা হয়েছে। অন্য প্রকারের গায়ব হলো, যার অবগতির জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলী। يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ দ্বারা এগুলোর কথাই বলা হয়েছে।

পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নের বিষয়টি উপস্থাপন করা গেলঃ

বং চোখ দ্বারা দেখা যায়, নাক দ্বারা ঘ্রাণ নেয়া হয়, মুখ দ্বারা স্বাদ ও কান দ্বারা স্বর অনুভব করা হয়। সুতরাং মুখ ও কানের জন্য রং হচ্ছে গায়ব। অনুরূপ, চোখের জন্য ঘ্রাণ হলো গায়ব। যদি কোন আল্লাহর প্রিয়বান্দা ঘ্রাণ ও স্বাদকে বিশেষ আকৃতিতে স্বচক্ষে অবলোকন করেন, তবে এও আপেক্ষিক ইলমে গায়ব علم غائب اضافى হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কিয়ামতের দিন কৃতকর্ম সমূহ বিভিন্ন আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হবে। যদি কেউ সেগুলোকে ওই আকৃতিতে এখানেই (এ জগতে) দেখে ফেলেন, তবে এও ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞানের আওতায় পড়বে।

হযরত গাউছে পাক (রাদিআল্লাহ আনহু) ফরমাচ্ছেনঃ-

وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْدُهُوْرٌ – تَمُرُّوَتَنْقَضِىْ اِلاَّ اَتَالِىْ

অর্থাৎ এ জগতে কোন মাস বা কাল আমার কাছে এসে আমার অনুমতি গ্রহণ না করে অতিবাহিত হয় না।

এ রকম যা' কিছু বর্তমানে মওজুদ বা অস্তিত্ববান না হওয়ায় বা অনেক দূরে কিংবা অন্ধকারে থাকার কারণে দৃষ্টিগোচর না হয়, তা'ও গায়ব হিসেবে গণ্য। এ সম্পর্কে জানাটাও অদৃশ্য জ্ঞান। যেমন হুযুর আলাইহিস সালাম ভবিষ্যতে উদ্ভাবিত কিংবা আবিষ্কৃত হবে-এমন সব বস্তু পর্যবেক্ষণ করেছেন বা হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মদীনা শরীফ থেকে নেহাওয়ান্দে অবস্থানরত হযরত সারিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) কে দেখেছিলেন এবং স্বীয় আওয়াজ তাঁর কাছে পৌছেদিয়ে ছিলেন। অনুরূপ কেউ যদি পাঞ্জাবে বসে মক্কা মুয়াজ্জামা বা অন্যান্য দূরবর্তী দেশসমূহকে হাতের তালু দর্শনের মত স্পষ্ট দেখতে পান, তবে তা'ও গায়বের

অন্তর্ভুক্ত হবে।

উপকরণ বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেই সমস্ত অদৃশ্য বস্তুকে অবলোকন করা হয়, উহা 'ইলমে গায়বের পর্যায় পড়ে না। যেমন যন্ত্রের সাহয্যে কোন মহিলার গর্ভস্থিত সন্তান বা সন্ততি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় বা টেলিফোন ও রেডিও দ্বারা দূরের আওয়াজ শুনা যায়। এ গুলোকে ইলমে গায়বের আওতাভুক্ত করা যায় না। কেননা গায়বের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, যা' কিছু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না, তা'ই গায়ব। আর টেলিফোন ও রেডিও মারফৎ শ্রুত আওয়াজ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুধাবন করা যায়। যন্ত্রের সাহায্যে গর্ভস্থিত শিশুর অবস্থা জানাটাও ইলমে গায়ব নয়। যন্ত্রই যখন শিশুর অবস্থা প্রকাশ করে দিল, তখন গায়ব রইলো কোথায়?

মোট কথা, যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে যদি কোন অদৃশ্য বা লুকায়িত বস্তু প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং প্রকাশিত হওয়ার পরেই আমরা উহার সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হই, তাহলে উহা ইলমে গায়বের পর্যায় পড়বে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় উপকারী বিষয় সমূহের বর্ণনা

ইলমে গায়ব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ভাল-মতে স্মরণ রাখতে পারলে খুবই উপকারে আসবে এবং অধিকাংশ আপত্তি সমূহ আপনা আপনিই মীমাংসা হয়ে যাবে।

(১) যে কোন বিষয়ের নিছক জ্ঞান দূষণীয় নয়। তবে, হ্যাঁ, দূষণীয় কোন কিছু করা বা করার উদ্দেশ্যে শিখা দূষণীয়। অবশ্য জ্ঞানের কোন কোন বিষয় অন্যান্য বিষয়াদির জ্ঞানের তুলনায় উৎকৃষ্ট যেমন আকাইদ, শরীয়তও সুফীবাদ সম্পর্কীত জ্ঞান অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞান থেকে উৎকৃষ্ট। কিন্তু কোন জ্ঞানই স্বভাবতঃ দূষণীয় নয়। উদাহরণ কুরআনের কোন আয়াত পাঠে অপরাপর আয়াত অপেক্ষা তুলনামুলক ভাবে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। قُلْ هُوَاللهُ পাঠে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের ছাওয়াব আছে, কিন্তু تَبَّتْ يَدَى এর মধ্যে এ পরিমাণ ছওয়াব নেই। (তাফসীরে রূহুল বয়ানে- وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِاللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا। আয়াত

সম্পর্কিত বিবরণ দ্রষ্টব্য) কিন্তু কোন আয়াতই খারাপ নয়। কেননা যদি কোন জ্ঞান দূষণীয় হতো, তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম জ্ঞানের আওতায় আসত না, কেননা তিনি যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে পবিত্র; অনুরূপ আল্লাহর স্বত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান ফিরিশতাদেরও ছিল। হযরত আদম (আলাহিস সালাম) কে জগতের ভালমন্দ সবকিছুর জ্ঞান দান করা হয়েছিল এবং এ জ্ঞানের দ্বারাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এ জ্ঞানের বদৌলতেই তিনি ফিরিশতাদের উস্তাদ সাব্যস্ত হয়েছিলেন। যদি খারাপ বস্তু সমূহের জ্ঞান দূষণীয় হতো, তাহলে আদম (আলাইহিস সালাম) কে সে জ্ঞান দান করে কখনও উস্তাদ নিযুক্ত করা হতো না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো কুফর ও শিরক। কিন্তু ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ বলেন হিংসা-দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ও শত্রুতা সম্পর্কিত জ্ঞান এবং কুফর ও শিরক সম্বলিত শব্দ সমূহ জানা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয়, যাতে সেসব নীতি বহির্ভূত কার্য থেকে বিরত থাকা যায়। অনুরূপ, যাদু দমন করার জন্য যাদুবিদ্যা শিখাও অত্যাবশ্যক। ফত্‌ওয়ায়ে শামীর মুকাদ্দামায় আছেঃ-

وَعِلْمُ الرِّيَاءِ وَعِلْمُ الْحَسَدِ وَالْعُجَبِ وَعِلْمُ الْاَلْفَاظِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمُكَفِّرَةِ وَلَعَمْرِىْ هٰذَا مِنْ اَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ.

অর্থাৎ রিয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মগরিমা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং হারাম ও কুফর সম্বলিত শব্দ সমূহ শিখা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। খোদার শপথ, ইহা একান্ত প্রয়োজনীয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শামীর উক্ত মুকাদ্দামায় علم نجوم ورمل (জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান) এর বর্ণনায় বলা হয়েছে জাহিরাতুন নাজেরা' নামক কিতাবে উল্লেখিত আছে যে, অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের (যে অঞ্চল শরীয়তের পরিভাষায় দারুল হরব নামে আখ্যায়িত) বিধর্মীদের যাদু প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে যাদুবিদ্যা শিখা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। ইহয়ায়ে উলুমের প্রথম খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় জ্ঞান সমূহের বর্ণনায় উল্লেখিত আছে যে, কোন বিদ্যার দোষ ত্রুটি নিছক বিদ্যার কারণে নয় বরং আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে উক্ত জ্ঞানের প্রয়োগ অনুসারে তিনটি কারণেই দূষণীয় হয়ে থাকে।

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, কোন কিছুর নিছক জ্ঞান দুষণীয় নয়। এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়। প্রশ্নটি

হচ্ছে-এ ধারণা পোষণ করা দরকার যে, হুজুর আলাইহিস সালামের খারাপ বিষয়াদির, যেমন চুরি, ব্যভিচার, যাদু, কবিতা ইত্যাদির জ্ঞান ছিল না। কেননা এগুলো সম্পর্কে জানাটা দূষণীয়। এজন্যেই তারা শয়তান ও হযরত আযরাইল (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞানের পরিধি হুজুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের তুলনায় বেশী প্রসারিত বলে দাবী করেন। প্রত্যুত্তরে বলতে হয়ঃ আচ্ছা, বলুন, এসব বিষয়ের জ্ঞান খোদার আছে কিনা? তাদের এ বক্তব্যটি অনেকটা অগ্নি উপাসকদের কথার মত। 'মজুসী' সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে যে, আল্লাহ তাআলা নিকৃষ্ট'বস্তু সমূহের সৃষ্টিকর্তা নন, কেননা খারাপ জিনিস সমূহ সৃষ্টি করাটাও দূষণীয় (নাউযু বিল্লাহ।) যদি যাদু বিদ্যা দূষণীয় হতো, তাহলে এর শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হারুত ও মারুত নামে দু'ফিরিশতা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন কেন? হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর সময়ের যাদুকরেরা যাদু বিদ্যার বদৌলতে হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর সত্যতা যাছাই করে তাঁর উপর ঈমান এনে ছিল। দেখুন, যাদু বিদ্যা (এখানে) ঈমানের ওসীলা হয়ে গেল।

(২) সমস্ত নবী ও সৃষ্টিকূলের জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামকে দান করা হয়েছে। মৌলভী কাসেম নানুতবী সাহেবও তাঁর 'তাহজিরুন নাস' কিতাবে এটা স্বীকার করেছেন। এর সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি পরে পেশ করা হবে। কোন সৃষ্ট জীবের যে বস্তুর জ্ঞান থাকবে, সে জ্ঞানের অধিকারী হুযুর আলাইহিস সালামও নিশ্চয় হবেন। বরং সবাই যে জ্ঞান লাভ করেছেন, উহা হুযুর আলাইহিস সালামের ভাগ বণ্টন থেকেই পেয়েছে। শিক্ষক থেকে ছাত্র যে জ্ঞান লাভ করে, সে বিষয়ে শিক্ষকেরও নিশ্চয়ই জ্ঞান থাকতে হবে। নবীগণের মধ্যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও আছেন। এ জন্যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও হযরত খলীলুল্লাহ (আলাইহিস) এর জ্ঞান সম্পর্কেও পরে আলোচনা করা হবে।

(৩) সমস্ত ঘটনাবলী যা পূর্বে সংঘটিত হয়েছে ও ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে, কুরআন ও লওহ মাহফুজে রক্ষিত আছে। এই লওহ মাহফুজ পর্যন্ত ফিরিশতা ও কোন কোন ওলী ও নবীগণের দৃষ্টি প্রসারিত। এবং সেটা সবসময় হুযূর (আলাইহিস সালাম) এর সামনে রয়েছে। এজন্য আমি লওহ মাহফুজ ও কুরআনী জ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত করবো।অনুরূপ তকদীরের লেখক ফিরিশতার জ্ঞান সম্পর্কেও আলে-

াচনা করবো। হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের বিস্তার প্রমাণ করার জন্যেই এসব বিষয়ের অবতারণা করা হবে।

৩য় পরিচ্ছেদ

ইলমে গায়ব সম্পর্কিত আকীদা বা মতবাদ ও ইলমে গায়বের বিবিধ পর্যায়ের বর্ণনা

ইলমে গায়ব তিন ধরনের রয়েছে এবং এঁদের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (খালিসুল ইতেকাদ গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত)।

প্রথম প্রকারঃ ১) মহান আল্লাহ তা'আলা সত্ত্বাগত ভাবেই জ্ঞানী। তিনি অবগত না করালে কেউ একটি অক্ষরও জানতে পারে না।

২) আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য আম্বিয়া কেরাম (আলাইসি সালাম) কে তাঁর আংশিক অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করেছেন।

৩) হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকূল থেকে বেশী। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও খলীল (আলাইহিস সালাম), মৃত্যুর ফিরিশতা এবং শয়তানও সৃষ্টিকূলের অন্তর্ভূক্ত।

এ তিনটি বিষয় ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত বিধায় এগুলো অস্বীকার করা কুফর।

দ্বিতীয় প্রকারঃ ১) আম্বিয়া কিরাম (আলাইহিস সালাম) এর মাধ্যমে আওলিয়া কিরাম (রহমতুল্লাহে আনহু) ও ইলমে গায়বের কিয়দংশ পেয়ে থাকেন।

৪) আল্লাহ তাআলা হুযুর আলাইহিস সালামকে পঞ্চ গায়বের অনেক ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত জ্ঞান দান করেছেন।

যে এ দ্বিতীয় প্রকারের ইলমে গায়বকে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট ও বদময-হাবী বলে গণ্য হবে। কেননা। এটা শত শত হাদীছকে অস্বীকার করার নামান্তর।

তৃতীয় প্রকারঃ ১) কিয়ামত কখন হবে, সে সম্পর্কেও হুযুর আলাইহিস সালাম জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

২) বিগত ও অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলী যা লওহ মাহফুজে সুরক্ষিত

আছে, সে সবের জ্ঞান, বরং এর চেয়েও বেশী জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামকে দান করা হয়েছে।

৩) হুযুর আলাইহিস সালামকে রূহের হাকীকত বা নিগূঢ় তত্ত্ব এবং কুরআনের সমস্ত অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদির জ্ঞান দান করা হয়েছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ইলমে গায়বে অবিশ্বাসীগণ যখন তাদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করে, তখন নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ('এজাহাতুল গায়ব' গ্রন্থের ৪পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

১) উপস্থাপিত আয়াতটি সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে ব্যাখ্যাকৃত হতে হবে, যা বিবিধ অর্থ বোধক বা রূপক ব্যাখ্যার যোগ্য হলে চলবে না। আর হাদীছ উপস্থাপিত করা হলে, হাদীছটি রেওয়ায়েতের দিক থেকে মুতাওয়াতির হতে হবে। (সাহাবায়ে কিরাম 'তাবেয়ীন ও তবেয়ে তাবেয়ীন' এ ৩টি যুগেই যে হাদীছের অগণিত বর্ণনাকারী হয়, উহাই হাদীছে মুতাওয়াতির।)

২) ঐ আয়াত বা হাদীছ যেন জ্ঞান দান করার বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, অর্থাৎ আল্লাহ জ্ঞান দান করেনি কিংবা 'আমাকে এ জ্ঞান দান করা হয়নি' এ ধরনের অস্বীকৃতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকতে হবে।

৩) কোন বিষয়কে প্রকাশ না করলে তাতে সে বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞানতা বোঝা যায় না। এমনও হতে পারে যে, প্রিয় নবী হুযুর আলাইহিস সালাম কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে উহা ব্যক্ত করেননি। অনুরূপভাবে হুযুর আলাইহিস সালামের এ কথা বলা যে 'আল্লাহ জানেন' 'আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না' কিংবা 'আমি কি জানি?' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের অস্বীকৃতি বোঝা যায় না। এ ধরনের উক্তি সত্ত্বাগত জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নীরব রাখার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪) যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, সে বিষয়টি যেন কোন

ঘটনা সম্পর্কিত হয় ও উহা কিয়ামত পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে হয়। কেননা আল্লাহর যাবতীয় গুনাবলীও কিয়ামতের পরবর্তী বিষয়াদি সম্পর্কিত জ্ঞানের আমরাও দাবী করি না।

এ চারটি পরিচ্ছেদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

ইলমে গায়বের প্রমাণ সম্বলিত বর্ণনা

এ অধ্যায়টি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা অদৃশ্য জ্ঞান প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন হাদীছের দ্বারা উহার প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে হাদীছের ব্যাখ্যাকারকদের ব্যাখ্যা দ্বারা গায়বের সমর্থনে উলামায়ে উম্মত ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের উক্তি সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে স্বয়ং অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকারকারীদের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে উহা প্রমাণ করা হয়েছে, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যুক্তিগত প্রমাণাদি ও আওলিয়া কিরামের ইলমে গায়ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রমাণ

(১) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ.

(এবং আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সমস্ত কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন। অতঃপর সে সমস্ত বস্তু ফিরিশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন।)

'তাফসীরে মাদারেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ

وَمَعْنٰى تَعْلِيْمِهٖ اَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ اَنَّهٗ تَعَالٰى اَرَاهُ الْاَجْنَاسَ الَّتِىْ خَلَقَهَا وَعَلَّمَهٗ اَنَّ هٰذَا اِسْمُهٗ فَرَسٌ وَهٰذَا اِسْمُهٗ بَعِيْرٌ وَهٰذَا اِسْمُهٗ كَذَا، وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَلَّمَهٗ اِسْمَ كُلِّ شَئٍ حَتَّى الْقَصْعَةَ وَالْمَغْرَفَةَ-

(হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়ার অর্থ হচ্ছে-আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর সৃষ্ট সব কিছু দেখিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে এটার নাম ঘোড়া, ঐটার নাম উট, এবং ওটার নাম অমুক। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে প্রত্যেক কিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন, এমন কি পেয়ালা ও কাঠের চামচের নাম পর্যন্ত।

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একই কথা বলা হয়েছে তবে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে-

وَقِيْلَ عَلَّمَ اٰدَمَ اَسْمَاءَ الْمَلٰئِكَةِ وَقِيْلَ اَسْمَاءَ ذُرِّيَّتِهٖ وَقِيْلَ عَلَّمَهُ اللُّغَاتِ كُلَّهَا-

(কারো মতে আদম (আলাইহিস সালাম) কে সমস্ত ফিরিশ্তাদের নাম, কারো মতে তাঁর সন্তান-সন্ততিদের নাম, আবার কারো মতে সমস্ত ভাষা শিখানো হয়েছিল)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কবীরে লিখা হয়েছেঃ-

قَوْلُهٗ اَىْ عَلَّمَهٗ صِفَاتَ الْاَشْيَاءِ وَنُعُوْتَهَا وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ اَنَّ الْمُرَادَ اَسْمَاءُ كُلِّ شَئٍ مِنْ خَلْقٍ مِنْ اَجْنَاسِ الْمُحْدَثَاتِ مِنْ جَمِيْعِ اللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِىْ يَتَكَلَّمُ بِهَا وَلَدُ اٰدَمَ الْيَوْمَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالرُّوْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا

(আদম (আলাইহিস সালাম) কে সমস্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাদি শিক্ষা দিয়েছেন। একথাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, সৃষ্টবস্তু দ্বারা বোঝানো হয়েছে অচিরন্তন প্রত্যেক বস্তুর নাম সমূহ, যেগুলো বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত হবে ও যে নামগুলো আজ পর্যন্ত আদম সন্তান-সন্ততিগণ আরবী, ফার্সী, রুমী ইত্যাদি ভাষায় ব্যবহার করে আসছে।

তাফসীরে আবুস সাউদে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

وَقِيْلَ اَسْمَاءَ مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ وَقِيْلَ اَسْمَاءَ خَلْقِهٖ مِنَ الْمَعْقُوْلَاتِ وَالْمَحْسُوْسَاتِ وَالْمُتَخَيَّلَاتِ وَالْمَوْهُوْمَاتِ وَالْهَمَهٗ مَعْرِفَةَ ذَوَاتِ الْاَشْيَاءِ وَاَسْمَاءَ هَاخَوَ اصَّهَا وَمَعَارِفَهَا اُصُوْلَ الْعِلْمِ وَقَوَانِيْنَ الصَّنْعَاتِ

وَتَفَاصِيْلَ الْاٰتِهَا وَكَيْفِيَةَ اِسْتِعْمَالَاتِهَا

(কারো মতে আদম (আলাইহিস সালাম) কে অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয়ের নাম শিখিয়েছেন। আর কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির নাম শিখিয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কাল্পনিক ও খেয়ালী সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছিলেন, সব কিছুর সত্ত্বা, নাম, বৈশিষ্ট্য, পরিচিতি জ্ঞান বা বিদ্যার নিয়মাবলী, পেশা ও কারিগরী নীতিমালা, এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের বিস্তারিত বর্ণনা ও সেগুলোর ব্যবহার প্রণালী আদম (আলাহিস সালাম) কে অবহিত করেছিলেন।)

তাফসীরে রুহুল বয়ানে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

وَعَلَّمَهُ اَحْوَالَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَعَلَّمَ اَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَاَسْمَاءَ ذُرِّيَّتِهِ وَاَسْمَاءَ الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَصَنْعَةَ كُلِّ شَيْئٍ وَاَسْمَاءَ الْمُدُنِ وَالْقُرٰى وَاَسْمَاءَ الطَّيْرِ وَالشَّجَرِ وَمَا يَكُوْنُ وَاَسْمَاءَ كُلِّ شَيْئٍ يَخْلُقُهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَسْمَاءَ الْمَطْعُوْمَاتِ وَالْمَشْرُوْبَاتِ وَكُلِّ نَعِيْمٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءَ كُلِّ شَيْئٍ وَفِى الْخَبَرِ عَلَّمَهُ سَبْعَ مِائَةِ اَلْفِ لُغَاتٍ–

(হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) সমস্ত জিনিসের অবস্থাদি শিখিয়েছেন এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত ধর্মীয়-পার্থিব উপকারিতার কথা বলে দিয়েছেন। তাঁকে ফিরিশতাদের নাম, তাঁর বংশধর, জীব জন্তু ও প্রাণীবাচক বস্তু সমূহের নাম শিক্ষা দিয়েছেন, প্রত্যেক জিনিস তৈরী করার পদ্ধতি, সমস্ত শহর ও গ্রামের নাম, সমস্ত পাখী বৃক্ষ রাজির নাম যা হয়েছে এবং যা হবে সবকিছুর নাম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হবে, সবকিছুর নাম, যাবতীয় আহর্য দ্রব্য-সামগ্রীর নাম, বেহেশ্তের প্রত্যেক নিয়ামতের নাম-মোট কথা প্রত্যেক কিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। হাদীছ শরীফে আছে যে আদম (আলাইহিস সালাম) কে সাত লাখ ভাষা শিখিয়েছেন।

উপরোক্ত তাফসীর সমূহ থেকে এতটুকু বোঝা গেল যে, যা কিছু হয়েছে ও যা কিছু হবে, সমস্ত কিছুর সম্পূর্ণ জ্ঞান হযরত আদাম (আলাইহিস সালাম) কে দান করা হয়েছে। তাঁকে বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান দান করেছেন, বিভিন্ন জিনিসের উপরকারিতা ও অপকারিতা, তৈরী করার পদ্ধতি, যন্ত্রপাতির ব্যবহার সবকিছু দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন আমাদের আকা মওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান ভাণ্ডার দেখুন।

সত্যি কথা এই যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর এ ব্যাপক জ্ঞান নবী করিম আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমুদ্রের এক ফোটা তুল্য বা ময়দানের এক কণা সদৃশ।

শাইখ ইব্‌নে আরবী তদ্বীয় "ফুতুহাতে মক্কীয়া" গ্রন্থে দশম অধ্যায়ে বলেছেনঃ-

اَوَّلُ نَائِبٍ كَانَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلِيْفَتُهُ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ–

(অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালামের প্রথম খলীফা ও প্রতিনিধি হলেন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)। এতে বোঝা গেল যে, হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) হলেন হুযুর আলাইহিস সালামের খলীফা। খলীফা' হচ্ছেন তিনিই, যিনি আসল বা প্রকৃত মালিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করেন। হুযুর আলাইহিস সালামের জন্মের আগেকার সমস্ত নবী (আলাইহিস সালাম) তাঁরই প্রতিনিধি ছিলেন। এ কথাটি মৌলভী কাসেম ছাহেবও তদীয় 'তাহজীরুন নাস' গ্রন্থে লিখেছেন, যার বর্ণনা পরে করা হবে। এ হলো প্রতিনিধির ব্যাপক জ্ঞানের অবস্থা।

কাযী আয়ায (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর 'শেফা শরীফ" এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নসিমুর রিয়ায' এ উল্লেখিত আছেঃ-

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْخَلَائِقُ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ فَعَرَفَهُمْ كُلَّهُمْ كَمَا عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا.

অর্থাৎ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে আরম্ভ করে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশজাত আওলাদকে হুযুর আলাইহিস সালামের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তঁদের সাবাইকে চিনেছিলেন, যেমনিভাবে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সবকিছুর নাম শিখানো হয়েছিল।

এ ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম সবাইকে জানেন, সকলকে চিনেন।

(২) وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

(এ রসুল তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সাক্ষী হবেন।)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে আযীযীতে' লিখা হয়েছেঃ-

رسول علیه السلام مطلع است بنور نبوت بردین هرمتدین بدین خود که در کدام درجه از دین من رسیده وحقیقت ایمان اوچیست وحجابے که بداں از ترقی محجوب مانده است کدام است پس ادمی شناسد گناهان شمارا و درجات ایمان شمارا واعمال بدونیك شمارا واخلاق ونفاق شمارا لهذا شهادت او دردنیا بحکم شرع درحق امت مقبول واجب العمل است.

অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম স্বীয় নবুয়তের আলোকে প্রত্যেক ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তির ধর্মের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। কোন্ ব্যক্তি ধর্মের কোন্ স্তরে পৌঁছেছেন, তার ঈমানের হাকীকত কি এবং তাঁর পরলৌকিক উন্নতির পথে অন্তরায় কি, এসব কিছুই তিনি জানেন। সুতরাং, হুযুর আলাইহিস সালাম তোমাদের পাপরাশি, তোমাদের ঈমানের স্তর সমূহ, তোমাদের ভালমন্দ কার্যাবলী এবং তোমাদের বিশুদ্ধ চিত্ততা ও কপটতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ জন্যই তো পৃথিবীতে উম্মতের পক্ষে বা বিপক্ষে তার সাক্ষ্য শরীয়তের বিধানমতে গ্রহণীয় এবং অবশ্যই পালনীয়।

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

هٰذَا مَبْنِىٌّ عَلٰى تَضْمِيْنِ الشَّهِيْدِ مَعْنَى الرَّقِيْبِ وَالْمُطَّلِعِ وَالْوَجْهُ فِىْ اِعْتِبَارِ تَضْمِيْنِ الشَّهِيْدِ الْاِشَارَةُ اِلٰى اَنَّ التَّعْدِيْلَ وَالتَّزْكِيَةَ اِنَّمَا يَكُوْنُ عَنْ خُبْرَةٍ وَمُرَاقَبَةٍ بِحَالِ الشَّاهِدِ وَمَعْنٰى شَهَادَةِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِمْ اِطِّلَاعُهٗ رُتْبَةَ كُلِّ مُتَدَيِّنٍ بِدِيْنِهٖ فَهُوَ يَعْرِفُ ذُنُوْبَهُمْ وَحَقِيْقَةَ اِيْمَانِهِمْ وَاَعْمَالَهُمْ وَحَسَنَاتِهِمْ وَسَيِّئَاتِهِمْ وَاِخْلَاصَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ وَغَيْرَ ذٰلِكَ بِنُوْرِ الْحَقِّ وَاُمَّتُهٗ يَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ بِنُوْرِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

অর্থাৎ এটা এ কারণেই যে, আয়াতে উল্লেখিত شهيد শব্দটি রক্ষণাবেক্ষণাকারী ও ওয়াকিফহাল কথাটাও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এ অর্থ দ্বারা একথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে কোন ব্যক্তির যথার্থতা ও দূষণীয়তার সাক্ষ্য প্রদান তখনই সম্ভবপর হবে, যখনই সাক্ষী উক্ত ব্যক্তির যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যকরূপে ওয়াকিফহাল হয়। হুযুর আলাইহিস সালামের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ

ব্যক্তির ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত। সুতরাং, বোঝা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম মুসলমানদের গুণাহ সমূহ, তাদের ইসলামের হাকীকত, তাদের ভালমন্দ কার্যাবলী, তাদের আন্তরিকতা ও কপটতা ইত্যাদিকে সত্যের আলোর বদৌলতে অবলোকন করেন। হুযুর আলাইহিস সালামের উম্মতের নিকটও তাঁর নূরের ওসীলায় অন্যান্য সমস্ত উম্মতগণের অবস্থাও কিয়ামতের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হবে।

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

ثُمَّ يُؤْتٰى بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَسْئَلُهٗ عَنْ حَالِ اُمَّتِهٖ فَيُزَكِّيْهِمْ وَيَشْهَدُ بِصِدْقِهِمْ٠

(অতঃপর কিয়ামতের দিন হুযুর আলাইহিস সালামকে আহবান করা হবে। এর পর আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন তিনি তাঁদের পবিত্রতা ও সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন।)

('তাফসীরে মাদারেকে' ২য় পারার সূরায়ে বাকারার' এ আয়াতের তাফসীরে লিখা হইয়াছেঃ-

فَيُؤْتٰى بِمُحَمَّدٍ فَيُسْئَلُ عَنْ حَالِ اُمَّتِهٖ فَيُزَكِّيْهِمْ وَيَشْهَدُ بِعَدَالَتِهِمْ٠ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُ بِعَدَالَتِكُمْ٠

অর্থাৎ অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে) আহবান করা হবে, তাঁর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন তিনি স্বীয় উম্মতের সাফাই বর্ণনা করবেন এবং তাদের ন্যায়পরায়ণ ও যথার্থ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন। সুতরাং হুযুর আলাইহিস সালাম আপনাদের যথার্থতা সম্পর্কে অবগত আছেন।

এ আয়াত ও তাফসীর সমূহে এটাই বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের (আলাইহিস সালাম) উম্মতগণ আল্লাহর দরবারে আরয করবে- হে আল্লাহ! আমাদের কাছে তোমার কোন নবী আগমন করেননি।' পক্ষান্তরে, ঐ সমস্ত উম্মতের নবীগণ আরয করবেনঃ- 'হে খোদা! আমরা তাদের কাছে গিয়েছি, তোমর নির্দেশাবলী তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি।' আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীগণকে বলা হবে- 'যেহেতু তোমরা বাদী, সেহেতু তোমাদের দাবীর সমর্থনে কোন সাক্ষী উপস্থাপন কর। তাঁরা তখন তাঁদের পক্ষে

সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে হুযুর আলাইহিস সালামের উম্মতকে পেশ করবেন। তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন 'হে আল্লাহ। তোমার নবীগণ সত্যবাদী, তাঁরা তোমার নির্দেশাবলী স্ব স্ব উম্মতের কাছে পৌছিয়েছিলেন।

এখানে দুটি বিষয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রথমতঃ মুসলমানগণ সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত কিনা। (ফাসিক, ফাজির ও কাফিরদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র পরহেযগার মুসলমানদের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য।) দ্বিতীয়তঃ এ সমস্ত লোকগণ তঁদের পূর্বেকার নবীগণের জামানা দেখেননি। তবুও তারা কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন? মুসলমানরা আরয করবেনঃ 'হে খোদা! আমাদেরকে তোমার হাবীব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, আগেকার নবীগণ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এটা শুনেই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' তখন হুযুর আলাইহিস সালামকে আহবান করা হবে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুটি বিষয়ের সাক্ষ্য দিবেন। একটি হলো এ সমস্ত লোকগণ এমন পাপিষ্ট বা কাফির নয় যে তঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তাঁরা পরহেযগার মুসলমান। অন্যটি হলো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলবেন-হ্যাঁ, আমিই তাদেরকে বলেছিলাম যে আগেকার নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের কাছে খোদার ফরমান পৌছিয়েছিলেন।

অতঃপর ঐ সব নবীগণের পক্ষে রায় দেয়া হবে।

এ বর্ণনা থেকে নিম্নোল্লেখিত কয়েকটি বিষয় জানা গেল। একঃ হুযুর আলাই- হিস সালাম কিয়ামত পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে আগমণকারী মুসলমানদের ঈমান, আমল, রোযা, নামায ও নিয়ত সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত। নচেৎ তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমানের অবস্থা তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত হতেই পারে না। হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর কওমের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অবস্থা জেনে আবেদন করেছিলেন-'হে খোদা! এদের বংশোদ্ভূত লোকগণও পাপিষ্ট ও কাফির হবে। সুতরাং, তুমি তাদেরকে ডুবিয়ে দাও।' হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) যে শিশুটিকে হত্যা করেছিলেন, তার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি সে জীবিত থাকে তবে অবাধ্য হবে। তাহলে হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে কারো অবস্থা কিভাবে গোপন থাকতে পারে?

দুইঃ- পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের উম্মতগণের অবস্থা হুযুর আলাইহিস সালাম

নূরে নবুয়তের বদৌলতে অবলোকন করেছিলেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাক্ষ্যটা ছিল একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য। যদি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আল- ইহে ওয়া সাল্লাম) সাক্ষ্য শ্রুত বিষয়ের সাক্ষ্য হতো, তাহলে এ ধরনের সাক্ষ্য মুস- লমানেরাতো আগেই দিয়েছে। শ্রুত বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের সর্বশেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নেয়া হয়।

তিনঃ- এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা-নবী যে সত্যবাদী, তা জানা সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে রায় দেন। অনুরূপ যদি হুযুর আলাইহিস সালাম, বিচার কার্য তদন্ত করেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করেন, তখন এ কথা বলা যাবে না যে, হুযুর আলাইহিস সালাম সে বিষয়ে অবগত নন। দায়েরকৃত মুকাদ্দমায় এটাই নিয়ম। (এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আমার রচিত কিতাব- শানে হাবীবুর রহমান- দেখুন) এ সাক্ষ্যের উল্লেখ পরবর্তী আয়াতের মধ্যেও রয়েছে।

(৩) وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ۔

অর্থাৎ যে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমি আপনাকে এদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে আনব।

'তাফসীরে নিশাপুরীতে' এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখিত আছেঃ-

لِاَنَّ رُوْحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاهِدٌ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَرْوَاحِ وَالْقُلُوْبِ وَالنُّفُوْسِ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ.

অর্থাৎ এটা এ কারণে যে, হুযুর আলাইহিস সালামের রূহ মুবারক সমস্ত রূহ, দিল ও সত্তা সমূহকে দেখতে পান। কেননা তিনিই বলেছেন- 'আল্লাহ তাআলা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো আমার নূর।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে আছেঃ-

وَاعْلَمْ اَنَّهٗ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْمَالُ اُمَّتِهٖ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَلِذَالِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ-

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে তাঁর উম্মতের আমলসমূহ সকাল- বিকাল পেশ হয়। তাই তিনি উম্মতকে তাদের চিহ্ন দৃষ্টে চিনেন ও তাদের কার্যাবলী

সম্পর্কেও অবগত হন। এ জন্য তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন।

'তাফসীরে মাদারেকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

اَىْ شَاهِدًا عَلٰى مَنْ اٰمَنَ بِالْاِيْمَانِ وَعَلٰى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ وَعَلٰى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ-

অর্থাৎঃ হুযুর আলাইহিস সালাম মুমিনেদের জন্য তাদের ঈমানের, কাফিরদের জন্য তাদের কুফরীর, ও মুনাফিকদের জন্য তাদের মুনাফেকীর সাক্ষী।

এ আয়াত ও তাফসীর সমূহ দ্বারা বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত লোকের কুফর, ঈমান, কপটতা, আমল ইত্যাদি সব কিছুই জানেন। এ জন্যই তো তিনি সকলের জন্য সাক্ষী। একেইতো বলে 'ইলমে গায়ব' বা অদৃশ্য জ্ঞান।

مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. (৪)

(কে সে, যে তার কাছে তার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে? তিনি তাদের পূর্বাপর সবকিছুই জানেন।)

'তাফসীরে নিশাপুরীতে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

يَعْلَمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ اَوَّلِيَاتِ الْاَمْرِ قَبْلَ الْخَلَائِقِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اَحْوَالِ الْقِيَامَةِ-

অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম সৃষ্টির আগেকার অবস্থাদি জানেন এবং সৃষ্টির পরে কিয়ামতের যে ভয়াবহ অবস্থাদি সংঘটিত হবে, তা'ও তিনি জানেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রূহুল বয়ানে আছেঃ-

يَعْلَمُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْاُمُوْرِ الْاَوَّلِيَاتِ قَبْلَ الْخَلَائِقِ وَمَاخَلْفَهُمْ مِنْ اَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَفَزَعِ الْخَلْقِ وَغَضَبِ الرَّبِّ-

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম সৃষ্টির আগের অবস্থা জানেন। সৃষ্টির পূর্বাপর যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত। কিয়ামতের অবস্থা, সৃষ্টিকূলের ভয়ভীতি, আল্লাহর গজব ইত্যাদির প্রকৃতি সম্পর্কেও সম্যকরূপে অবগত। এ আয়াত ও তাফসীর সমূহ দ্বারা বোঝা গেল যে, 'আয়াতুল কুরসী'র মধ্যে مَنْ ذَالَّذِىْ থেকে اِلَّا بِمَا شَآءَ পর্যন্ত হুযুর আলাইহিস সালামের তিনটি গুণের কথাই বিধৃত হয়েছে। বাকী অবশিষ্ট গুণাবলী আল্লাহর সহিত সম্পৃক্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট বিনা অনুমতিতে কেউ সুপারিশ করতে পারে না। যিনি সুপারিশ করার অনমতি প্রাপ্ত, তিনি হলেন প্রিয় নবী হুযুর আলাইহিস সালাম। সুপারিশকারীকে পাপীগণের পরিণাম ও অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই অবগত হতে হয়, যাতে অনুপযুক্তদের জন্য সুপারিশ করা না হয়, আর সুপারিশের উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যেন সুপারিশ থেকে বঞ্চিত না হয়। যেমন কোন ডাক্তারের আরোগ্য ও দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাক।একান্ত দরকার। এ জন্য বলা হয়েছে- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

যাকে আমি (আল্লাহ) সুপারিশকারী মোতায়েন করেছি, তাকে সব কিছুর জ্ঞানও দান করেছি, কেননা 'শাফায়াতে 'কুবরা' বা সুমহান সুপারিশের জন্য অদৃশ্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এ থেকে বোঝা গেল যে, যারা বলে যে হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামতের মাঠে মুনাফিকদেরকে চিনবেন না, বা হুযুর আলাইহিস সালাম নিজেই জানেন না তাঁর কি পরিণতি হবে; ইহা তাদের নিছক ভুল ধারণা ও ধর্মহীনতা মাত্র। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَئٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَاشَآءَ (৫)

অর্থাৎ- তারা তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কিছুই পায় না, তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছে করেন।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ আছেঃ-

يَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِىْ هُوَ شَاهِدٌ عَلٰى اَحْوَالِ هِمْ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ سِيَرِهِمْ وَمُعَامِلَاتِهِمْ وَقَصَصِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَاَحْوَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُمْ لَا

يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا مِّنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ اِلَّا بِمَاشَاءَ مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ عِلْمُ الْاَوْلِيَاءِ مِنْ عِلْمِ الْاَنْبِيَاءِ بِمَنْزِلَةِ قَطْرَةٍ مِنْ سَبْعَةِ اَبْحُرٍ وَعِلْمُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ عِلْمِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ وَعِلْمُ نَبِيِّنَا مِنْ عِلْمِ الْحَقِّ سُبْحَانَهٗ بِهٰذِ الْمَنْزِلَةِ فَكُلُّ رَسُوْلٍ وَّنَبِيٍّ وَّوَلِيٍّ اٰخِذُوْنَ بِقَدْرِ الْقَابِلِيَّةِ وَالْاِسْتِعْدَادِ مِمَّا لَدَيْهِ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَّتَعَدَّاهُ اَوْيَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ

(এও হতে পারে যে উক্ত আয়াতের عَلَيْهِ শব্দের ه ('হি') সর্বনাম দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালামের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম মানুষের অবস্থা অবলোকন করেন, তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের চরিত্র, তাদের আচরণ, তাদের ঘটনা প্রবাহ ও তাদের বিগত অবস্থাও তিনি জানেন। পরকালের হাল-হাকিকত ও বেহেশ্তী জাহান্নামী লোকদের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। ওই সমস্ত লোক হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান ভাণ্ডারের কিছুই জানতে পারেন না, তবে ততটুকু জানতে পারেন, যতটুকু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চান। আম্বিয়া কিরামের (আলাইহিস সালাম) জ্ঞানের সামনে আল্লাহর ওলীগণের জ্ঞান হলো সাত সমুদ্রের এক ফোটার সমতুল্য, আর হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের সামনে অন্যান্য আম্বিয়া কিরামের (আলাইহিস সালাম) জ্ঞানও তদ্রূপ, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমাদের হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানও তদ্রূপ। অতএব প্রত্যেক নবী, রসূল ও ওলী নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট থেকে আহরণ করেন। হুযুর আলাইহিস সাল-ামকে ডিঙিয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।)

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

يَعْنِىْ اَنْ يَّطَّلِعَهُمْ عَلَيْهِ وَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَلِيَكُوْنَ مَا يُطْلِعُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ غَيْبِهٖ دَلِيْلًا عَلٰى نُبُوَّتِهِمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّامَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

অর্থাৎঃ আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী ও রসুল, যা'তে তঁদের অদৃশ্য জ্ঞান নবুয়তের দলীলরূপে পরিগণিত হয়। যেমন আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেছেন-তাঁর বিশেষ অদৃশ্য বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করেন না, একমাত্র তাঁর সে রসুলের নিকট প্রকাশ করেন, যাঁর উপর তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট।"

'তাফসীরে মা'আলিমুত তানযীলে' উক্ত আয়াতের পেক্ষাপটে উল্লেখিত আছেঃ-

يَعْنِىْ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ اِلَّا بِمَاشَآءَ مِمَّا اَخْبَرَ الرُّسُلُ.

অর্থাৎঃ এ সকল লোক অদৃশ্য জ্ঞানকে বেষ্টন বা আয়ত্ত্ব করতে পারে না। শুধু ততটুকুই তারা লাভ করে, যতটুকু রসুলগণ তাদের নিকট পরিবেশন করেছেন।

এ আয়াত ও ব্যাখ্যাসমূহ থেকে এতটুকু বোঝা গেল যে, উল্লেখিত আয়াতে হয়তো আল্লাহর জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান কারো কাছে নেই, তবে তিনি যাকে জ্ঞানদানের ইচ্ছা করেন, তিনিই অদৃশ্য জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা নবীগণ (আলাইহিস সালাম) কে ইল্‌মে গায়ব দান করেছেন এবং তাঁদের ওসীলায় কোন কোন মুমিন বান্দাকেও দিয়েছেন। অতএব মুমিন বাদাগণও খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়ব লাভ করেছেন। কি পরিমাণ (ইলমে গায়ব) দেয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

অথবা, উল্লেখিত আয়াতে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারে না, অবশ্য তিনি যাকে দিতে চান, দান করেন। অতএব আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যার যতটুকু জ্ঞান অর্জিত হয়েছে বা হবে, উহা হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানসমূহের এক ফোটার সমতুল্য। যার মধ্যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম), ফিরিশতা ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ আয়াতে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

(৬) مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ–

অর্থাৎঃ হে সাধারণ লোকগণ, এটা আল্লাহর শান নয় যে, তোমাদেরকে ইল্‌মে গায়ব দান করবেন। তবে হ্যাঁ, রসুলগণের মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তাকে এ অদৃশ্য জ্ঞানদানের জন্য মনোনীত করেন।

'তাফসীরে বায়যাবী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُوْتِىَ اُحَدَكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيَطَّلِعُ عَلٰى مَافِى الْقُلُوْبِ مِنْ كُفْرٍ وَّاِيْمَانٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ لِرِسَالَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَيُوْحِىَ اللّٰهُ وَيُخْبِرُهٗ بِبَعْضِ الْمُغَيَّبَاتِ اَوْيَنْصِبُ لَهٗ مَايَدُلُّ عَلَيْهِ-

অর্থাৎঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন ইলমে গায়ব প্রদান করেন না, যাতে তোমরা ঈমান ও কুফর, যা মনে মনে পোষণ করা হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে অবগত হতে পার। কিন্তু তিনি তাঁর রসুলগণের মধ্যে যাঁদেরকে ইচ্ছে করেন, তাঁদেরকে মনোনীত করেন, তাঁদের উপর প্রত্যাদেশ করেন, তাঁদেরকেই আংশিক গায়ব সম্পর্কে অবহিত করেন, অথবা তাঁদের জন্য এমন কিছু প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন, যা' গায়বের পথ নির্দেশ করে থাকে।

'তাফসীরে খাযেনে' আছেঃ-

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَصْطَفِىْ وَيَخْتَارُ مِنْ رُسُلِهٖ مَنْ يُّشَاءُ فَيُطْلِعُهٗ عَلٰى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ-

অর্থাৎ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রসুলগণের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে করেন, মনোনীত করেন, আংশিক ইলমে গায়ব সম্পর্কে তঁদেরকেই অবহিত করেন।

'তাফসীরে কাবীরে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

فَاَمَّا مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِعْلَامِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِيَاءِ-

অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের ফলশ্রুতি স্বরূপ সে সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াদি জেনে নেয়া নবীগণ (আলাইহিস সালাম) এরই বৈশিষ্ট্য। জুমুলে উল্লেখিত আছেঃ

اَلْمَعْنٰى لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ اَنْ يَّصْطَفِىَ مِنْ رُسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَيُطْلِعُهٗ عَلَى الْغَيْبِ-

অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হলো-আল্লাহ তা'আলা রসুলগণের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছে করেন, মনোনীত করেন। অতঃপর তঁকে গায়ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন।

জালালাইনে উল্লেখিত আছেঃ

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوا الْمُنَافِقَ قَبْلَ التَّمَيُّزِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ وَيَخْتَارُ مَنْ يَّشَاءُ فَيُطْلِعُ عَلٰى غَيْبِهٖ كَمَا اَطْلَعَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে গায়ব সম্পর্কে অবহিত করবেন না, যা'তে মুনাফিকদেরকে আল্লাহ কর্তৃক পৃথকীকরণের পূর্বেই তোমরা চিনতে না পার, কিন্তু আল্লাহতা'আলা যাকে ইচ্ছে করেন, তাঁকে মনোনীত করেন, তার অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন যেমন নবী করীম আলইহিস সালামকে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' আছেঃ-

فَاِنَّ غَيْبَ الْحَقَائِقِ وَالْاَحْوَالِ لَا يَنْكَشِفُ بِلَا وَاسِطَةِ الرَّسُوْلِ-

(কেননা, রসুল আলাইহিস সালামের মাধ্যম ব্যতীত কারো নিকট অদৃশ্য ও রহস্যাবৃত অবস্থাও মৌলতত্ত্ব প্রকাশ করা হয় না।

এ আয়াত ও ব্যাখ্যাসমূহ থেকে বোঝা গেল যে, খোদার খাস ইল্‌মে গায়ব রসুলের নিকট প্রকাশিত হয়। কোন কোন তাফসীরকারক, যে ইল্‌মে গায়বের কিয়দংশের কথা বলেছেন, এ 'কিয়দংশ' কথাটি দ্বারা আল্লাহর অসীম জ্ঞানের তুলনায় নবীর অদৃশ্য জ্ঞানকে 'কিঞ্চিত পরিমাণ' বলা হয়েছে। কেননা সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে যা কিছু ঘটছে ও যা ঘটবে-এর সম্পূর্ণ জ্ঞানও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আংশিক বা যৎসামান্যই বটে।

(৭) وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(এবং আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, যা' আপনি জানতেন না। আপনার উপর আল্লাহর এটি বড় মেহেরবাণী।)

তাফসীরে জালালাইনে এ আয়াতের তাফসীরে লিখা হয়েছেঃ- اَىْ مِنَ

اَلْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ যা' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জানতেন না, তা হচ্ছে ধর্মের অনুশাসন ও অদৃশ্য বিষয়াদি- (জালালাইন)

তাফসীরে কাবীরে আছেঃ-

اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاَطْلَعَكَ عَلٰى اَسْرَارِهِمَا وَوَافَقَكَ عَلٰى حَقَائِقِهِمَا-

অর্থাৎঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর কুরআন ও হিকমত (জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন) অবতীর্ণ করেছেন, উহাদের গুপ্ত ভেদসমূহ উদ্ভাসিত করেছেন এবং উহাদের হাকীকত সমুহ সম্পর্কেও আপনাকে অবহিত করেছেন।

'তাফসীরে খাযেনে' উল্লেখিত আছেঃ-

يَعْنِىْ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ وَاُمُوْرِ الدِّيْنِ وَقِيْلَ عَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ عَلَّمَكَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْاُمُوْرِ وَاَطْلَعَكَ عَلٰى ضَمَائِرِ الْقُلُوْبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ اَحْوَالِ الْمُنَافِقِيْنَ وَكَيْدِهِمْ.

অর্থাৎঃ শরীয়তের আহকাম ও ধর্মীয় বিষয়াদি আপনাকে শিখিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আপনাকে ইল্‌মে গায়বের আওতাভুক্ত সে সমস্ত বিষয়াদিও শিখিয়েছেন, যা' আপনি জানতেন না। আরও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো আপনাকে রহস্যাবৃত, গোপণীয় বিষয়সমূহ শিখিয়েছেন, অন্তরের লুকায়িত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, মুনাফিকদের ধোকাবাজি ও বাওতাবাজি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

'তাফসীরে মাদারেকে' আছেঃ-

مِنْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ وَالشَّرَائِعِ اَوْمِنْ خَفِيَّاتِ الْاُمُوْرِ وَضَمَائِرِ الْقُلُوْبِ.

(দ্বীন ও শরীয়তের বিষয়সমূহ শিখিয়েছেন আপনাকে এবং গোপণীয় বিষয়াদি ও

মানুষের অন্তরের গোপণীয় ভেদ ইত্যাদিও শিখিয়ে দিয়েছেন)

তাফসীরে হুসাইনী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাহরুল হাকায়েক' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে-

آں علم ماکان ومایکون هست که حق سبحانه درشب اسرا بدان حضرت عطافرمود، چنانچه درحدیث معراج هست که من درزیر عرش بودم قطره درخلق من ریختند فَعُلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ-

এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান, যা' আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালামকে পবিত্র মেরাজ রজনীতে দান করেছিলেন। এ মর্মে মেরাজের হাদীছে উল্লেখিত আছে-আমি আরশের নিচে ছিলাম, তখন একটি ফোটা আমার কণ্ঠনালীতে ঢেলে দেওয়া হল, এরপর আমি অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলীর জ্ঞান লাভ করলাম।)

'জামেউল বয়ান' তাফসীর গ্রন্থে আছে قَبْلَ نُزُوْلِ ذٰلِكَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْاُمُوْرِ। অর্থাৎ আপনাকে সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ বলে দিয়েছেন, যা' কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে আপনার জানা ছিল না।

এ আয়াত ও বর্ণিত ব্যাখ্যা সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামকে অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। আরবী ভাষায় مَا শব্দটি ব্যাপকতা প্রকাশের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। তাই উক্ত আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, শরীয়তের বিধি বিধান, দুনিয়ার সমস্ত ঘটনাবলী, মানুষের ঈমানী অবস্থা ইত্যাদি, যা' কিছু তাঁর জানা ছিল না, তাঁকে সম্যকরূপে অবগত করান হয়। "কেবলমাত্র 'ধর্মীয় বিধানাবলীর' জ্ঞান দান করা হয়েছিল" আয়াতের এরূপ সীমিত অর্থ গ্রহণ করা মনগড়া ভাবার্থ গ্রহণ করার নামান্তর, যা' কুরআন, হাদীছ ও উম্মতের আকীদার পরিপন্থী। এ সম্বন্ধে সামনে আলোচনা হবে।

(৮) مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اِنَّ الْقُرْاٰنَ مُشْتَمِلٌ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ

আমি এ কিতাবে (কুরআনে) কিছু বাদ দিইনি, কুরআন করীমে সমস্ত অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

'তাফসীরে আনওয়ারুত তানযীলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

يَعْنِى اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظ فَاِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلٰى مَايَجْرِىْ فِى الْعَالَمِ مِنْ جَلِيْلٍ وَّدَقِيْقٍ لَمْ يُهْمَلْ فِيْهِ اَمْرُ حَيْوَانٍ وَّلَا جَمَادٍ.

অর্থাৎঃ 'কিতাব' শব্দ দ্বারা লওহে মাহফুজকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, এ লওহে মাহফুজে জগতের সমস্ত কিছুই উল্লেখিত, প্রত্যেক প্রকাশ্য, সুক্ষ্ম বিষয় বা বস্তু, এমনকি, কোন জীব জন্তু বা জড় পদার্থের কথাও বাদ দেয়া হয়নি।

'তাফসীরে আরায়েসুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছেঃ-

اَىْ مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ ذِكْرَ اَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ لٰكِنْ لَا يَبْصُرُ ذِكْرَهُ فِى الْكِتَابِ اِلَّا الْمُؤَيَّدُوْنَ بِاَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ.

অর্থাৎঃ এ 'কিতাবে' সৃষ্টিকুলের কোন কিছুরই কথা বাদ রাখা হয়নি, কিন্তু মারেফতের আলোকে মদদপুষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া তা' কারো দৃষ্টি গোচর হয় না।

প্রখ্যাত ইমাম শা'রানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'তবকাতে কুবরার' মধ্যে লিখেছেন (ইদখালুস সেনান' গ্রন্থের ৫৫ পৃঃ হতে সংগৃহীত।)

وَلَوْفَتَحَ اللّٰهُ عَنْ قُلُوْبِكُمْ اَقْفَالَ السُّدَدِ لَاَطَّلَعْتُمْ عَلٰى مَافِى الْقُرْاٰنِ مِنَ الْعُلُوْمِ وَاسْتَغْنَيْتُمْ عَنِ النَّظْرِ فِى سِوَاهُ فَاِنَّ فِىْ جَمِيْعِ مَارُقِمَ فِىْ صَفَحَاتِ الْوُجُوْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ-

(যদি আল্লাহতা'আলা তোমাদের হৃদয়ের তালাবদ্ধ প্রকোষ্টের তালা খুলে দেন, তাহলে তোমরা কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পাবে এবং কুরআন ভিন্ন অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী হতে হবে না। কেননা কুরআনের মধ্যে অস্তিত্ববান সব কিছুই বিধৃত আছে। আল্লাহ তা'আলা ফরমান- এমন কিছু নেই, যা আমি কুরআনে বর্ণনা করিনি।)

এ আয়াত ও এর বর্ণিত তাফসীর সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, 'কিতাবের' মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত অবস্থার কথা বিদ্যমান আছে। 'কিতাব' বলতে কুরআন বা লওহে মাহফুজকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন হোক বা লওহে মাহফুজ হোক, উভয়ের জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামের আছে। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা হবে। ফলস্বরূপ, দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয় হুযুর আলাইহিস সালামের জানা আছে। কেননা কুরআন ও লওহে মাহফুজ সমস্ত জ্ঞানের আধার, উভয়টি সম্পর্কে হুযুর পুরনুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওয়াকিবহাল।

وَلَارَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ. (৯)

(এবং শুষ্ক ও আর্দ্র এমন কিছুই নেই, যা উজ্জ্বল 'কিতাবে' লিপিবদ্ধ হয়নি।)

'তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' উক্ত আয়াতের তাফসীর এভাবে করা হয়েছেঃ-

هُوَاللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ فَقَدْ ضَبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ جَمِيْعَ الْمَقْدُوْرَاتِ الْكَوْنِيَّةِ لِفَوَائِدَ تَرْجِعُ اِلَى الْعِبَادِ يَعْرِفُهَا الْعُلَمَاءُ بِاللّٰهِ.

অর্থাৎঃ 'উজ্জ্বল কিতাব' দ্বারা লওহে মাহফুজের কথাই বলা হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার কল্যাণার্থে সম্ভাব্য সকল বিষয় একত্রিত করেছেন। উলামায়ে রব্বানীই এসব বিষয়ে অবগত।

'তাফসীরে কাবীরে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ

وَفَائِدَةُ هٰذَا الْكِتَابِ اُمُوْرٌ اَحَدُهَا اَنَّهُ تَعَالٰى كَتَبَ هٰذِهِ الْاَحْوَالَ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ لِتَقِفَ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى نِفَاذِ عِلْمِ اللّٰهِ فِى الْمَعْلُوْمَاتِ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ عِبْرَةً تَامَّةً كَامِلَةً لِلْمَلٰئِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ لِاَنَّهُمْ يُقَابِلُوْنَ بِهِ مَايَحْدُثُ فِىْ صَحِيْفَةِ هٰذَا الْعَالَمِ فَيَجِدُوْنَهُ مُوَافِقًالَهُ.

অর্থাৎঃ (লওহে মাহফুজে) এ ধরনের লিখার পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ওই সমস্ত বিষয়াদি লওহে মাহফুজে এ জন্য লিখেছেন, যা'তে ফিরিশতাগণ সর্বাবস্থায় খোদার ইলম জারী হওয়া সম্পর্কে অবগত

হন। সুতরাং এটা লওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণের জন্য পুরোপুরি শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে পরিণত হয়।। কেননা তাঁরা জগতে নিয়ত ঘটমান নতুন নতুন বিষয়কে ওই লিখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন ও লওহে মাহফুজের লিখার অনুরূপ সবকিছু সংঘটিত হতে দেখতে পান।

তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ

وَالثَّانِى اَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ لِاَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ فِيْهِ عِلْمَ مَايَكُوْنُ وَمَاقَدْ كَانَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَفَائِدَةُ اِحْصَاءِ الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ لِتَقِفَ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى اِنْفَاذِ عِلْمِهٖ-

(দ্বিতীয় অর্থে كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ বলতে লওহে মাহফুজকে বোঝানো হয়েছে। কেননা যা কিছু হবে এবং আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বে যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর বিবরণ এতে লিখে দিয়েছেন। এসব কিছু লিখার উপকারিতা হলো ফিরিশতাগণ তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞান জারী করার বিষয়ে অবগতি লাভ করতে সক্ষম হন।)

'তাফসীরে মাদারেকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-وَهُوَعِلْمُ اللّٰهِ اَوِاللَّوْحِ। অর্থাৎ আয়াতে উল্লেখিত 'উজ্জল কিতাব' দ্বারা খোদার জ্ঞান বা লওহে মাহফুজকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'তাফসীরে তানভীরুল মিকিয়াস ফি তাফসীরে ইবনে আব্বাসে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

كُلُّ ذٰلِكَ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مُبِيْنٌ مِقْدَارُهَا وَوَقْتُهَا (এসব বিষয় লওহে মাহফুজে উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ সে সব কিছুর পরিমাণ ও সময় উল্লেখিত আছে।)

উল্লেখিত আয়াত ও এর তাফসীর সমূহ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, লওহে মাহফুজে কঠিন, তরল, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট প্রত্যেক কিছুর কথা উল্লেখিত আছে। এ লওহে মাহফুজ সম্পর্কে ফিরিশতা ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ সম্যকরূপে অবগত। যেহেতু এসব হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু, এ সমস্ত জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা মাত্র।

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًالِكُلِّ شَيْئٍ. (১০)

(হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক কিছুর সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত।)

'তাফসীরে হুসাইনী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

نزلنا فرستاديم، عليك الكتاب: برتوقرآن تبيانالكل شئ: بيان روشن برائے همه چيز ازاموردين ودنيا تفصيل واجمال،

(আমি আপনার কাছে দ্বীন-দুনিয়ার প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ভরপুর কুরআন অবতীর্ণ করেছি।)

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখিত আছেঃ-

يَتَعَلَّقُ بِاُمُوْرِ الدِّيْنِ مِنْ ذٰلِكَ اَحْوَالُ الْاُمَمِ وَاَنْبِيَاءِهِمْ.

অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয় সমূহের সহিত সম্পৃক্ত বিবরণের জন্য (কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে)। এতে উম্মত ও তাদের নবীগণের অবস্থাও অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীরে 'ইতকানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

قَالَ الْمُجَاهِدُ يَوْمًا مَامِنْ شَيْئٍ فِى الْعَالَمِ اِلَّاهُوَفِى كِتَابِ اللّٰهِ فَقِيْلَ لَهٗ فَاَيْنَ ذِكْرُ الْخَانَاتِ فَقَالَ فِىْ قَوْلِهٖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ-

অর্থাৎ একদিন হযরত মুজাহিদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছিলেন, জগতে এমন কোন জিনিস নেই, যার উল্লেখ কুরআনে নেই। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ সরাইখানা সমূহের উল্লেখ কোথায় আছে? তখন তিনি বললেন لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْ بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ এ আয়াতেই উহাদের উল্লেখ আছে। আয়াতটির অর্থ হলো ঃ যেসব ঘরে কেউ থাকে না, অথচ যেখানে তোমাদের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম রাখা হয়, সে সমস্ত ঘরে প্রবেশ করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না।'

এ আয়াত ও এর ব্যাখ্যা সমূহ থেকে এ কথাই বোঝা গেল যে, কুরআনের

মধ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট প্রত্যেক কিছুর উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাহবুব আলাইহিস সালামকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

সুতরাং সমস্ত কিছুই হযরত মুস্তাফা আলাইহিস সালামের জ্ঞানের আওতাধীন।

وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ (১১)

(এবং লওহে মাহফুজে যা কিছু লিখা আছে, কুরআনে তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই।)

তাফসীরে 'জালালাইনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

تَفْصِيْلُ الْكِتَابِ يُبَيِّنُ مَاكَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْاَحْكَامِ وَغَيْرِهَا.

অর্থাৎ ইহা বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ। এতে আল্লাহ তা'আলার লিখিত বিধানাবলী ও অপরাপর বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 'জুমুলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আছেঃ-

اَىْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ.

অর্থাৎ লওহে মাহফুজে সবকিছুই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

اَىْ وَتَفْصِيْلَ مَا حُقِّقَ وَاُثْبِتَ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالشَّرَائِعِ وَفِى التَّاوِيْلَاتِ النَّجْمِيَّةِ اَىْ تَفْصِيْلَ الْجُمْلَةِ الَّتِىْ هِىَ الْمُقَدَّرُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْكِتٰبِ الَّذِىْ لَا يَتَطَرَّقُ اِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْاِثْبَاتُ لِاَنَّهٗ اَزَلِىٌّ وَاَبَدِىٌّ-

অর্থাৎঃ এ কুরআন হচ্ছে শরীয়ত ও হাকীকতের প্রমাণিত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ। 'তাবীলাতে নজ্‌মিয়া'তে উল্লেখিত আছে যে, কুরআনে সে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, যা' অদৃষ্টে আছে, এবং যা' সেই কিতাবে (লওহে মাহফুজ) লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেখানে কোনরূপ রদবদলের অবকাশ নেই। কেননা অনাদি ও অনন্ত।

উপরোক্ত আয়াত ও ব্যাখ্যাসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কুরআন শরীফে শরীয়তের অনুশাসন সমূহ ও সমস্ত জ্ঞান মওজুদ আছে। এ আয়াত থেকে আরও

বোঝা গেল যে, কুরআন শরীফে পুরা লওহে মাহফুজের বিস্তারিত বিবরণ আছে। আর লওহে মাহফুজ হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের আকর। কুরআনেই উল্লেখিত আছেঃ-

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ এবং কুরআনে আরও এরশাদ করা হয়েছে- اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ সুতরাং, লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ সমস্ত কিছুর জ্ঞান হুযুর পুর নুর আলাইহিস সালামের রয়েছে। কেননা, কুরআন হচ্ছে লওহে মাহফুজেরই বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ।

مَاكَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ (১২) يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ-

(এ কোন বানোওয়াট কথা নয়, এতে রয়েছে আল্লাহর আগের উক্তি সমূহের সত্যায়ন ও প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা।)

তাফসীরে 'খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছেঃ-

يَعْنِىْ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ تَفْصِيْلُ كُلِّ شَيْئٍ تَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُوْدِ وَالْاَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْاَمْثَالِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْعِبَادُ فِىْ اَمْرِ دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ-

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার নিকট অবতীর্ণ এ কুরআনে রয়েছে সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হালাল-হারাম, শাস্তি বিধান, আহকাম, কাহিনী সমূহ, উপাদেশাবলী ও উদাহরণসমূহ, মোট কথা, যা' কিছু আপনার প্রয়োজন হয় আর এগুলো ছাড়াও ধর্মীয় ও পার্থিব কর্মকাণ্ডে বান্দাদের যে সমস্ত বিষয়াদি প্রয়োজন হয়-সবকিছুর বিবরণ ওই কুরআনেই পাওয়া যাবে।)

তাফসীরে 'হুসাইনী'তে আছেঃ

وَتَفْصِيْلُ كُلِّ شَيْئٍ، وبيان همه چيزهاكه محتاج باشد دردين ودنيا،

অর্থাৎঃ দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সবকিছুর বর্ণনা এ কুরআনের মধ্যে আছে। ইবনে সুরাকা প্রণীত 'কিতাবুল ই'জাযে আছেঃ

مَامِنْ شَيْئٍ فِى الْعَالَمِ اِلَّا هُوَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎঃ জগতে এমন কোন কিছু নেই, যা' কুরআনের মধ্যে নেই।

اَلرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. (১৩)

(দয়াবান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবুবকে কুরআন শিখিয়েছেন, মানবতার প্রাণতুল্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে সৃষ্টির পূর্বাপর সব কিছুর তাৎপর্য বাতলে দিয়েছেন।)

তাফসীরে 'মাআলেমুত-তানযীল' ও 'হুসাইনী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপ-

خَلَقَ الْاِنْسَانَ اَىْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. يَعْنِىْ بَيَانَ مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ-

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি তথা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তঁকে পূর্ববতী ও পরবর্তী সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

قِيْلَ اَرَادَ بِالْاِنْسَانِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِىْ بَيَانَ مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِّئَ عَنْ خَبَرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّيْنِ-

অর্থাৎঃ বলা হয়েছে যে, (উক্ত আয়াতে) 'ইনসান' বলতে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব বিষয়ের বিবরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, তঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ও কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছেঃ-

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

وَعَلَّمَ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْاٰنَ وَاَسْرَارَ الْاُلُوْهِيَّةِ كَمَا قَالَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ-

অর্থাৎঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী আলাইহিস সালামকে কুরআন ও স্বীয় প্রভুত্বের রহস্যাবলীর জ্ঞান দান করেছেন, যেমন স্বয়ং আল্লাহতা'আলা ফরমাচ্ছেনঃ

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ সে সব বিষয় আপনাকে শিখিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না।

তাফসীরে 'মাদারেকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

اَلْاِنْسَانُ اَىِ الْجِنْسُ اَوْ اٰدَمُ اَوْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ،

(ইনসান বলতে মানবজাতি বা আদম (আলাইহিস সালাম) বা হুযুর আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে।)

'মায়ালেমুত তানযীলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

وَقِيْلَ الْاِنْسَانُ هٰهُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيَانُهُ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ-

(বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে اِنْسَانُ 'ইনসান' বলতে হুযুর আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে এবং بَيَانٌ 'বয়ান' বলতে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, তাঁকে (প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তিনি জানতেন না।)

তাফসীরে হুসাইনী'তে এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ-

یاوجود محمدرا بیان موزا نیدے

(অথবা এ কথা বোঝানো হয়েছে, যে, মহান আল্লাহ হুযুর আলাইহিস সালামের সত্ত্বাকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁকে যা কিছু হয়েছে বা হবে সেসমস্ত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন।)

উল্লেখিত আয়াত ও উহাদের তাফসীর সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, কুরআনের মধ্যে সবকিছু আছে এবং এর পরিপূর্ণ জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামকে প্রদান করা হয়েছে।

مَااَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ -(১৪)

(আপনি আপনার প্রভুর মেহেরবাণীতে উম্মাদ নন)

তাফসীর 'রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

بِمَسْتُوْرٍ عِلْمًا كَانَ فِى الْاَزَلِ وَمَا سَيَكُوْنُ اِلَى الْاَبَدِ لِاَنَّ الْجُنَّ هُوَ السَّتْرُ بَلْ اَنْتَ عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَخَبِيْرٌ بِمَا سَيَكُوْنُ.

অর্থাৎঃ আপনার দৃষ্টি থেকে সে সমস্ত বিষয় লুকায়িত নয়, যা' সৃষ্টির আদিকালে ছিল, ও যা কিছু অনন্তকাল পর্যন্ত হতে থাকবে। কেননা, جُنَّ শব্দের অর্থ হলো লুকায়িত থাকা। সুতরাং, সারমর্ম হচ্ছে-যা কিছু হয়েছে সে সব কিছু সম্পর্কে তো আপনি জানেনই, যা' কিছু অনাগত ভবিষ্যতে হবে সে ব্যাপারেও আপনি অবগত আছেন।

এ আয়াত ও তাফসীর থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সামগ্রিক ও অনন্তকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ইল্মে গায়বের বিষয়টি প্রমাণিত হলো।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ. (১৫)

(এবং হে মাহবুব আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তারা বলবে আমরাতো কৌতুক ও খেল-তামাশা করছিলাম।)

তাফসীরে 'দুররে মনসুর' ও 'তাবরী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছেঃ-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ. الخ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ اَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بِوَادِ فُلَانٍ وَمَا يُدْرِيْهِ بِالْغَيْبِ-

(হযরত ইব্নে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ আয়াত وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ الخ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে যে, জনৈক মুনাফিক বলেছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিচ্ছেন অমুক ব্যক্তির উষ্ট্রী অমুক জঙ্গলে আটকা পড়েছে। অদৃশ্য বিষয় তাঁর কীই বা জানা আছে?)

এ আয়াত ও তাফসীর থেকে একথাই জানা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামের অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করা মুনফিকদেরই কাজ। সেটাকে কুরআন 'কুফর' বলে আখ্যায়িত করেছে।

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ (১৬)

অর্থাৎঃ (আল্লাহ পাক) তাঁর মনোনীত রসুলগণ ছাড়া কাউকেও তাঁর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন না।

'তাফসীরে কবীরে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

اَىْ وَقْتُ وُقُوْعِ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِىْ لَا يُظْهِرُهُ اللّٰهُ لِاَحَدٍ فَاِنْ قِيْلَ فَاِذَا اَحْمَلْتُمْ ذٰلِكَ عَلَى الْقِيٰمَةِ فَكَيْفَ قَالَ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ مَعَ اَنَّهُ لَا يُظْهِرُ هٰذَا الْغَيْبَ لِاَحَدٍ قُلْنَا يُظْهِرُهُ عِنْدَ قَرِيْبِ الْقِيٰمَةِ-

অর্থাৎঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রশ্নটি ঐ সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা' আল্লাহ তা'আলা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। যদি কেউ প্রশ্ন করেন-আপনি এখানে 'গায়বকে' 'কিয়ামত' অর্থে ব্যবহার করেছেন, যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে ইরশাদ করলেনঃ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ (কিন্তু মনোনীত রসুলগণের নিকট ব্যক্ত করেন) অথচ (আপনার কথা মত) এ গায়বটি কারো কাছে প্রকাশ করা হয়না। এর উত্তরে আমি বলবো যে, আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ পাক উক্ত অদৃশ্য বিষয়টি প্রকাশ করবেন।)

'তাফসীরে আযীযী'র ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

آنچه به نسبت همه مخلوقات غائب است غائب مطلق است مثل وقت آمدن قيامت واحكام تكونيه وشرعيه بارى تعالى ودرهر روز وهرشريعت ومثل حقائق ذات وصفات او تعالى على سبيل التفصيل اين قسم راغيب خاص او تعالى نيز مى نامند فلايظهر على غيبه احدا پس مطلع نمى كند برغيب خاص خود هيچكس رامگركسى راكه پسند مى كند وآں كس رسول باشد خواه ازجنس ملك وخواه ازجنس بشرمثل حضرت محمد مصطفى عليه السلام اورا اظهار بعضےزغيوب خاصه خود مى فرمائد،

(যে বিষয় সৃষ্টিকূলের অজ্ঞাত বা দৃষ্টি বহির্ভুত, উহা 'গায়ব মুতলাক' নামে পরিচিত। যেমন কিয়ামতের সঠিক সময়, প্রত্যেক শরীয়তের বিধিসমূহ সৃষ্টিকূলের

দৈনন্দিন শৃংখল বিধানের রহস্যময় বিষয়সমূহ, আল্লাহ তা'আলার 'খাস গায়ব' বলা হয়, তিনি তাঁর খাস গায়ব কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তবে তিনি রসুলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন, (তিনি ফিরিশতার রসুল হোন বা মানবজাতির রসুল হোন) তাঁকে অবহিত করে থাকেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আলাইহিস সালামের কাছে তার বিশেষ অদৃশ্য বিষয়াদির কিয়দংশ প্রকাশ করে থাকেন।)

তাফসীরে 'খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ-

الْأَمَنْ يَصْطَفِيْهِ لِرِسَالَتِهِ وَنُبُوَّتِهِ فَيُظْهِرُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنَ الْغَيْبِ حَتّٰى يَسْتَدِلَّ عَلٰى نُبُوَّتِهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الْمُغِيْبَاتِ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ مُعْجِزَةً لَّهٗ.

অর্থাৎঃ যাদেরকে (আল্লাহ পাক) নবুয়াত বা রিসালতের জন্য মনোনীত করেন, তাঁদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা করেন, তার কাছে এ অদৃশ্য বিষয় ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদ প্রদান তাঁর নবুয়তের সমর্থনে সর্ব সাধারণের নিকট প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয়। এটাই তাঁর মুজিযারূপে পরিণত হয়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে আছেঃ-

قَالَ ابْنُ الشَّيْخِ اِنَّهٗ تَعَالٰى لَا يُطْلِعُ عَلَى الْغَيْبِ الَّذِىْ يَخْتَصُّ بِهٖ تَعَالٰى عِلْمُهٗ اِلَّا الْمُرْتَضَى الَّذِىْ يَكُوْنُ رَسُوْلًا وَمَا لَا يَخْتَصُّ بِهٖ يُطْلِعُ عَلَيْهِ غَيْرَ الرَّسُوْلِ.

(ইবন শাইখ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা তার পছন্দনীয় রসুল ছাড়া কাউকে তাঁর খাস গায়ব সম্পর্কে অবহিত করেন না। তবে তার বিশেষ অদৃশ্য বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়াদি রসুল নন এমন ব্যক্তিদেরকেও অবহিত করেন।)

এ আয়াত ও এর তাফসীরসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহ তা'আলার খাস ইল্‌মে গায়ব, এমন কি কিয়ামত কখন হবে সে জ্ঞানও হুযুর পুরনুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে দান করা হয়েছে। এখন এমন কি জিনিষ আছে, যা' হযরত মুস্তাফা আলাইহিস সালামের জানার বাকী রইল?

(১৭) فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى

(তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রিয় বান্দার প্রতি যা কিছু ওহী করার ছিল, তা ওহী করলেন।)

সুবিখ্যাত 'মাদারিজন-নবুয়ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'আল্লাহর দর্শন' শীর্ষক পরিচ্ছেদ্দ উল্লেখিত আছেঃ

فاوحی الایة: بتمام علوم ومعارف وحقائق وبشارات وارشادات اخبار وآثار وکرامات وکمالات دراحیطئه ایں ابهام داخل است وهمه راشامل وکثرت وعظمت اوست که بهم آورد وبیان نه کرداشارات بآنکه جزعلم علام الغیوب ورسول محبوب به آں محیط نتواند شد مگرآنچه آں حضرت بیان کرده.

অর্থাৎঃ মহা প্রভু আল্লাহ হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র মিরাজের রজনীতে যে সমস্ত জ্ঞান, মারিফাত, শুভ সংবাদ ইঙ্গিত, বিবিধ তথ্য, বুযুর্গী, মান সম্মান, পূর্ণতা ইত্যাদি ওহী করেছিলেন, সবই এ অস্পষ্ট বর্ণনায় (যা আয়াতের مااوحى বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে) অন্তর্ভুক্ত আছে। ঐ সমস্ত বিষয়াদির অত্যধিক ও মাহাত্ম্যের কারণে সেগুলোকে অস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন; সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেননি। এতে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ওই সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞান সমূহ খোদা তা'আলা ও তার মাহবুব আলাইহিস সালাম ব্যতীত অন্য কেউ পরিবেষ্টন করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যতটুকু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রকাশ করেছেন, ততটুকু জানা গেছে।

এ আয়াত এর ব্যাখ্যা থেকে বোঝা গেল যে, মিরাজে হুযুর আলাইহিস সালামকে সে সমস্ত জ্ঞান দান করা হয়েছিল, যা, যে কারো জন্যে বর্ণনাতীত ও কল্পনাতীত। مَاكَانَ وَمَايَكُوْنَ (যা কিছু হয়েছে ও হবে) এ কথাটি শুধু বর্ণনার সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞান তাঁকে দান করা হয়েছে।

(১৮) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

(এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গায়ব প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃপণ নন।)

এ কথা বলা তখনই সম্ভবপর, যখন হুযুর আলাইহিস সালাম গায়বী ইলমের

অধিকারী হয়ে জনগণের কাছে তা ব্যক্ত করেন।

'মা'আলিমুত তানযীল' নামক তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে:-

عَلَى الْغَيْبِ وَخَبَرِ السَّمَاءِ وَمَا اُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَخْبَارِ وَالْقَصَصِ بِضَنِيْنٍ اَىْ بِبَخِيْلٍ يَقُوْلُ اِنَّهٗ يَاْتِيْهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهٖ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ وَلَا يَكْتُمُهٗ كَمَا يَكْتُمُ الْكَاهِنُ-

(হুযুর আলাইহিস সালাম অদৃশ্য বিষয়, আসমানী খবর, ও কাহিনী সমূহ প্রকাশ করার ব্যাপারে কৃপণ নন। অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন, তবে উহা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য করেন না, বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেন ও উহাদের সংবাদ দেন। গণক ও ভবিষ্যতবেত্তারা যে রূপ খবর গোপন করে রাখে, সেরূপ তিনি গোপন করেন না।)

'তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখিত আছেঃ-

يَقُوْلُ اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَاْتِيْهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهٖ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ-

অর্থাৎঃ এ আয়াতে একথাই বোঝানো হয়েছে যে,হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ আসে। তিনি উহা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন না, বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেন।

এ আয়াত ও এর তাফসীরের ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম লোকদেরকে ইলমে গায়ব শিক্ষা দেন। বলা বাহুল্য যে, যিনি জানেন, তিনিই তো শিখিয়ে থাকেন।

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (১৯)

(আমি (আল্লাহ) তাঁকে (হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে) আমার ইল্‌মে লদুনী দান করেছি।)

'তাফসীরে বয়যাবী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

اَىْ مِمَّا يَخْتَصُّ نَبَاءَهٗ لَا يَعْلَمُ اِلَّا بِتَوْفِيْقِنَا وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ-

অর্থাৎঃ হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে এমন বিষয়াদির জ্ঞান দান করেছি, যেগুলো সম্পর্কে শুধু আমিই অবগত, যা আমি না বললে কেউ জানতে পারে না। এটাইতো ইল্‌মে গায়ব।

'তাফসীরে ইবনে জারীরে সায়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا. كَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ عَلِمَ ذٰلِكَ-

(হযরত খিযির (আলাহিস সালাম) হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) কে বলে ছিলেন "আপনি আমার সঙ্গে অবস্থান করলে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।" হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) ইলমে গায়বের অধিকারী ছিলেন বলেই এ কথাটি পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।)

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

هُوَ عِلْمُ الْغُيُوْبِ وَالْاِخْبَارُ عَنْهَا بِاِذْنِهٖ تَعَالٰى كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ.

(হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) কে যে ইলমে লদুনী শিখানো হয়েছিল, উহাই ইলমে গায়ব। এবং গায়বের খবর পরিবেশন খোদার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) এ মতই পোষণ করেছেন।)

'তাফসীরে মাদারেকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছেঃ-

يَعْنِى الْاِخْبَارَ بِالْغُيُوْبِ وَقِيْلَ الْعِلْمُ اللَّدُنِّىْ مَاحَصَلَ لِلْعَبْدِ بِطَرِيْقِ الْاِلْهَامِ-

অর্থাৎঃ হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) কে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, ইলমে লদুনী হলো এমন এক বিশেষ জ্ঞান, যা' বান্দা ইলহামের মাধ্যমে অর্জন করেন।)

'তাফসীরে খাযেনে' আছেঃ- اَىْ عِلْمَ الْبَاطِنِ اِلْهَامًا

অর্থাৎঃ হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে আমি ইলহামের মাধ্যমে বাতেনী

ইলম দান করেছি।

এ আয়াত ও তাফসীরের ইবারত সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) কে ইলমে গায়ব দান করেছিলেন। এ থেকে হুযুর আলাইহিস সালামকে ইলম গায়ব দান করার বিষয়টি অপরিহার্যরূপে স্বীকৃত হয়। কেননা, খোদার সৃষ্টিকূলের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী; আর হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) ও সৃষ্টিকূলের অন্তর্ভুক্ত।

وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (২০)

(আমি এ রূপেই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে ভূ-মণ্ডল ও নভোমন্ডলে পরিব্যাপ্ত আমার বাদশাহী অবলোকন করাই।)

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ রূপঃ-

اُقِيْمَ عَلٰى صَخْرَةٍ وَكُشِفَ لَهٗ عَنِ السَّمٰوٰتِ حَتّٰى رَاَى الْعَرْشَ وَالْكُرْسِىَّ وَمَافِى السَّمٰوٰتِ وَكُشِفَ لَهٗ عَنِ الْاَرْضِ حَتّٰى نَظَرَ اِلٰى اَسْفَلِ الْاَرْضِيْنَ وَرَاٰى مَافِيْهَا مِنَ الْعَجَائِبِ.

(হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর দাঁড় করানো হয়েছিল এবং তাঁর জন্য আসমান খুলে দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি আসমান সমূহে বিরাজমান সবকিছুই, এমনকি আরশ ও কুরসি পর্যন্ত অবলোকন করেছিলেন। অনুরূপভাবে যমীনকেও তাঁর দৃষ্টিসীমায় নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তিনি যমীনের সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত ও যমীনের স্তর সমূহে বিদ্যমান বিস্ময়কর সবকিছুই স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

'তাফসীরে মাদারেকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

قَالَ مُجَاهِدٌ فُرِجَتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ فَنَظَرَ اِلٰى مَافِيْهِنَّ حَتّٰى اَنْتَهٰى نَظَرُهٗ اِلَى الْعَرْشِ وَفُرِجَتْ لَهُ الْاَرْضُوْنَ السَّبْعُ حَتّٰى نَظَرَهٗ اِلٰى مَافِيْهِنَّ-

(হযরত মুজাহিদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেনঃ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট সপ্ত আসমান উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন তিনি আসমান সমূহের মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছুই দেখতে পান, এমনকি আরশ পর্যন্ত তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। অনুরূপভাবে তাঁর নিকট সপ্ত যমীন উন্মুক্ত করা হয়। তখন তিনি যমীনের

স্তর সমূহে বিদ্যমান সবকিছুই দেখতে পান।)

'তাফসীরে হুসাইনীতে' আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

عجائب وبدائع آسمانها وزمين ها ازذروئه عرش تاتحت الثرى بروئے منكشف ساخته-

অর্থাৎঃ আমি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আসমান যমীনের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সবকিছুই দেখিয়ে দিয়েছি। তাঁর নিকট আরশের সুউচ্চ স্তর থেকে 'তাখত-আছ-ছরা' পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছি।

'তাফসীরে ইবন জারীর ইবন আবী হাতেমে'-এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ-

اِنَّهٗ جَلَّ لَهُ الْاَمْرُ سِرُّهٗ وَعَلَانِيَتُهٗ فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ اَعْمَالِ الْخَلَائِقِ-

(হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই উদ্ভাসিত হয়েছিল। সুতরাং, সে সময় সৃষ্টিকূলের কোন আমলই তাঁর নিকট গোপন ছিল না।)

'তাফসীরে কবীরে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

اِنَّ اللّٰهَ شَقَّ لَهُ السَّمٰوٰتِ حَتّٰى رَاَى الْعَرْشَ وَالْكُرْسِىَّ وَاِلٰى حَيْثُ يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ فَوْقِيَّةُ الْعَالَمِ الْجِسْمَانِىْ وَرَاٰى مَافِى السَّمٰوٰتِ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْبَدَائِعِ وَرَاٰى مَافِىْ بَطْنِ الْاَرْضِ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ-

(আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের জন্য আসমান সমূহকে বিদীর্ণ করে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি আরশ-কুরসী, এমনকি স্থূল জগতের সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত দেখেছিলেন। আসমান সমূহে বিরাজমান সব কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, যমীনের তলদেশে বিদ্যমান উদ্ভূত ও বিস্ময় উদ্রেককর সবকিছুই সুস্পষ্টরূপে তাঁর নিকট প্রতিভাত হয়েছিল।)

এ আয়াত ও উল্লেখিত তাফসীরের ইবারত সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, আরশ থেকে 'তাখত-অছ-ছরা' পর্যন্ত সমস্ত কিছুই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস

সালামকে দেখানো হয়েছিল, এবং সৃষ্টিকূলের বিবিধ আমল সম্পর্কেও তাঁকে অবগত করানো হয়েছিল। হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান তাঁর তুলনায় অনেক বেশী বিধায় একথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে হয় যে, এ ব্যাপক জ্ঞান হুযুর আল-াইহিস সালামকেও দান করা হয়েছে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, আরশের জ্ঞান বলতে লওহে মাহফুজও তাঁর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। আর লওহে মাহফুজে কি কি লিখা আছে সে সম্পর্কে আমি আগে আলোচনা করেছি। সুতরাং, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবকিছুর জ্ঞান হযরত ইব্রাহ-ীম (আলাইহিস সালাম) এরও ছিল, আর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞান হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমুদ্রের এক ফোঁটার সমতুল্য।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেনঃ-

لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاوِيْلِهٖ (২১)

(অর্থাৎ তোমাদের কাছে কাবার আসার আগে এর বিবরণ বলে দিতে পারবো।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ান' 'কবীর' ও 'খাযেনে' এর তাফসীরে উল্লেখিত আছে- 'আমি তোমাদেরকে বিগত ও অনাগত দিনের খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় অবস্থা বলে দিতে পারি। বলতে পারি খাদ্যশস্য কোথা হতে আসলো এবং এখন কোথায় যাবে। 'তাফসীরে কাবীরে' আরও উল্লেখ করেছে- 'আমি বলতে পারি, এ খাবার গ্রহণের ফলে উপকার হবে, না ক্ষতি হবে। এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তিনিই বলতে পারেন, যিনি প্রতিটি অণু-পরমাণূর খবর রাখেন।

তিনি (হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম) আরওবলেনঃ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ (এটা আমার জ্ঞানের কিয়দাংশ মাত্র।) তাহলে এখন বলুন, হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু বিস্তৃত। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞান হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমুদ্রের এক বিন্দু মাত্র।

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ফরমান-

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ-

(তোমরা নিজ নিজ ঘরে যা কিছু খাও এবং যা কিছু সঞ্চিত রাখ, আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি।)

দেখুন, ঘরের মধ্যে আহার করা হ'ল, ঘরের মধ্যে জমা করা হ'ল; সেখানে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু বাহির থেকে তিনি এর সংবাদ দিচ্ছেন। একেই বলে ইলমে গায়ব।

উপসংহারঃ বিরুদ্ধবাদীগণ এসব দলীল-প্রমাণাদির কোন উত্তর দিতে পারেন না। তারা কেবল প্রত্যুত্তরে এ কথাই বলেন যে যেই সব আয়াতে كُلُّ شَيْءٍ উল্লেখিত আছে বা مَالَمْ تَعْلَمْ বলা হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি বিধ-ানের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে; অন্য কোন কিছুর জ্ঞান বোঝানো হয়নি। এর সমর্থনে তারা নিম্নলিখিত দলীলাদি উপস্থাপন করেনঃ-

(১) كُلُّ شَيْءٍ বলতে সীমাহীনতা বোঝায় এবং সীমাহীন বিষয়ের জ্ঞান খোদা ছাড়া অন্য কারো আয়ত্বে থাকা তর্কশাস্ত্রের 'শৃংখল পরম্পরের অসীমতা' অনুসারে সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য। (যুক্তিশাস্ত্রের ''তাসালসুল' নামক দলীল দ্রষ্টব্য।)

(২) অনেক তাফসীরকারকগণ كُلُّ شَيْءٍ এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ مِنْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ। (অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়াদি) যেমন তাফসীরে জালালাইনে ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করা হয়েছে।

(৩) কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় كُلُّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। কিন্তু উহার দ্বারা 'কিয়দাংশ' বা 'কিয়ৎ পরিমাণ'ই বোঝানো হয়েছে। যেমন রাণী বিলকিস সম্পর্কে وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (অর্থাৎ বিলকিসকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে) বলা হয়েছে অথচ বিলকিসকে প্রদত্ত বস্তু বা বিষয়ের কিছু বা কিঞ্চিত পরিমাণই দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু এগুলো কোন দলীলই নয়। নিছক ভুল ধারণা ও ধোকা মাত্র। এগুলোর উত্তর নিম্নে দেয়া গেল।

আরবী ভাষায় كُلُّ ও مَا শব্দদ্বয় ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি শব্দ অকাট্য। এতে মনগড়া কোন শর্ত জুড়ে দিয়ে শব্দকে সীমিত অর্থে প্রয়োগ করা জায়েয নয়। কুরআন শরীফের ব্যাপকতা নির্দেশক শব্দগুলোকে 'হাদীছে আহাদ' দ্বারাও সীমিত অর্থে গ্রহণ করা যায় না।

এমতাবস্থায় নিজস্ব কোন যুক্তি বা রায়ের ভিত্তিতে সীমিত অর্থে প্রয়োগের প্রশ্নই উঠে না।

(১) كُلُّ شَيْءٍ বলতে সীমাহীনতা বোঝা যায় না বরং এ দ্বারা সীমাবদ্ধতাই বোঝা যায়। তাফসীরে কবীরে এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

قُلْنَا لَاشَكَّ اِنَّ اَحْصَاءَ الْعَدَدِ اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْمُتَنَاهِى فَاَمَّا لَفْظَةُ كُلُّ شَيْءٍ فَاِنَّهَا لَاتَدُلُّ عَلٰى كَوْنِهٖ غَيْرَ مُتَنَاهِى لِاَنَّ الشَّيْءَ عِنْدَنَا هُوَالْمَوْجُوْدُ وَالْمَوْجُوْدَاتُ مُتَنَاهِيَةٌ فِى الْعَدَدِ-

অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহ নেই যে সংখ্যা দ্বারা গণনার বিষয়টি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর। কিন্তু كُلُّ شَيْءٍ (প্রত্যেক জিনিস) শব্দ দ্বারা ঐ বস্তুর সীমাহীনতার অর্থ প্রকাশ পায় না। কেননা আমাদের মতে شَيْءٌ (জিনিস) বলতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, শুধু তা'ই বোঝায় এবং যাবতীয় অস্তিত্ববান বস্তু সীমাবদ্ধতার গণ্ডীতে আবদ্ধ।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' একই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছেঃ-

وَهٰذِهِ الْاٰيَةُ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهٖ عَلٰى اَنَّ الْمَعْدُوْمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِاَنَّهٗ لَوْكَانَ شَيْئًا لَكَانَتِ الْاَشْيَاءُ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ وَكَوْنُهٗ اَحْصٰى عَدَدَهَا يَقْتَضِى كَوْنَهَا مُتَنَاهِيَةً لِاَنَّ اِحْصَاءَ الْعَدَدِ اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْمُتَنَاهِى-

অর্থাৎ এ আয়াত দ্বারা এ কথাটির বড় প্রমাণ মেলে যে, যা' কিছু অস্তিত্বহীন উহা شَيْءٌ 'বস্তু' বলে গণ্য নয়। কেননা যদি এটা বস্তু (অস্তিত্ববান) বলে গণ্য হয়, তাহলে অস্তিত্ববান সবকিছুই সীমাহীন হয়ে যায়। অথচ বস্তুসমূহ গণনা বা শুমারীর আওতাভুক্ত এবং যা' কিছু গণনার আওতায় আসে, উহা কেবল সীবাবদ্ধতার পর্যায়ভুক্ত হতে পারে।

(২) তাফসীরকারকদের মধ্যে অনেকেই كُلُّ شَيْءٍ বলতে কেবল শরীয়তের আহাকামকে ধরে নিয়েছেন বটে, কিন্তু আবার অনেকেই সম্পুরণীয় বা সামগ্রীক ইলমে গায়বের প্রতি নির্দেশ করেছেন। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী যখন কিছু প্রমাণ ইতিবাচক ও আর কিছু নেতিবাচক হয়, তখন ইতিবাচক প্রমাণগুলিই গৃহীত হয়।

সুবিখ্যাত 'নুরুল আনোয়ার' গ্রন্থে تَعَارُض (অসঙ্গতি বা বিরোধ) শীর্ষক আ-

লোচনায় উল্লেখিত আছেঃ اَلْمُثْبِتُ اَوْلٰى مِنَ النَّافِىْ অর্থাৎ স্বীকৃতি জ্ঞাপক প্রমাণ অস্বীকৃতি নির্দেশক প্রমাণ হতে অপেক্ষাকৃত উত্তম। যে সমস্ত তাফসীরের উদ্ধৃতি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সে গুলোতে যেহেতু বেশীরভাগ প্রমাণই স্বীকৃতি সূচক, কাজেই উহাই গ্রহণযোগ্য। অধিকন্তু স্বয়ং হাদীছ ও সুপ্রসিদ্ধ উলামায়ে উম্মতের উক্তিসমূহ দ্বারা এর তাফসীর করে আমি দেখাবো যে এমন কোন অণুপরমাণু নেই, যা' হুযুর পুর নুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞানানুভূতিতে আসেনি, এবং আমি এ গ্রন্থেরই 'পেশ কালাম' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, কুরআনের হাদীছ ভিত্তিক তাফসীর অন্যান্য তাফসীর সমূহ থেকে উন্নত। সুতরাং, হাদীছের সমর্থনপুষ্ট তাফসীরই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

এও উল্লেখ্য যে, যে সকল তাফসীরকারক كُلُّ شَيْءٍ এর তাফসীরে 'আহকামে দ্বীনকে' বোঝাতে চেয়েছেন, তারাওতো অন্যান্য বিষয় বা বস্তুর সম্পর্কীয় জ্ঞানের অস্বীকৃতির কথা বলেননি। সুতরাং, আপনারা অস্বীকৃতির কথা কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? কোন বিষয়ের উল্লেখ না করলে যে সে বিষয়ের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, এ কথা বলেন কিভাবে? কুরআন শরীফে আছেঃ

تَقِيْكُمُ الْحَرَّ তোমাদের কাপড় তোমাদেরকে উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। এরূপ উক্তি থেকে কি একথা বোঝা যাবে যে, কাপড় আমাদেরকে শীত থেকে রক্ষা করে না? এ কথাতো কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। অধিকন্তু, 'দ্বীন' বললেও সবকিছুকে বোঝায়। জগতে এমন কি বিষয় আছে, যার উপর দ্বীনের আহকাম হালাল হারাম ইত্যাদি প্রযোজ্য হয় না? ঐ সকল মুফাস্সিরতো এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন যে দ্বীনি ইলম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে-একথা বললে সব কিছুর জ্ঞানকে বোঝানো হয়।

(৩) বিলকীস ও অন্যন্যদের কাহিনীতে যে كُلُّ شَيْءٍ বলা হয়েছে, সেখানে এমন আলামত বা লক্ষণ মওজুত আছে, যা'র ফলে একথা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, كُلُّ شَيْءٍ দ্বারা রাজত্বের কাজ কারবার সম্পর্কীয় প্রত্যেক কিছুই বোঝানো হয়েছে। সেখানে উক্ত শব্দ দ্বারা এর ব্যবহারিক অর্থের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এমন কি লক্ষণ আছে, যে কারণে শব্দের আসল অর্থ বাদ দিয়ে তার ব্যবহারিক অর্থই গ্রহণ করা যাবে?

আরও লক্ষ্যণীয় যে, কুরআন করীম সেখানে 'হুদহুদ' পাখীর উক্তিকে নকল করেছে মাত্র। হুদহুদ বলেছিল, وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ 'বিলকিসকে

প্রত্যেক কিছুই দেয়া হয়েছে।" স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এ খবর দেননি। হুদহুদের ধারণা ছিল যে বিলকিস সারা দুনিয়ার সবকিছুই পেয়ে গেছেন। কিন্তু এখানে মুস্তাফা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেনঃ "تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ" (প্রত্যেক কিছুর সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত)। হুদহুদ ভুল বলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কালামতো ভুল হতে পারে না। হুদহুদতো আরও বলেছিল وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ (তাঁর এক বিরাট আরশ আছে) তাহলে বিলকিসের সিংহাসন কি আরশ আযীমই ছিল? বস্তুতঃ কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, كُلُّ شَيْئٍ দ্বারা এখানে জগতের সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে। কুরআনেই ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّافِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

(অর্থাৎ আর্দ্র শুষ্ক এমন কোন জিনিস নেই, যা' লওহে মাহফুজে বা কুরআনে করীমে নেই।

এ ছাড়া সামনে উল্লেখিত বিভিন্ন হাদীছ, উলামা ও মুহাদ্দিছীনের উক্তি থেকেও এ কথার জোরালো সমর্থন পাওয়া যাবে যে জগতের প্রত্যেক কিছুর জ্ঞান হুযুর পুরনুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে দান করা হয়েছিল।

আমি ইনশা আল্লাহ 'হাযির-নাযির' শিরোনামের আলোচনায় বর্ণনা করবো যে মৃত্যুর ফিরিশতা হযরত আযরাইল (আলাইহিস সালাম) এর সামনে সারা জগৎটাই যেন একটা তালার মত। আর ইবলীস এক পলকে সারা পৃথিবী ঘুরে আসে। এ কথা দেওবন্দীগণও স্বীকার করেন যে আমাদের নবী আলাইহিস সালামের জ্ঞান সৃষ্টিকূলের সামগ্রিক জ্ঞান থেকে বেশী। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হুযুর আলাই-হিস সালামের সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান রয়েছে। আমি 'পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান' علوم خمسه শীর্ষক আলোচনায় হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও তাকদীর লিখায় নিয়োজিত ফিরিশতার জ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত করবো, যা' দ্বারা বোঝা যাবে যে গুরুত্বপূর্ণ 'পঞ্চ বিষয়ের' জ্ঞান তাদেরও রয়েছে। যেহেতু হুযুর আলাইহিস সালাম সমস্ত সৃষ্টিকূল থেকে বেশী জ্ঞানী, কাজেই, হুযুর আলাইহিস সালাম যে এসব বিষয়ের জ্ঞান বরং তার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী একথা মেনে নিতে হবে বৈ কি। আমাদের দাবী সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (আল্লাহ্ যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইলমে গায়ব সম্পর্কিত হাদীছ সমূহের বর্ণনা

এ পরিচ্ছেদে আমি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে হাদীছসমূহ বর্ণনা করেছি। অতঃপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই সংখ্যানুসারেই হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করবো।

(১) বুখারী শরীফের بَدْءِ الْخَلْقِ শীর্ষক আলোচনায় ও মিশকাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের بَدْءِ الْخَلْقِ وَذِكْرُ الْاَنْبِيَاءِ শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত উমর ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

অর্থাৎঃ হুযুর আলাইহিস সালাম এক জায়গায় আমাদের সাথে অবস্থান করেছিলেন, সেখানে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে আদি সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছিলেন, এমন কি বেহেশ্‌তবাসী ও দুযখ বাসীগণ নিজ নিজ মনযিলে বা ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া অবধি পরিব্যাপ্ত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন। যিনি ওসব স্মরণ রাখতে পেরেছেন, তিনি তো স্মরণ রেখেছেন, আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেননি, তিনি ভুলে গেছেন।

এখানে হুযুর আলাইহিস সালাম দু'ধরনের ঘটনাবলীর খবর দিয়েছেনঃ (১) বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হলো এবং (২) এর সমাপ্তি কিভাবে হবে, অর্থাৎ 'রোযে আযল' (সৃষ্টির ঊষালগ্ন) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক অণুপরমাণুর পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিয়েছেনঃ

(২) মিশকাত শরীফের اَلْمُعْجِزَاتُ অধ্যায়ে 'মুসলিম শরীফের' উদ্ধৃতি দিয়ে আবর ইবনে আখতাব থেকে একই কথা বর্ণিত, তবে এতে এতটুকু অতিরিক্ত

আছেঃ-

فَاَخْبَرَنَا بِمَاهُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا

(আমাদেরকে সেই সমস্ত ঘটনাবলীর খবর দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকবে। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় 'আলিম হলেন তিনি, যিনি এসব বিষয়াদি সর্বাধিক স্মরণ রাখতে পেরেছেন।

(৩) মিশকাত শরীফের اَلْفِتَنُ শীর্ষক অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে হযরত হুযাইফা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ-

مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّاحَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهٗ
مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ-

অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম সে জায়গায় কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সব কিছুর খবর দিয়েছেন; কোন কিছুই বাদ দেননি। যাদের পক্ষে সম্ভব, তাঁরা সব স্মরণ রেখেছেন, আর অনেকে ভুলেও গেছেন।

(৪) মিশকাত শরীফের 'ফযায়েলে সায়্যিদুল মুরসালীন' শীর্ষক অধ্যায়ে 'মুসলিম শরীফের' বরাত দিয়ে হযরত ছওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করা হয়েছেঃ-

اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَءَيْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا،

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্ত সমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

(৫) মিশকাত শরীফের 'মাসাজিদ' অধ্যায়ে হযরত আবদুর রহমান ইবন আয়েশ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

رَئَيْتُ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَوَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَىَّ
فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

অর্থাৎঃ আমি আল্লাহ তা'আলাকে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি। তিনি স্বীয় কুদরতের হাতখানা আমার বুকের উপর রাখলেন, যার শীতলতা আমি স্বীয়

অন্তঃস্থলে অনুভব করেছি। ফলে, আসমান যমীনের সমস্ত বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

(৬) 'শহরে মাওয়াহেবে লদুনিয়ায়' (হযরত আল্লামা যুরকানী (রহতুল্লাহে আল-াইহে) প্রণীত) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছেঃ-

اِنَّ اللّٰهَ رَفَعَ لِىَ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَاهُوَ كَائِنٌ فِيْهَا
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذَا.

অর্থাৎঃ আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে সারা দুনিয়াকে তুলে ধরেছেন। তখন আমি এ দুনিয়াকে এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা' কিছু হবে এমনভাবে দেখতে পেয়েছি, যেভাবে আমি আমার নিজ হাতকে দেখতে পাচ্ছি।

(৭) মিশকাত শরীফের 'মাসাজিদ' অধ্যায়ে 'তিরমিযী শরীফের' উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত আছেঃ فَتَجَلّٰى لِىْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ (তখন প্রত্যেক কিছু আমার কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এবং আমি এগুলো চিনতে পেরেছি।)

(৮) 'মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলে' হযরত আবুযর গিফারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ
جَنَاحَيْهِ اِلَّا ذَكَرَلَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

(হুযুর আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এমনভাবে অবহিত করেছেন যে, একটা পাখীর পালক নাড়ার কথা পর্যন্ত তাঁর বর্ণনা থেকে বাদ পড়েনি।

(৯) মিশকাত শরীফের 'ফিতনা' নামক অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত হুযাইফা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ
تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مِنْ ثَلٰثِ مِائَةٍ فَصَاعِدًا قَدْسَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهٖ
وَاسْمِ اَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِهٖ (رواه ابوداؤد)

(হুযুর আলাইহিস সালাম পৃথিবীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য

কোন ফিত্না পরিচালনাকারীর কথা বাদ দেননি, যাদের সংখ্যা তিনশত কিংবা ততোধিক হবে; এমন কি তাদের নাম, তাদের বাপের নাম ও গোত্রের নামসহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।)

(১০) মিশকাত শরীফের ذِكْرُ الْاَنْبِيَاءِ শীর্ষক অধ্যায়ে বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ-

حُفِّفَ عَلٰى دَاوٗدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَاْمُرُ دَوَاۤبَّهٗ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ.

(হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর জন্য কুরআনকে (যবুর গ্রন্থ) এমনভাবে সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি নিজ ঘোড়াদেরকে যীন' দ্বারা সজ্জিত করার হুকুম দিতেন আর ইত্যবসরে তিনি যীন পরানোর আগেই 'যবুর শরীফ' পড়ে ফেলতেন।)

এ হাদীছটি এখানে এ জন্যই বর্ণনা করা হলো যে যদি হুযুর আলাইহিস সালাম একই ভাষণে সৃষ্টির আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনাবলী বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে এও তাঁর মুজিযা ছিল, যেমন হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) এক মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ 'যবুর' শরীফ পড়ে ফেলতেন।

(১১) মিশকাত শরীফের مَنَاقِبِ اَهْلِ الْبَيْتِ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ-

تَلِدُ فَاطِمَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غُلَامًا يَكُوْنُ فِىْ حَجْرِكَ

অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম হযরত উম্মুল ফযল (রাদিআল্লাহু আনহু) এর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হযরত ফাতিমা যুহরা (রাদিআল্লাহু আনহা) এর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সে তোমারই (হযরত উম্মুল ফযল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কোলে লালিত পালিত হবে।

(১২) বুখারী শরীফে اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রহমতুল্লাহে আলাইহে) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

مَرَّالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا

يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً وَقَالَ لَعَلَّهٗ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا.

(হুযুর আলাইহিস সালাম একদা দুটো কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কবর দুটোতে আযাব হচ্ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এ দু'জনের আযাব হচ্ছে কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের জন্য নয়।' তাদের মধ্যে একজন প্রশ্রাবের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতো না। অপরজন চোগলখুরী করে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করত। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) খেজুরের একটি কাঁচা ডাল নিয়ে তা' দু'ভাগে ভাগ করলেন ও অংশ দু'টো উভয় কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দু'টো শুকিয়ে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব হবে।)

(১৩) বুখারী শরীফের- كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ এ ও খাযেনে. لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَالسَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَامِنْ رَجُلٍ اَحَبَّ اَنْ يَّسْئَلَ عَنْ شَىْءٍ فَلْيَسْئَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لَا تَسْئَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ مَادُمْتُ فِىْ مُقَامِىْ هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَيْنَ مُدْخَلِىْ قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ كَثُرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِىْ سَلُوْنِىْ.

(একদিন হুযুর আলাইহিস সালাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। অতপর কিয়ামতের উল্লেখপূর্বক এর আগে যে সমস্ত ভয়ানক ঘটনাবলী ঘটবে, সে সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'যার যা খুশী জিজ্ঞাসা করতে পার।' খোদার শপথ, এ জায়গা অর্থাৎ এ মিম্বরে আমি যতক্ষণ দণ্ডায়মান আছি, ততক্ষণ তোমরা যা কিছু জিজ্ঞাসা কর না কেন, আমি অবশ্যই উত্তর দেব।' জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন, 'পরকালে আমার

ঠিকানা কোথায়?' ইরশাদ ফরমালেন হাজান্নামের মধ্যে।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা' দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'আমার বাপ কে? ইরশাদ করেন, হুযাফা।' এর পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বার বার ইরশাদ ফরমান, জিজ্ঞাসা করো, জিজ্ঞাসা করো।

মনে রাখা দরকার যে কারো 'জাহান্নামী' বা জান্নাতী হওয়া সম্পর্কে জানা পঞ্চ জ্ঞানের (علوم خمسه) অন্তর্ভুক্ত। সৌভাগ্যবান কিংবা হতভাগা হওয়ার বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানও পঞ্চ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কে কার ছেলে এ সম্পর্কিত জ্ঞানও উক্ত' পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞানের আওতাভুক্ত। অধিকন্তু এটা এমন একটি বিষয়, যা শুধু ব্যক্তি বিশেষের মা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আল-ইহে ওয়াসাল্লাম) এহেন দৃষ্টির জন্য সবকিছুই উৎসর্গকৃত, যে দৃষ্টিতে আলো-অন্ধকার, দুনিয়া, আখিরাত সবকিছুই দৃষ্টিগোচর হয়।

(১৪) মিশকাত শরীফের مناقب على অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ-

قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

(হুযুর আলাইহিস সালাম খায়বরের যুদ্ধের দিন ইরশাদ ফরমানঃ 'আমি আগামী দিন এ পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে অর্পণ করবো, যার হাতে আল্লাহ তা'আলা 'খায়বরের বিজয় নির্ধারণ করেছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে ভালবাসেন।)

(১৫) মিশকাত শরীফের 'মাসাজিদ' অধ্যায়ে হযরত আবুযর গিফারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُّ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ-

(আমার সামনে আমার উম্মতের ভালমন্দ আমল সমূহ পেশ করা হয়েছে। আমি তাদের নেক আমল সমূহের মধ্যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সমূহ অপসারণের মত পুণ্য কাজও লক্ষ্য করেছি।')

(১৬) 'মুসলিম শরীফের كتاب الجهاد ২য় খণ্ডে' এর 'বদরের যুদ্ধ' শীর্ষক

অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ يَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ هٰهُنَا هٰهُنَا قَالَ فَمَامَاطَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

('হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমানঃ এটা হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হয়ে পতিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট স্থান" এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র হস্ত মুবারক যমীনের উপর এদিক সেদিক সঞ্চালন করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ হুযুর আলাইহিস সালামের হাতের নির্দেশিত স্থানের কিঞ্চিত বাহিরেও পতিত হয়নি।)

লক্ষ্যণীয় যে, কে কোন্ জায়গায় মারা যাবে, এ বিষয়ের জ্ঞান পঞ্চ জ্ঞানের (علوم خمسة) অন্তর্ভুক্ত, যার সংবাদ বদরযুদ্ধের একদিন আগেই হুযুর আলাইহিস সালাম দিচ্ছিলেন।

(১৭) মিশকাত শরীফের 'মুজিযাত' অধ্যায়ে হযরত আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিন আছেঃ-

فَقَالَ رَجُلٌ تَاللّٰهِ اِنْ رَئَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئْبُ اَعْجَبُ مِنْ هٰذَا رَجُلٌ فِى النَّخْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ كُمْ بِمَا مَضٰى وَمَاهُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ

জনৈক শিকারী আশ্চর্য হয়ে বললো, নেকড়ে বাঘকে আজ যেরূপ কথা বলতে দেখলাম সেরূপ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। তখন নেকড়ে বাঘ বলে উঠলো, 'এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো-ঐ দুই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যমতী মরূদ্যানে (মদীনায়) একজন সম্মানিত ব্যক্তি (হুযুর আলাইহিস সালাম) আছেন, যিনি তোমাদের নিকট বিগত ও অনাগত ভবিষ্যতের বিষয় সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করেন।

(১৮) তাফসীরে খাযেনের ৪র্থ পারায় مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَااَنْتُمْ عَلَيْهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُمَّتِىْ فِىْ صُوَرِهَا فِى الطِّيْنِ كَمَا عُرِضَتْ عَلٰى اٰدَمَ وَاُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِىْ وَمَنْ يَّكْفُرُ بِىْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْمُنَافِقِيْنَ قَالُوْا اِسْتِهْزَاءً زَعَمَ مُحَمَّدٌ اَنَّهٗ يَعْلَمُ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرُ مِمَّنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهٗ وَمَا يَعْرِفُنَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ طَعَنُوْا فِىْ عِلْمِىْ لَاتَسْئَلُوْنِىْ عَنْ شَيْئٍ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ اِلَّا اَنْبَئْتُكُمْ بِهٖ.

(হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমানঃ আমার কাছে আমার উম্মতকে তাদের নিজ নিজ মাটির আকৃতিতে পেশ করা হয়েছে, যেমনভাবে আদম (আলাইহিস সালাম) এর কাছে পেশ করা হয়েছিল। আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, কে আমার উপর ঈমান আনবে আর কে আমাকে অস্বীকার করবে। যখন এ খবর মুনাফিকদের কাছে পৌছলো, তখন তারা হেসে বলতে লাগলো, 'হুযুর আলাইহিস সালাম' ওসব লোকদের জন্মের আগেই তাদের মুমিন ও কাফির হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন, অথচ আমরা তাঁর সাথেই আছি কিন্তু আমাদেরকে চিনতে পারেননি।' এ খবর যখন হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট পৌছলো, তখন তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে ইরশাদ ফরমানঃ এসব লোকদের কি যে হলো, আমার জ্ঞান নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করছে। এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি অবশ্যই বলে দিব।)

এ হাদীছ থেকে দু'টি বিষয় সম্পর্কে জানা গেল। এক, হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। দুই, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম অবগত।

(১৯) মিশকাত শরীফের 'কিতাবুল ফিতান' যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে মসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اَسْمَاءَ هُمْ وَاَسْمَاءَ اٰبَاءِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ خَيْرُ

فَوَارِسٍ اَوْمِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ.

অর্থাৎঃ তাদের নাম, (দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণকারীগণের) তঁদের বাপদাদাদের নাম ও তাদের ঘোড়াসমূহের বর্ণ পর্যন্ত আমার জানা আছে, তাঁরাই হবেন ভূ-পৃষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার।

(২০) মিশকাত শরীফের مناقب ابي بكر وعمر অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহু) হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট জানতে চাইলেন, এমন কেউ আছেন কিনা, যা'র নেকী সমূহ তারকারাজির সমসংখ্যক হবে?" হুযুর আলাইহিস সালাম উত্তরে ইরশাদ ফরমান, হ্যাঁ, এবং তিনি হলেন হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু)।

এ থেকে বোঝা গেল যে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত লোকের দৃশ্যমান ও গোপনীয় যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম পূর্ণরূপে অবগত আছেন। আসমানের সমস্ত দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নক্ষত্র সমূহেরও বিস্তারিত জ্ঞান তাঁর রয়েছে; অথচ নক্ষত্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ তাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেননি।

হুযুর আলাইহিস সালাম এ দু'বিষয় (আমল ও নক্ষত্র সম্বন্ধে, সম্যকরূপে অবগত বিধায় বলে ছিলেন যে হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) এর নেকীসমূহ নক্ষত্র রাজির সংখ্যার সমান। দুটো বস্তুর পরিমাণগত, সংখ্যাগত দিক থেকে সমান বা কম বেশী হওয়া সম্পর্কে তিনিই বলতে পারেন, যিনি উভয়টির জ্ঞান রাখেন, উভয় বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ সম্বন্ধেও সম্যকরূপে অবগত হন।

এ গুলো ছাড়াও আরও অনেক হাদীছ উপস্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু এ পরিচ্ছেদকে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এতটুকু যথাযথ মনে করা হয়েছে। এ হাদীছ সমূহ থেকে একটুকু বোঝা গেল যে, সমস্ত জগত হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে নিজ হাতের তালুর মত। লক্ষণীয় যে, عالم (আলম) বলতে আল্লাহ ব্যতীত বাকী সবকিছুকে বোঝায়। সুতরাং, আলমে মালায়িকা' (স্থুল জগত, সূক্ষ্ম জগত ও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জগৎ সমূহ) আরশ ও ফরশ মোট কথা প্রত্যেক কিছুর উপর হুযুর

আলাইহিস সালামের দৃষ্টি রয়েছে। 'আলমের' অন্তর্ভুক্ত লওহে মাহফুজও, যেখানে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয়তঃ এও বোঝা গেল যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আল-'ইহে ওয়াসাল্লাম) পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কেও জ্ঞাত। তৃতীয়তঃ ইহাও বোঝা গেল যে রাতের অন্ধকারে নির্জনে নিভৃতে যেসব কাজ সম্পন্ন করা হয়, উহাও মুহাম্মদ মুস্তাফা আলাইহিস সালামের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত নয়। যেমন আবদুল্লাহের বাপ যে হুযাইফা, সে সম্পর্কেও তিনি বলে দিয়েছেন। চতুর্থতঃ এও বোঝা গেল যে, কে, কখন, কোথায় মারা যাবে, কোন্ অবস্থায় মারা যাবে, কাফির, কি মুমিন হবে, নারীর গর্ভে কি আছে- এ সমস্ত কোন বিষয়ই হুযুর আলাইহিস সালাম থেকে লুকায়িত নয়। মোট কথা, বিশ্বের অণুপরমাণু, বিন্দু বিসর্গ সম্পর্কেও হুযুর আলাই-হিস সালামের সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ইলমে গায়ব সম্পর্কে হাদীছ ব্যাখ্যাকারীদের উক্তি সমূহের বর্ণনা)

(১) 'আইনী শরহে বুখারী', 'ফতহুলবারী', ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী' মি-রকাত শরহে মিশকাত প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচ্য অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত ১নং হাদীছের প্রেক্ষাপটে লিখা হয়েছেঃ-

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهُ اَخْبَرَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيْعِ اَحْوَالِ الْمَخْلُوْقَاتِ مِنْ اِبْتِدَاءِهَا اِلٰى اِنْتِهَائِهَا.

(এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে একই অবস্থানে হুযুর আলাইহিস সালাম সৃষ্টিকূলের আদ্যোপান্ত যাবতীয় অবস্থার খবর দিয়েদিলেন।)

(২) 'মিরকাত শরহে মিশকাত' 'শরহে শিফা' মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) রচিত 'যুরকানী শরহে মওয়াহেব' ও নসিমুর রিয়ায শরহে শিফা' প্রভৃতি ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহে ৪নং হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

وَحَاصِلُهُ اَنَّهُ طَوٰى لَهُ الْاَرْضَ وَجَعَلَهَا مَجْمُوْعَةً كَهَيْئَةِ كَفٍّ فِيْهِ مِرْءَةٌ يَنْظُرُ اِلٰى جَمْعِهَا وَطَوَاهَا بِتَقْرِيْبِ بَعِيْدِهَا اِلٰى قَرِيْبِهَا حَتّٰى

اِطَّلَعْتُ عَلٰى مَافِيْهَا.

অর্থাৎঃ এ হাদীছের সারমর্ম হচ্ছেঃ হুযুর আলাইহিস সালামের জন্য পৃথিবীকে সঙ্কুচিত করে দেয়া হয় এবং এমনভাবে একত্রিত করে দেয়া হয়, যেন কেউ এক হাতে আয়না নিয়ে সম্পূর্ণ আয়নাকে দেখছেন। যমীনকে এমনভাবে একত্রিত করে দেয়া হয়, যাতে দূরবর্তী অংশ নিকটবর্তী অংশের একেবারে কাছাকাছি দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে পৃথিবীতে যা' কিছু আছে, সবকিছুই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দেখতে পেয়েছেন।

(৩) 'মিরকাত শরহে মিশকাত-এ ৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ

فَعَلِمْتُ بِسَبَبِ وُصُوْلِ ذٰلِكَ الْفَيْضِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَعْنِىْ مَا اَعْلَمَهُ اللّٰهُ مِمَّا فِيْهِمَا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالْاَشْجَارِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سِعَةِ عِلْمِهِ الَّذِىْ فَتَحَ اللّٰهُ وَقَالَ اِبْنُ حَجَرٍ اَىْ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ الَّتِىْ فِى السَّمٰوٰتِ بَلْ وَمَا فَوْقَهَا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْمِعْرَاجِ وَالْاَرْضُ هِىَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ وَجَمِيْعَ مَا فِى الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ بَلْ وَمَا تَحْتَهَا كَمَا اَفَادَهُ اِخْبَارُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الثَّوْرِ وَالْحُوْتِ الَّذِىْ عَلَيْهِمَا الْاَرْضُوْنَ.

অর্থাৎ এ ফয়েয প্রাপ্তির দরুণ আমি আসমান যমীনের মধ্যে যা' কিছু আছে, সবকিছুই জেনে নিয়েছি। অর্থাৎ আসমান যমীনের ফিরিশতাকূল, গাছপালা ও অন্যান্য যা কিছু মহান আল্লাহ জ্ঞাত করিয়েছেন, সবই জেনে নিয়েছি। এটা হচ্ছে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যাপক জ্ঞানের বর্ণনা, যা' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাজর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জেনে নিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টি যা আসমান সমূহে বরং যা আসমানের উপরেও রয়েছে। (এ তথ্য মিরাজের বর্ণনা সম্বলিত হাদীছ থেকে জানা যায়) এবং জেনে নিয়েছেন যা কিছু পৃথিবীতে আছে এবং সে সমস্ত বস্তুও যা পৃথিবীর ৭টি স্তরেই বরং আরো নিচে রয়েছে। একথা সে সমস্ত হাদীছ থেকে বোঝা যায় যে,গুলোতে এমন গাভী ও মাছের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, যা'র উপর পৃথিবীর স্তরসমূহ স্থিতাবস্থায় রয়েছে।

'আশয়াতুল লুময়াত শরহে মিশকাত' গ্রন্থে উপরোক্ত ৫নং হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

عبادت است از حصول تمام علوم جزوى وكلى واحاطه آں

অর্থাৎঃ এ হাদীছে তাঁর বিশিষ্ট ও সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের ও উহার পরিব্যাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

(৪) আশয়াতুল লুময়াত শরহে মিশকাতে ৭নং হাদীছ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ-

پس ظاهر شد مراهرچيز از علوم وشناختم همه را،

অর্থাৎঃ আমার কাছে প্রত্যেক ধরনের জ্ঞান প্রতিভাত হয়েছে এবং আমি সবকিছুই জেনে নিয়েছি।

আল্লামা যুরকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'শরহে মওয়াহেব' গ্রন্থে উক্ত ৭নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ-

اَىْ اَظْهَرَ وَكُشِفَ لِىَ الدُّنْيَا بِحَيْثُ اَحَطْتُ بِجَمِيْعِ مَافِيْهَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَاهُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذِهٖ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهٗ نَظَرَ حَقِيْقَةً دُفِعَ بِهٖ اَنَّهٗ اُرِيْدَ بِالنَّظَرِ الْعِلْمُ-

অর্থাৎ আমার সামনে দুনিয়াকে প্রতিভাত করা হয়েছে, উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যার ফলে আমার দৃষ্টি উহার সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করেছে। সুতরাং, আমি পৃথিবীকে এবং যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে হবে, এমনভাবে দেখতে পেয়েছি, যেমনিভাবে আমার এ হাতকে দেখতে পাচ্ছি। এখানে এ কথারই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম বাস্তবরূপেই দেখেছেন। অতএব, এ কথা আর বলা চলবে না যে نظر (নযর) শব্দ বলতে জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে।

(৫) ইমাম আহমদ কুসতলানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর 'মওয়াহেব শরীফে' ৮নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ-

وَلَاشَكَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَطْلَعَهٗ عَلٰى اَزْيَدَ مِنْ ذٰلِكَ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ عِلْمَ

الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালামকে এর থেকে (৮নং হাদীছে বর্ণিত বিষয় সমূহ) আরও অধিক বিষয়ে অবহিত করেছেন এবং তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জ্ঞান দান করেছেন।

হযরত মোল্লা কারী (আলী) (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ১৭নং হাদীছ সম্পর্কে বলেনঃ-

يُخْبِرُ كُمْ بِمَا مَضٰى اَىْ سَبَقَ مِنْ خَبَرِ الْاَوَّلِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَاهُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ اَىْ مِنْ نَبَاءِ الْاٰخِرِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَمِنْ اَحْوَالِ الْاَجْمَعِيْنَ فِى الْعُقْبٰى.

(হুযুর আলাইহিস সালাম তোমাদেরকে পূর্ববর্তী লোকদের অতীত ঘটনাবলীর সংবাদ দিচ্ছেন, তোমাদের পরবর্তী লোকদের খবর দিচ্ছেন, অর্থাৎ ইহকালীন পরকালীন যাবতীয় বিষয়ের সংবাদ পরিবেশন করছেন।)

(৬) মিরকাতে ১৯নং হাদীছ প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ-

فِيْهِ مَعَ كَوْنِهٖ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ عِلْمَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيْطٌ بِالْكُلِّيَاتِ وَالْجُزْئِيَاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَغَيْرِهَا.

(এ হাদীছের মধ্যে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মুজিযার উপলব্ধির সাথে সাথে এ কথাও বোঝা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়কে এককভাবে ও সামগ্রিকরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।)

হাদীছবেত্তাগণের এসব ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম সমস্ত জগতকে এবং এতে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য যাবতীয় বিষয়কে এমনভাবে অবলোকন করছিলেন, যেমনভাবে কেউ নিজ হাতে আয়না নিয়ে আয়নাতে তাকাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, লওহে মাহ্‌ফুজও জগতে'র অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এও জানা যায় যে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানীদের অর্থাৎ আম্বিয়া কিরাম, ফিরিশতা ও আওলিয়ার জ্ঞান তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দান করা হয়েছে। নবীগণের মধ্যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)

হযরত ইব্রাহীম খলীল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) ও অন্তর্ভুক্ত আছেন। আর ফিরিশতাদের মধ্যে আরশ বহনকারী ও লওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, যাদের জ্ঞান 'যা' হয়েছে ও যা' হবে' ইত্যাদি বিষয় পরিব্যাপ্ত। তাহলে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার কোন অবকাশ আছে কি? তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জ্ঞানের সুবিস্তৃত পরিধির মধ্যে পঞ্চ(عُلُوْم خَمْسَة) জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(ইলমে গায়ব সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে উম্মতের অভিমত)

'মাদারেজুন নবুয়াত' গ্রন্থের ভূমিকায় শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেনঃ-

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ.

তিনিই প্রথম তিনিই সর্বশেষ, তিনিই দৃশ্যমান, তিনিই গোপন এবং তিনি প্রত্যেক কিছু জানেন।)

এ কথাগুলো আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় যেমন বলা যায়, আবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর গুণকীর্তনেও বলা যায়। যেমন তিনি (দেহলবী) বলেনঃ-

دوی مصطفے صلے اللہ علیہ وسلم داناست بہمہ چیزے ازشیونات ذات الہی واحکام وصفات حق واسماء وافعال واثار وبجمیع علوم ظاہر وباطن واول واخر احاطہ نمودہ ومصداق فوق کل ذی علم علیم شد.

অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলার স্বত্ত্বগত বিষয়াদি, গুণাবলী, বিধিবিধান, বিভিন্ন নাম, যাবতীয় কার্যাবলী, বিবিধ নিদর্শন, সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়াদি, আদি অন্ত প্রভৃতির যাবতীয় জ্ঞান তাঁরই করায়ত্ব। 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর অপেক্ষাকৃত বেশী জ্ঞানী বিদ্যমান' প্রবচনটি

তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উক্ত 'মাদারেজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে 'হুযুর আলাইহিস সালামের ফযীলতের বর্ণনা' প্রসঙ্গে ১৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছেঃ-

اززمان ادم تا نفخہ بروے علیہ السلام منکشف ساختند تاہمہ احوال اورا از اول واخر معلوم گردد ویاران خود رانیز بعضے احوال خبرداد،

(হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত সব কিছুই হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে প্রতিভাত করা হয়েছে, যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর অবস্থাদি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হন। তিনি এ ধরনের কিছু কিছু বিষয়ের সংবাদ সাহাবায়ে কিরামকেও দিয়েছেন।)

আল্লামা যুরকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শরহে মওয়াহেবে লদুনীয়ায়' বলেছেনঃ-

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ وَاتَّفَقَتْ مَعَانِيْهَا عَلٰى اِطِّلَاعِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا يُنَافِى الْاٰيٰتِ الدَّالَّةِ عَلٰى اَنَّهٗ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ لِاَنَّ الْمَنْفِىَّ عِلْمُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ اَمَّا اِطِّلَاعُهٗ عَلَيْهِ بِاَعْلَامِ اللّٰهِ فَمُحَقَّقٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

অগণিত বর্ণনাকারীর সমর্থনপুষ্ট হাদীছ সমূহের সর্বসম্মত ভাবার্থে এ কথা বলা হয়েছে যে গায়ব সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম অবগত এবং এ মাসআলাটি সে সব আয়াতের পরিপন্থী নয়, যেগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়ব জানে না। কেননা উক্ত আয়াত সমূহে যে বিষয়টির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, তা'হলো মাধ্যম ছাড়া অর্জিত জ্ঞান (স্বত্ত্বগত জ্ঞান) আর হুযুর আলাইহিস সালামের খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের বলে গায়ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর কালামের সে আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যেখানে বলা হয়েছেঃ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ। (কেবল তাঁর পছন্দনীয় রসূলকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করা হয়।)

'শেফা শরীফে' কাজী সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, (খরপূতী শরহে

কসিদায়ে বোর্দা থেকে সংগৃহীত।)

خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْاِطِّلَاعِ عَلٰى جَمِيْعِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ وَمَصَالِحِ اُمَّتِهٖ وَمَاكَانَ فِى الْاُمَمِ وَمَا سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِهٖ مِنَ النَّقِيْرِ وَالْقِطْمِيْرِ وَعَلٰى جَمِيْعِ فُنُوْنِ الْمَعَارِفِ كَاَحْوَالِ الْقَلْبِ وَالْفَرَائِضِ وَالْعِبَادَةِ وَالْحِسَابِ.

(আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালামকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত মঙ্গলময় বিষয়াদির জ্ঞান দান করেন। নিজ উম্মতের মঙ্গলজনক বিষয়, আগের উম্মতগণের ঘটনাবলী এবং নিজ উম্মতের নগণ্য হতে নগণ্যতর ঘটনা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করেছে; মারিফাতের সমস্ত বিষয় তথা অন্তরের অবস্থাসমূহ, ফরয কার্যাবলী ইবাদতসমূহ এবং হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি বিষয়েও তাঁকে অবহিত করেছেন।)

'কাসীদায়ে বোর্দায় আছেঃ-

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا - وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ হে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। আপনার বদান্যতায় দুনিয়া ও আখিরাতের অস্তিত্ব। লওহে মাহফূজ ও 'কলমের' জ্ঞান আপনার জ্ঞান ভাণ্ডারের কিয়দাংশ মাত্র।)

আল্লামা ইব্রাহীম বাজুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর 'শরহে কসীদায়ে বোর্দার' এ পংক্তিদ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণে লিখা হয়েছে।

فَاِنْ قِيْلَ اِذَاكَانَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ بَعْضَ عُلُوْمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا الْبَعْضُ الْاٰخَرُ اُجِيْبَ بِاَنَّ الْبَعْضَ الْاٰخَرَهُوَ مَا اَخْبَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اَحْوَالِ الْاٰخِرَةِ لِاَنَّ الْقَلَمَ اِنَّمَا كَتَبَ فِى اللَّوْحِ مَاهُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

অর্থাৎ যদি লওহে মাহফুজ ও কলমের জ্ঞানকে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের কিয়দাংশ বলা হয়, তাহলে তাঁর জ্ঞানের অন্যান্য অংশগুলো দ্বারা কোন্ ধরনের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে উহা হলো

পরকালের অবস্থাদির জ্ঞান, যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছেন। কেননা, কলম দিয়ে লওহে মাহফুজে কেবল ঐ সকল বিষয়ই লিখা হয়েছে, যা' কিছু কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) حل العقده شرح قصيده برده নামক গ্রন্থে উপরোক্ত পংক্তিদ্বয়ের মর্ম উদঘাটন করতে গিয়ে বলেছেনঃ-

وَكَوْنُ عُلُوْمِهِمَا مِنْ عُلُوْمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ عُلُوْمَهُ تَتَنَوَّعُ اِلَى الْكُلِّيَاتِ وَالْجُزْئِيَاتِ وَحَقَائِقَ وَمُعَارِفَ وَعَوَارِفَ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَعِلْمُهُمَا اِنَّمَا يَكُوْنُ سَطْرًا مِنْ سُطُوْرِ عِلْمِهٖ وَنَهْرًا مِنْ بُحُوْرِ عِلْمِهٖ وَحَرْفًا مِنْ سُطُوْرِ عِلْمِهٖ.

(লওহে মাহফুজ ও 'কলমের' জ্ঞানকে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের কিয়দাংশ এ জন্যই বলা হয় যে, হুযুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা যেতে পারে। যেমন তাঁর জ্ঞান বস্তু বা বিষয়ের একক, সামগ্রিক সত্ত্বা, মৌলিক সত্ত্বা ও খোদার পরিচিতি, এমনকি খোদার সত্ত্বাও গুণাবলী সম্পর্কিত পরিচিতিকেও পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং লওহ ও কলমের জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমুদ্রের একটি খালতুল্য কিংবা তাঁর জ্ঞানের দপ্তরের এক অক্ষর সদৃশ মাত্র।

উল্লেখিত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, লওহ ও 'কলমের' বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, যা'র সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে- وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (ভিজা, শুকনা এমন কোন বস্তু নেই, যা' লওহে মাহফুজে উল্লেখ করা হয়নি,) হুযুর আলাইহিস সালামের বহুমুখী জ্ঞান সমদ্রের এক ফোঁটা মাত্র। তাহলে বোঝা গেল যে পূর্বাপর সব বিষয়ের জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালমের জ্ঞান ভাণ্ডারের একটি বিন্দু মাত্র।

'কসীদায়ে বোর্দার সুপ্রসিদ্ধ লিখক ইমাম বু'চিরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর অন্য এক কসিদায় বলেছেনঃ-

وَسِعَ الْعَالَمِيْنَ عِلْمًا وَّحِلْمًا - فَهُوَبَحْرٌ لَّمْ تَعِيْهَا الْاَعْبَاءُ.

হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমগ্র জগতকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তিনি হচ্ছেন এমন এক সাগর, যা'কে অন্যান্য পরিবেষ্টনকারীরাও পরিবেষ্টন করতে পারেননি।)

শাইখ সুলাইমান জুমাল উক্ত পংক্তিদ্বয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ফুতুহাতে আ-হমদীয়া' গ্রন্থে লিখেছেনঃ-

اَیْ وَسِعَ عِلْمُهٗ عُلُوْمَ الْعٰلَمِیْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلٰئِكَةِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَطْلَعَهٗ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهٖ فَعَلِمَ عِلْمَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ وَمَاكَانَ وَمَا یَكُوْنُ وَحَسْبُكَ عِلْمُهٗ عِلْمَ الْقُرْاٰنِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَیْءٍ.

অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান সমগ্র জগত তথা জীন-ইনসান এবং ফিরিশতাগণের ব্যাপক জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ তাঁকে সারা জগত সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ ব্যাপক জ্ঞানের জন্য কুরআনের জ্ঞানই যথেষ্ট। আল্লাহতা'য়ালা ইরশাদ করেছেনঃ مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَیْءٍ অর্থাৎ আমি এ কিতাবে কোন কিছু বাদ দিইনি। ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) উক্ত পংক্তিদ্বয়ের ব্যাখ্যায় اَفْضَلُ الْقُرٰى নামক কিতাবে লিখেছেনঃ-

لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَطْلَعَهٗ عَلَى الْعَالَمِ فَعَلِمَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ وَمَا كَانَ وَمَا یَكُوْنُ.

মহান আল্লাহ হুযুর আলাইহিস সালামকে সমস্ত জগত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সুতরাং, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়সমূহ ও যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সবকিছুই জেনে নিয়েছেন।)

উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বোঝা গেল যে, সমস্ত বিশ্ববাসীর জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববাসীদের মধ্যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম !)ও ৰ:ৎ(২ৰ,

ফিরিশতাগণ, মৃত্যুর ফিরিশতা ও শয়তানও অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর ফিরিশতা ও শয়তানের ইলমে গায়ব দেওবন্দীরাও স্বীকার করে।

ইমাম বু'চিরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'কসীদায়ে বোর্দায় উল্লেখ করেছেনঃ-

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ-
غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّیَمِ

(সবাই হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করে থাকেন, যেমন কেউ সমুদ্র থেকে কলসি ভরে বা প্রবল বৃষ্টি ধারার ছিটে ফোঁটা থেকে পানি সংগ্রহ করে।)

আল্লামা খর পূতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শরহে কছীদায়ে বোর্দায় এ পংক্তিদ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণে লিখেছেনঃ-

اِنَّ جَمِیْعَ الْاَنْبِیَاءِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَلَبُوْا وَاَخَذُوْا الْعِلْمَ مِنْ عِلْمِهٖ عَلَیْهِ السَّلَامُ الَّذِىْ كَالْبَحْرِ فِى السَّعَةِ وَالْكَرَمَ مِنْ كَرَمِهٖ عَلَیْهِ السَّلَامُ الَّذِىْ هُوَ كَالدِّیَمِ لِاَنَّهٗ عَلَیْهِ السَّلَامُ مُفِیْضٌ وَهُمْ مُسْتَفَاضُوْنَ لِاَنَّهٗ تَعَالٰى خَلَقَ اِبْتِدَاءً رُوْحَهٗ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَوَضَعَ فِیْهِ عُلُوْمَ الْاَنْبِیَاءِ وَعِلْمَ مَاكَانَ وَمَایَكُوْنُ ثُمَّ خَلَقَهُمْ فَاَخَذُوْا عُلُوْمَهُمْ مِنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

(প্রত্যেক নবী হুযুর আলাইহিস সালামের সে জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান চেয়ে নিয়েছেন, যা' বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে বিশাল সমুদ্রের মত এবং সবাই তাঁর সে করুণারাশি থেকে করুণা প্রাপ্ত হয়েছেন, যা' অঝোর বারিধারার মত। কেননা, হুযুর আলাইহিস সালাম হলেন ফয়েযদাতা আর অন্যান্য নবীগণ হলেন ফয়েয গ্রহীতা। মহাপ্রভু সর্বপ্রথম হুযুর আলাইহিস সালামের রূহ মুবারক সৃষ্টি করে তাতে নবীগণের ও পূর্বাপর প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান রাশি সঞ্চিত রাখেন। অতঃপর অন্যান্য রসুলগনকে সৃষ্টি করেন। সুতরাং, তারা সবাই নিজ নিজ জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালাম থেকে সংগ্রহ করেছেন)

হযরত হাফিজ সোলাইমান (রহঃ) 'ইবরীয শরীফের' ২৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ-

وَعِنْدَنَا یَعْلَمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنَ الْعَرْشِ اِلَى الْفَرْشِ وَیَطَّلِعُ عَلٰى جَمِیْعِ مَا فِیْهَا وَهٰذَا الْعُلُوْمُ بِالنِّسْبَةِ اِلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ كَالْفِ مِنْ

سِتِّيْنَ جُزْءً اَلَّتِى هِىَ الْقُرْاٰنُ الْعَزِيْزُ.

(আমাদের মতে হুযুর আলাইহিস সালাম আরশ থেকে পাতালপুরী পর্যন্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন; এগুলোর মধ্যে যা' কিছু আছে, তা'রও খবর রাখেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উপরে আর কেউ নেই। এ ব্যাপক জ্ঞানও হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞানের পরিধির তুলনামুলক সম্পর্ক হচ্ছে এরূপ, যেরূপ ষাট অংশ বিশিষ্ট কুরআনের তুলনায় 'আলিফ' অক্ষরটি।

প্রখ্যাত ইমাম কুসতালানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'মওয়াহেব শরীফে' উল্লেখ করেনঃ-

اَلنُّبُوَّةُ مَاخُوْذَةٌ مِنَ النَّبَاءِ بِمَعْنَى الْخَبَرِ اَىْ اَطْلَعَهُ اللّٰهُ عَلَى الْغَيْبِ.

نُبُوَّتُ শব্দটি نَبَا শব্দ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হচ্ছে খবর বা জ্ঞান। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। 'মওয়াহেবে লদুনীয়া'র দ্বিতীয় খন্ডে ১৯২ পৃষ্ঠায় اَلْقِسْمُ الثَّانِى فِيْمَا لَخَبَّرِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْغُيُوْبِ শীর্ষক আলোচনায় লিখা হয়েছেঃ-

لَاشَكَّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَطْلَعَهُ عَلٰى اَزْيَدَمِنْ ذٰلِكَ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

(এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালামকে এর থেকেও বেশী বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাঁর কাছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানীদের সমুদয় জ্ঞান অর্পণ করেছেন।)

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর 'মকতুবাত শরীফের' প্রথম খণ্ডের ৩১০নং মকতুবে বলেছেনঃ-

هر علم كه مخصوص به اوست سبحانه خاص رسل را اطلاع مى بخشند،

(যে জ্ঞান আল্লাহর জন্য বিশেষরূপে নির্ধারিত, সে জ্ঞান কেবল বিশেষ রসুল-গণকে জ্ঞাত করা হয়।)

'মাদারেজুন নাবুয়াতের' প্রথম খণ্ডে উল্লেখিত আছেঃ-

ازبعض صلحاء ازاهل فضل شنيده كه بعضے از عرفا كتابے نوشته اند اثبات كرده اند كه آں حضرت راتمام علوم الهى معلوم ساخته بودند وايں سخن بظاهر مخالف بسيارے ازادله است تاقائل آں چه قصد كرده باشد.

(কোন পুণ্যত্মা আলেমের মুখে শুনা গেছে যে, কোন আরেফ বা খোদার পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তি একটি কিতাব লিখেছেন। সেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামকে দান করা হয়েছে। এ কথাটি আপাতঃ দৃষ্টিতে অনেক দলীল প্রমাণের পরিপন্থী। জানিনা, এরূপ উক্তি থেকে বক্তা কি বোঝাতে চেয়েছেন।)

উপরোক্ত উক্তিটি এখানে এ জন্য উল্লেখ করা হলো যে কোন কোন লোক হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানকে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের সমপরিমাণ বলে বিশ্বাস করেন; শুধু একথা স্বীকার করেন যে খোদার জ্ঞান সত্ত্বাগত, আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞান খোদা প্রদত্ত এই যা পার্থক্য। কিন্তু দেখুন, শাইখ আবদুল হক ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাদেরকে মুশরিক বলেননি, বরং 'আরিফই' বলেছেন। এতে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালা-মের জন্য ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান স্বীকার করা শিরক নয়।

'মীর যাহেদের রেসালা'র ভূকিমায় উল্লেখিত আছেঃ-

كَانَ صَوَادِقَ التَّصْدِيْقَاتِ بِطَبَا يُعِهَا مُتَوَجِّهَةً اِلٰى حَضْرَتِهِ الْاَقْدَسِ وَحُقَائِقُ التَّصَوُّرَاتِ بِاَنْفُسِهَا مَائِلَةً اِلٰى جَنَابِهِ الْمُقَدَّسِ فَرُوْحُهُ الْمُعَلّٰى مَرْكَزُ الْمَعْقُوْلَاتِ تَصَوُّرَاتِهَا وَتَصْدِيْقَاتِهَا وَنَفْسُهُ الْعُلْيَامَنْبَعُ الْعَقْلِيَاتِ نَظْرِيَّاتِهَا وَفِطْرِيَّاتِهَا.

অর্থাৎ যাবতীয় অবধারণ' প্রসূত জ্ঞান রাশি স্বভাবতই সেই পবিত্র সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। আর সামান্য ধারণা সমূহের স্বয়ং 'জাত্যর্থ সমূহও' ওই পূতঃপবিত্র সত্ত্বাভিমুখী তাবৎ প্রজ্ঞামূলক বিষয়ের সামান্য ধারণা ও অবধারণ সমূহের কেন্দ্র হচ্ছে তাঁরই সুমহান রূহ মুবারক। আর প্রজ্ঞার সাথে সম্বন্ধিত বুদ্ধি বৃত্তি নির্ভর ও বুদ্ধি বৃত্তি প্রয়োগ ছাড়া বোধগম্য তাবৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের নির্ঝরিণী হচ্ছে তাঁরই মহিমান্বিত আত্মসত্ত্বা।

বিঃদ্রঃ যুক্তি বিদ্যায় দু'টো ধারণার মধ্যে একটির সাথে অপরটির সম্পর্কের

স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক মানসিক প্রক্রিয়াকে تصديق 'অবধারণ বলা হয়।

বস্তুর মানসিক প্রতিবেদনকে সামান্য ধারণা تصور বলা হয়ে থাকে।

উপজাতিবাচক পদ যা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের افراد উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয় । তাই حقيقت জাত্যর্থ। যেমন -মানুষ ধারণাটি রহিম,করিম, বকর ,যায়দ প্রমুখের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

উক্ত রেসালার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মওলানা গোলাম ইয়াহিয়া কর্তৃক রচিত لواءالهدى নামক কিতাবে উক্ত উদ্ধৃতি/তাৎপর্য বিশ্লেষণে লিখা হয়েছে فذاته عليه السلام جامع بين حميع انحاء العلوم অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম এর সত্ত্বা সর্ব বিধ জ্ঞানের আকর ।

সুবাহানাল্লা! এ উদ্ধৃতি দ্বারা রহস্যঘেরা যবনিকার উত্থোলন হল। যুক্তিবাদীরাও নবীর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও মহান দরবারে মাথা নত করলেন।

বাহরুল উলুম মওলানা আবদুল আলী লখনবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মীর যাহেদ রেসালার টীকার ভূমিকায় লিখেছেন -

عَلَّمَهُ عُلُوْمًا مَا احْتَوٰى عَلَيْهِ الْعِلْمُ الْاَعْلٰى وَمَا اسْتَطَاعَ عَلٰى اِحَاطَتِهَا اللَّوْحُ الْاَوْفٰى لَمْ يَلِدِ الدَّهْرُ مِثْلَهُ مِنَ الْاَزَلِ وَلَمْ يُوْلَدْ اِلَى الْاَبَدِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُفُوًا اَحَدٌ

আল্লাহ তাআলা হুযুর আলাইহিস সালামকে সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন যেগুলো সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কলম বা কলমে আলার আওতায়ও আসেনি । লওহে মাহফুজও সেগুলোকে আয়ত্ত্ব করতে পারেনি । তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মত কোন কালে কেউ জন্মগ্রহণ করেননি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে; আর অনন্তকাল পর্যন্ত কেউ তার সমকক্ষ হবেন না । সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কোথাও তাঁর সমতুল্য কেউ নেই

আল্লামা শুনউয়ারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) جمع النهاية নামক কিতাবে বলেন -

قَدْ وَارَدَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يُخْرِجِ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اَطْلَعَهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

(একথা বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা নবী আলাইহিস সালামকে সর্ব বিষয়ে অবহিত না করে ধরাধাম থেকে নিয়ে যাননি।

শরহে আকায়িদে নসফী গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে ঃ-

بِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ لِلْعِبَادِ اِلَّا بِاِعْلَامٍ مِنْهُ اَوْ اِلْهَامٍ بِطَرِيْقِ الْمُعْجِزَاتِ اَوِ الْكَرَامَةِ

.(সার কথা হলো এযে অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যার একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন খোদা তাআলা। বান্দাদের পক্ষে ওই গুলো আয়ত্ব করার কোন উপায় নেই, যদি মহান প্রভু মুজিযা বা কারামত স্বরূপ ইলহাম বা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

সুপ্রসিদ্ধ দুররুল মুখতার গ্রন্থের কিতাবুল হজ্বের প্রারম্ভে আছে

فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ تِسْعٍ وَاِنَّمَا اَخَّرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَشْرٍ لِعُذْرٍ مَعَ عِلْمِهِ بِبَقَاءِ حَيَاتِهِ لِيُكْمِلَ التَّبْلِيْغَ

হজ্ব নবম হিজরীতে ফরজ হয়, কিন্তু হুযুর আলাইহিস সালাম বিশেষ কোন কারণে একে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্বিত করেন । হুযুর আলাইহিস সালাম তার পবিত্র ইহকালীন জীবনের বাকী সময় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় হজ্ব স্থগিত করেছিলেন যাতে ইসলাম প্রচারের কাজ পূর্ণতা লাভ করে।)

এ ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে মৃত্যু কখন হবে সে বিষয়ের জ্ঞান পঞ্চজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু হুযুর আলাইহিস সালাম তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, জানতেন যে নবম হিজরীতে তাঁর ওফাত হবে না,এ জন্য সে বছর হজ্ব আদায় করেননি। অথচ হজ্ব ফরজ হওয়ার সাথে সাথে উহা আদায় করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমরা মৃত্যুর খবর রাখি না।

আল্লামা খরপুতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শরহে কসীদায়ে বোর্দায় ইমাম বুচিরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) রচিত উপরোক্ত পংক্তিদ্বয় প্রসঙ্গে বলেছেনঃ-

وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ وَفِى حَدِيْثٍ يُرْوٰى عَنْ مُعٰوِيَةَ اَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ اَلْقِ الدَّوَاةَ وَحَرِّفِ الْقَلَمَ وَاَقِمِ الْبَاءَ وَفَرِّقِ السِّيْنَ وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيْمَ مَعَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَءْ مِنْ كِتَابِ الْاَوَّلِيْنَ.

হযরত আমীর মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে যে, তিনি হুযুর আলাইহিস সালামের সামনেই লিখার কাজ করতেন। হুযুর আলাইহিস সালাম তাঁকে বলছিলেন, দোয়াত এভাবে রাখ, কলমকে ঘুরাও, (ب) বা অক্ষরকে সোজা কর (س) 'সীন' অক্ষরটি পৃথক কর এবং (م) 'মীম' কে বাঁকা করো না। অথচ হুযুর আলাইহিস সালাম লিখার পদ্ধতি শিখেননি, পূর্ববর্তীদের কোন কিতাবও পড়েননি।

'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ-

كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْخُطُوطَ وَيُخْبِرُ عَنْهَا

(হুযুর আলাইহিস সালাম লিখতে জানতেন এবং সে বিষয়ে অপরকেও জ্ঞাত করতেন।)

এ থেকে প্রমাণিত হল যে হুযুর আলাইহিস সালাম ভালমতে লিখতে জানতেন। এর পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক বিবরণ আমার রচিত 'শানে হাবীবুর রাহমান বি আয়াতিল কুরআন' নামক কিতাবে দেখুন।

মছনবী শরীফে আছেঃ-

سرمه کن درچشم خاک اولیا - تابه بینی زابتداتاانتها.
کاملاں ازدورنامت بشنوند - تابقعرتاروپودت دروروند
بلکه پیش اززادن توساله - دیده باشندت بچندیں حالها.
حال تودانندیك یك موبمو - زانکه پرهستندازاسرارهو.

অর্থাৎ ওলীগণের পদধুলিকে তোমার চোখের সুরমা স্বরূপ গ্রহণ কর, যাতে তোমার আদি অন্তকালীন অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। কামিল ওলীগণ অনেকদূর থেকে তোমার কথা শুনতে পান, তাঁরা প্রয়োজন বোধ তোমার অংগ প্রত্যংগের রন্ধ্রে রন্ধ্রেও প্রবেশ করতে পারেন। তোমার জন্মের বহু পূর্বেই তোমার যাবতীয় অবস্থা অবলোকন করে থাকেন। তোমার যাবতীয় অবস্থা পুরোপুরিভাবে তাঁরা জানেন, কেননা তাঁরা আল্লাহর রহস্যাবলীর ধারক হয়ে থাকেন।

সেই 'মছনবী শরীফে' মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বিধর্মী যুদ্ধ বন্দীদের একটি ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেন যে, হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ

ফরমানঃ-

بنگرم سرعالم بینم نهاں - آدم وحوانرسته ازجهاں.
من شمارا وقت ذرات السبت - دیده ام پابسته ومنکوس وپست
ازحدوث آسمان بےعمد - آنچه دانسته بدم افزوں نه شد

অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সে সময় থেকে দেখে আসছি, তখন আদম ও হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টিও হয়নি। হে বিধর্মী বন্দীগণ, প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন (মীছাকের দিন) আমি তোমাদেরকে মুমিন ও নামাযীরূপে দেখেছিলাম। তোমাদেরকে এ জন্যই বন্দী করেছি যাতে তোমরা ঈমান আন। খুঁটিবিহীন আসমান ইত্যাদির সৃষ্টি আমি যেরূপ দেখেছি, তার কোনরূপ তারতম্য এখনও পরিলক্ষিত হয়নি।)

উলামায়ে কিরামের এসব উক্তি থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ'তাআলা হুযুর আলাইহিস সালামকে সমস্ত নবী ও ফিরিশতা থেকেও বেশী জ্ঞান দান করেছেন। 'লওহে মাহফুজ' ও 'কলমের' জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের এক ফোঁটা মাত্র। সৃষ্টি জগতের এমন কোন কিছু নেই,যা' হুযুর আলাইহিস সালামের সত্যদর্শী দৃষ্টি থেকে গোপন রয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণের ভাষ্য থেকে 'ইলমে গায়ব' এর সমর্থন প্রসঙ্গ)

এতক্ষণ পর্যন্ত ইলম গায়বের সমর্থনকারীদের ভাষ্য সমূহ থেকে হুযুর আলাইহিস সালামের 'ইলমে গায়ব' এর বিষয়টি প্রমাণ করা হলো। এবার এর অস্বীকারকারীদের মাননীয় মুরব্বীদের ভাষ্য সমূহ পেশ করা হচ্ছে, যদ্বারা ইলমে গায়ব সম্পর্কিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যায়।

হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত 'শামায়েলে ইমদাদিয়া' গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'লোকে বলে, 'নবী ওলীগণ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হন না। আমি বলি, সঠিক পথের পথিকগণ যে দিকে দৃষ্টি দেন, অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হন। আসলে এ জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। আঁ হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়ার ঘটনা ও হযরত আয়েশা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সম্পর্কিত ঘটনার ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিলেন-এ বিষয়টিকে বিরুদ্ধবাদীগণ তাদের দাবীর অনুকুলে মনে করেন। এ রূপ ধারণা ভ্রান্ত। কেননা কোন কিছু

জানার জন্য একাগ্রতা প্রয়োজন। ('আনোয়ারে গায়বিয়া' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত।)

মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব লাতায়েফে রশিদিয়া গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ নবীগণ সব সময় অদৃশ্য বিষয়াদি দর্শন করেন, আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়ে সবকিছুর প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকেন। যেমন নবী আলাইহিস সালাম ফরমানঃ-

لَوْتَعْلَمُوْنَ مَااَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًاوَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ۚ

অর্থাৎ আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে। আরও ইরশাদ করেছেনঃ- اِنِّىْ اَرٰى مَالَاتَرَوْنَ (নিশ্চয়ই আমি যা দেখি, তা তোমরা দেখ না (আনো য়ারে গায়বিয়া' ৩২ পৃষ্ঠা।)

মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব 'তকমীলুল ইয়াকীন' গ্রন্থের (হিন্দুস্থান প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত) ১৩৫ পৃষ্ঠায় বলেনঃ শরীয়তে বর্ণিত আছে যে, রসুল ও ওলীগণ অদৃশ্য বিষয় ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর খবর দিয়ে থাকেন। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলা গায়ব ও ভবিষ্যতের বিষয়াদি জানেন, সেহেতু সবকিছুই তাঁর জানা মতে, তাঁরই ইচ্ছানুসারে, তাঁরই উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং, আল্লাহ যদি তার রসুল ও ওলীগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন, তাঁকে গায়ব বা ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর খবর দেন, তবে প্রতিবন্ধকতা কিসের? যদিও বা আমরা এ ধারণা পোষণ করি যে গায়বী বিষয় সমূহের কোন কিছু সত্ত্বাগতভাবে জানা মানব প্রকৃতি সজ্জাত নয়, কিন্তু আল্লাহ যদি কাউকে অবহিত করেন, তখন প্রতিরোধ করার কে আছে? সুতরাং, যা কিছু তাঁরা জানেন, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক জানানোর ফলেই জানতে পেরে অন্যান্যদেরকে খবর দেন। উনাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি সত্বাগত ইলমে গায়বের দাবীদার। মুহাম্মদী শরীয়তে (বান্দার জন্য) সত্বাগত ইলমে গায়বের দাবী করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং যে এরূপ দাবী করে, তাকে 'কাফির বলা হয়।

মৌলভী কাসেম নানুতবী 'তাহযীরুন নাস' গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "পূর্ববর্তীদের জ্ঞান এক ধরনের, আর পরবর্তীদের জ্ঞান ভিন্ন ধরনের। কিন্তু সে সমুদয় জ্ঞান আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে পুঞ্জিভূত

করা হয়েছে। অতএব রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানী এবং অন্যান্য নবী ও ওলীগণ হলেন পরোক্ষ জ্ঞানী।"

এ বক্তব্যের শেষ অংশটুকুর প্রতি লক্ষ্য করা দরকার যে, মৌলভী কাসেম সাহেব হুযুর আলাইহিস সালামের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের জ্ঞানের সমাবেশ স্বীকার করেছেন। পূর্ববর্তীগণের মধ্যে হযরত আদম (আঃ), হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম), হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম), আরশ বহনকারী ও লওহে মাহফুজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, উল্লেখিত সবার জ্ঞানের তুলনায় হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান বেশী হওয়া চাই। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞান সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোকপাত করেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইলমে গায়বের সমর্থনে যুক্তিনির্ভর প্রমাণসমূহ ও আওলিয়া কিরামের ইলমে গায়বের বর্ণনা।)

কতেকগুলো যুক্তিসঙ্গত তথ্যাবলী থেকেও পূর্বাপর যাবতীয় مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ বিষয়ের জ্ঞানের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। সে সমস্ত দলীলপ্রমাণ নিম্নে দেয়া গেল।

(১) হুযুর সায়্যিদুল আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন খোদার রাজত্বের উযীরে আ'যম তথা 'খলীফায়ে আযম'। হযরত আদম (আলাইহস সালাম) কে আল্লাহর 'খলীফা' মনোনীত করা হয়েছিল। তাহলে নিঃসন্দেহ হুযুর আলাইহিস সালাম সেই রাজত্বের 'খলীফায়ে আযম' এবং পৃথিবীতে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতিনিধি। রাজ্যে নিযুক্ত শাসকের দু'টো গুণ থাকা আবশ্যক-এক, জ্ঞান, দুই, ইখতিয়ার বা কাজ করার স্বাধীনতা। এ পার্থিব রাজত্বের শাসকগণ যতবড় পদমর্যাদার অধিকারী হন, সে অনুপাতে তাদের জ্ঞান কর্মক্ষমতাও বেশী থাকে। কালেকটর বা জিলা প্রশাসকের সম্পূর্ণ জিলা সম্পর্কে জ্ঞান ও সমগ্র জিলার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। ভাইসরয় বা গভর্নরের সমগ্র দেশের জ্ঞান ও অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা জরুরী। কেননা এ দু'টি গুণ ব্যতীত তিনি শাসন করতে পারেন না, রাজকীয় ফরমানও প্রজাদের মধ্যে জারী করতে পারবেন না। অনুরূপ, নবীগণের মধ্যে যার যতবড় পদমর্যাদা রয়েছে, তাঁর সে অনুপাতে জ্ঞান ও ক্ষমতা রয়েছে।

মহাপ্রভু আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম) এর খেলাফত প্রমাণ করেছেন, তাঁর জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি রূপে। অর্থাৎ আদম (আলাইহিস সালাম) কে এত ব্যাপক জ্ঞান দান করেছেন, যা' আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। আর ফিরিশতাগণের দ্বারা সিজদা করানো, তাঁর বিশেষ ক্ষমতার প্রমাণবহ। ফিরিশতাগণও তাঁর কাছে মাথা নত করেছেন। অতএব, নবী করীম আলাইহিস সালাম যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী এবং আসমান যমীনের সমস্ত লোক তাঁর উম্মত, সেহেতু তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অন্যান্য সমস্ত নবীগণের তুলনায় বেশী জ্ঞান ও ক্ষমতা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ জন্যই তাঁর থেকে অনেক মুজিযা' প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি আঙ্গুলের ইঙ্গিতেই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন। ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে এনেছেন, মেঘকে নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে পানি বর্ষণ করেছে, আবার সেই মেঘ খণ্ডকে হুকুম করার সাথে সাথে বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলো হলো তাঁর খোদা প্রদত্ত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

(২) মৌলভী কাসেম নানুতবী সাহেব 'তাহযীরুন নাস' কিতাবে লিখেছেন 'নবীগণ জ্ঞানের দিক দিয়ে উম্মত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন, আর বাহ্যিকভাবে আমলের দিক দিয়ে অনেক সময় উম্মত নবীকেও অতিক্রম করে যায়" এতে বোঝা গেল যে আমলের ক্ষেত্রে উম্মত নবীকে অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে নবীর জ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া প্রয়োজন। হুযুর আলাইহিস সালামের উম্মতের মধ্যে, ফিরিশতাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনেই বলা হয়েছেঃ। لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সমস্ত জগৎবাসীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হন) তাহলে নিঃসন্দেহে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান ফিরিশতাগণের তুলনায় বেশী হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায়, কোন্ গুণের দিক দিয়ে হুযুর আলাইহিস সালাম উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ হবেন? লওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিযুক্ত ফিরিশতাগণেরতো যা কিছু হয়েছে ও হবে مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ সে সব কিছুর জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং হুযুর আলাইহিস সালামের আরও অধিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(৩) কয়েক বছর উপযুক্ত শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকলে মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায়। হুযুর আলাইহিস সালাম জন্ম গ্রহণের আগে কোটি কোটি বছর আল্লাহর মহা দরবারে অবস্থান করেছেন। এমতাবস্থায় হুযুর পূর্ণ আলেম হবেন না কেন? 'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' لَقَدْ جَاءَكُمْ الخ - বলা হয়েছে যে, একদা হযরত

জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) হুযুরের সমীপে আরয করলেন, 'একটি নক্ষত্র সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হয়। আমি এটিকে বাহাত্তর হাজার বার আলোক উদ্ভাসিত দেখেছি।' তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমানঃ 'আমিই ছিলাম সেই নক্ষত্র'। হিসেব করে দেখুন কত কোটি বছর মহান আল্লাহর দরবারে অবস্থান করেছিলেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

(৪) ছাত্র বা শিষ্যের জ্ঞানের মধ্যে অপূর্ণতা থাকলে তা কেবল চারটি কারণেই হতে পারে। এক, শাগরিদ অনুপযুক্ত ছিল; উস্তাদ থেকে পূর্ণ ফয়েয লাভ করতে পারেননি। দুই, উস্তাদ কামিল ছিলেন না, যার ফলে পরিপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারেননি। তিন, উস্তাদ হয়ত কৃপণ ছিলেন, পরিপূর্ণ জ্ঞান সেই শাগরিদকে দান করেননি, কিংবা তার থেকে বেশী প্রিয় অন্য শাগরিদ ছিল, যাকেই সব কিছু শিখায়েছেন। চার, যে কিতাবটি পড়ানো হয়েছিল, সেটি পূর্ণাঙ্গ ছিল না। এ চারটি কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণ থাকতেই পারে না। এখানে শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ, আর ছাত্র হলেন মাহবুব আলাইহিস সালাম, এবং যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো কুরআন ও স্বীয় বিশেষ জ্ঞান সমূহ। এখন বলুন, মহাপ্রভু আল্লাহ কি কামিল শিক্ষক নন? বা রসুল আলাইহিস সালাম কি উপযুক্ত শাগরিদ নন? বা রসুল আলাইহিস সালামের চেয়েও বেশী প্রিয় আর কেউ আছেন, অথবা কুরআন কি পূর্ণ কিতাব নয়? যখন এগুলোর মধ্যে কোন কারণই বিদ্যমান নেই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদানকারী, মাহবুব আলাইহিস সালামও পরিপূর্ণ গ্রহণকারী, এবং কুরআন হলো একটি পরিপূর্ণ কিতাব, যেখানে উক্ত হয়েছেঃ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (দয়াময় আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছেন), আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হলেন আল্লাহর দারবারে বেশী 'মকবুল' বান্দা, তখন তাঁর জ্ঞান কেন অপূর্ণ হবে?

(৫) আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কথা কেন লওহে মাহফুজে লিখলেন? লিখার প্রয়োজন হয় স্মরণ রাখার জন্য, যাতে ভুলবার উপক্রম না হয় বা অন্যদেরকে জানানোর জন্য। আল্লাহ তা'আলা ভুলত্রুটি থেকে পূতঃ পবিত্র। কাজেই তিনি অন্যদের জন্য লিখেছেন। অন্যদের মধ্যে হুযুর আলাইহিস সালামই হলেন সর্বাধিক প্রিয়। সুতরাং, সেই লেখাটা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

(৬) অদৃশ্য বিষয় সমূহের মধ্যে সর্বাধিক অদৃশ্য হলো আল্লাহর সত্ত্বা। হযরত মুসা (আঃ) যখন আল্লাহকে স'চক্ষে কামনা করেছিলেন, তখন বলা হয়েছিলঃ لَنْ

تَرَانِیْ (তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।) আর যখন মাহবুব আলাইহিস সালাম মিরাজের সময় স্বীয় পবিত্র চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখলেন, তখন সৃষ্টি জগত কি তাঁর দৃষ্টির আড়ালে গোপন থেকে যেতে পারে?

اور کوئی غیب کیاتم سے نہاں ہوبھلا
جب نہ خداہی چھپاتم پہ کروڑوں درود.

অর্থাৎ খোদাই যখন আপনার দৃষ্টি থেকে গোপন রইল না, তখন আর কিইবা আছে, যা' অদৃশ্য থাকতে পারে? আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি কোটি কোটি দরূদ।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর দর্শন লাভের বর্ণনা আমার রচিত 'শানে হাবীবুর রাহমানে দেখুন।

'মিরকাত শরহে মিশকাতের' الایمان بالقدر। অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে উল্লেখিত আছেঃ-

كَمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰهُ فِى الدُّنْيَا لِاِنْقِلَابِهٖ نُوْرًا

(হুযুর আলাইহিস সালাম ইহ জগতেই আল্লাহকে দেখেছিলেন, কেননা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজেই নূরে পরিণত হয়েছিলেন।)

(৭) শয়তান হলো দুনিয়াবাসীদের পথভ্রষ্টকারী আর নবী আলাইহিস সালাম হলেন সৎপথের দিশারী। শয়তান হলো মহামারীর মত আর নবী আলাইহিস সালাম হলেন সর্বরোগের সর্ববিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে পথভ্রষ্ট করার সহায়ক এত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী জ্ঞান দান করেছেন যে পৃথিবীর কেউ তার দৃষ্টির অগোচরে থাকে না। তার কাছে এ খবরও আছে যে কাকে পথভ্রষ্ট করা যাবে, আর কাকে করা যাবে না; এবং যে পথভ্রষ্ট হওয়ার আছে, তাকে কিভাবে পথভ্রষ্ট করতে হবে? অনুরূপভাবে সে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি মাসআলা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, যার ফলে সে প্রতিটি সৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে ও প্রতিটি নীতি বিগর্হিত কাজ করানোর মদদ যোগায়। সে আল্লাহর কাছে দম্ভোক্তি করে বলেছিলঃ

لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ.

(আমি তোমার বিশুদ্ধ চিত্ত বিশিষ্ট নেককার বান্দাগণ ছাড়া বাকী সবাইকে পথভ্রষ্ট করেই ছাড়বো।) পথভ্রষ্টকারীকে যখন এতটুকু জ্ঞান দান করা হলো, তখন সর্ববিশেষজ্ঞ ডাক্তার সদৃশ হুযুর আলাইহিস সালামের সঠিক পথের দিশা প্রদানের জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, যাতে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির রোগ নির্ণয় ও আরোগ্য লাভের যোগ্যতার পরিমাপ করে চিকিৎসা করতে পারেন। অন্যথায়, সঠিক পথ নির্ধারণের কাজ পরিপূর্ণ হবে না। এবং মহাপ্রভু আল্লাহর সম্পর্কে এ আপত্তি উত্থাপন করা হবে যে, তিনি পথভ্রষ্টকারীকে শক্তিশালী করেছেন আর পথপ্রদর্শনকারীকে দুর্বল রেখেছেন। সেজন্য পথভ্রষ্টতা পরিপূর্ণতা লাভ করল, আর হেদায়েত অপরিপূর্ণ রয়ে গেল।

(৮) মহান প্রভু হুযুর আলাইহিস সালামকে 'নবী' বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ 'নবী' শব্দের অর্থ হলো খবরদাতা। যদি খবর বলতে শুধু দ্বীনের খবরই লক্ষ্যার্থ হয়, তাহলে বলতে হয় প্রত্যেক মৌলভীই নবী; আর যদি পার্থিব ঘটনাবলীর খবর ধরে নেওয়া হয়, তাহলে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র, রেডিও টি,ভি, ও তারবার্তা প্রেরণকারী সবাই 'নবী'রূপে পরিগণিত হবে। সুতরাং, বোঝা গেল যে, 'নবী' শব্দের মধ্যে অদৃশ্য বিষয়াদির খবরাখবরই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ নবী হলেন ফিরিশতাগণ ও আরশ সম্পর্কে খবরদাতা, যেখানে তারবার্তা ও সংবাদপত্র সমূহ কোন কাজেই আসবে না। সেখানে একমাত্র নবীর জ্ঞানই কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, 'ইলমে গায়ব' নবী শব্দের অন্তর্ভুক্ত বা অঙ্গীভূত।

এ পর্যন্ত হুযুর আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখন এও জানা দরকার যে, হুযুর আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আওলিয়া কিরামও ইলমে গায়ব লাভ করে থাকেন। তবে তাঁদের জ্ঞান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমেই অর্জিত হয় ও উহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞান সমুদ্রের এক ফোঁটার সমতুল্য।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'মিরকাতে' শাইখ আবু আবদুল্লাহ সিরাজী কর্তৃক সংকলিত 'কিতাবে আকায়িদ' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছেঃ-

اَلْعَبْدُ يَنْتَقِلُ فِى الْاَحْوَالِ حَتّٰى يَصِيْرَ اِلٰى نَعْتِ الرُّوْحَانِيَّةِ فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ.

(বান্দার আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত যখন 'রূহানীয়তের' গুণ প্রাপ্ত হয়, তখনই গায়ব সম্পর্কে অবগত হয়।)

'মেরকাতের আর এক জায়গায় উক্ত "কিতাবে আকায়িদ" গ্রন্থের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছেঃ-

يَطَّلِعُ الْعَبْدُ عَلٰى حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ وَيَتَجَلّٰى لَهُ الْغَيْبُ وَغَيْبُ الْغَيْبِ.

কামিল বান্দা যাবতীয় বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাঁর কাছে অদৃশ্যের বিষয়ও প্রকাশিত হয়ে যায়।)

মিরকাতের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় اَلصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَفَضْلِهَا. শীর্ষক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছেঃ-

اَلنُّفُوْسُ الزَّكِيَّةُ الْقُدْسِيَّةُ اِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ خَرَجَتْ وَاتَّصَلَتْ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَلَمْ يَبْقَ لَهُ حِجَابٌ فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ بِنَفْسِهَا اَوْ بِاِخْبَارِ الْمَلَكِ لَهَا.

(পূত পবিত্র আত্মা. সমূহ যখন সীমাবদ্ধ শারীরিক গণ্ডির বাহিরে আসে তখন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে সুউচ্চ স্তরে উপনীত হয় এবং তাঁদের সামনে কোনরূপ আবরণ অবশিষ্ট থাকে না। তখন সমস্ত বস্তুকে নিজের সামনে উপস্থিত ও স্থুল বস্তু সদৃশ দেখতে পায়। এ ধরনের অনুভূতি আপনা আপনিই কিংবা ফিরিশতার 'ইলহাম' দ্বারা অর্জিত হয়।

'শাহ আবদুল আযীয সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাফসীরে আযীযী'তে সূরা জ্বিনের তাফসীরে ফরমানঃ-

اطلاع برلوح محفوظ وديدن نقوش نيزاز بعضے اولياء بتواتر منقول است.

(লওহে মাহফুজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং উহার লিপিদর্শন করা সম্পর্কে কোন কোন ওলী থেকেও 'মুতওয়াতির' পর্যায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত 'কিতাবুল এ'লামে এবং আল্লামা শামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত 'সুল্লুল হুসামে উল্লেখ করেছেনঃ-

اَلْخَوَاصُ يَجُوْزُ اَنْ يَعْلَمَ الْغَيْبَ فِىْ قَضِيَّةٍ اَوْقَضَاءٍ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيْرٍ مِّنْهُمْ وَاشْتَهَرَ.

(এটা বৈধ যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (আওলিয়া কিরাম) কোন ঘটনা বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে গায়বী ইলম অর্জন করেন, যেমন অনেক আওলিয়া কিরাম থেকে এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে এবং তা' সাধারণ্যে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

শাহ ওলীউল্লাহ সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'আলতাফুল কুদস' নামক কিতাবে লিখেছেনঃ-

نفس كليه بجائے جسد عارف مى شود وذات عارف بجائے روح اوهمه عالم بعلم حضورى مى بيند،

('আরিফের' আত্মা একেবারে তাঁর দৈহিক আকৃতির রূপ পরিগ্রহ করে থাকে এবং তাঁর সত্ত্বা 'রূহের' সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তখন তিনি 'হুযুরী' জ্ঞানের সাহায্যে সমগ্র জগত দেখতে পান।)

আল্লামা যুরকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত 'শরহে মওয়াহেব গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ-

قَالَ فِىْ لَطَائِفِ الْمِنَنِ اِطِّلَاعُ الْعَبْدِ عَلٰى غَيْبٍ مِنْ غُيُوْبِ اللّٰهِ بِدَلِيْلِ خَبَرِ اتَّقُوْا مِنْ فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ لَا يُسْتَغْرَبُ وَهُوَ مَعْنٰى كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُبِهٖ فَمَنِ الْحَقِّ بَصَرُهٗ فَاطِّلَاعُهٗ عَلَى الْغَيْبِ لَايُسْتَغْرَبُ.

('লতায়েফুল মেনন' কিতাবে উল্লেখিত আছে যে, কোন কামিল বান্দা কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য বিষয় সমূহ থেকে কোন অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ আশ্চর্যের বিষয় নয়। এটা সেই হাদীছেই ব্যক্ত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, "মুমিনের জ্ঞানকে ভয় কর, কেননা, তিনি আল্লাহর নূরে দেখেন।" এটাই অপর এক হাদীছেরও অর্থ জ্ঞাপন করে, যেখানে বলা হয়েছে-আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই যদ্দ্বারা তিনি দেখেন। সুতরাং, তাঁর দেখা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অসাধারণ শক্তির বলেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই তাঁর গায়ব সম্পর্কে অবগত হওয়াটা বিস্ময়কর কোন ব্যাপার নয়।)

আল্লামা ইমাম শারানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত اليواقيت والجواهر নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেনঃ- لِلْمُجْتَهِدِيْنَ الْقَدَمُ فِىْ عُلُوْمِ الْغَيْبِ

(গায়বী ইলম সমূহের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণেরও দৃপ্ত পদচারণা রয়েছে।)

হুযুর গাউছে পাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ফরমানঃ-

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا – كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِىْ

(আমি আল্লাহ তা'আলার সমস্ত শহরগুলোকে এভাবে দেখেছি, যেমন কয়েকটি তৈলবীজ পরস্পর সন্নিবেশিত হয়ে আছে।)

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত 'যুবদাতুল আসরার' গ্রন্থে হযরত গাউছে পাকের (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য উক্তির বর্ণনা দিয়েছেনঃ-

قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَاابْطَالُ يَااَطْفَالُ هَلُمُّوْا وَخُذُوْا عَنْ هٰذَا الْبَحْرِ الَّذِىْ لَاسَاحِلَ لَهُ وَعِزَّةِ رَبِّىْ اِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْاَشْقِيَاءَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَاَنَّ بُؤْبُؤَةَ عَيْنِىْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَاَنَاغَائِصٌ فِىْ بِحَارِ عِلْمِ اللّٰهِ.

(গাউছে পাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ফরমানঃ হে সাহসী ভক্তগণ! হে আমার সন্তানগণ! এসো আমার এ অকুল সমুদ্র থেকে কিছু আহরণ কর। খোদার কসম, নেক্কার ও বদ্কার লোকদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয় আর আমার চোখের কোনা লওহে মাহফুজের দিকে নিবদ্ধ থাকে। আমি আল্লাহ তা'আলার অপার জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়ে থাকি।)

আল্লামা জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর রচিত نفحات الانس কিতাবে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী (কুঃ সিঃ) এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হলোঃ-

حضرت عزیزاں علیه الرحمة گفته اند كه زمین درنظر این طائفه چوں سفره ایست وما می گویم كه چوں ناخنے است هیچ چیز ازنظر ایشاں غائب نیست.

(হযরত আযীযান (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন যে, একদল আওলিয়া

কিরামের সামনে পৃথিবীটা দস্তরখানার মত আর আমি মনে করি, আঙ্গুলের নখের মত। কোন বস্তুই তাঁদের দৃষ্টি বহির্ভূত নয়।)

ইমাম শা'রানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) كبريت احمر গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ-

وَاَمَّا شَيْخُنَا السَّيِّدُ عَلِىُّ الْخَوَّاصُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا يَكْمُلُ الرَّجُلُ عِنْدَنَا حَتّٰى يَعْلَمَ حَرْكَاتِ مُرِيْدِهٖ فِىْ اِنْتِقَالِهٖ فِى الْاَصْلَابِ وَهُوَمِنْ يَوْمِ اَلَسْتُ اِلٰى اِسْتِقْرَارِهٖ فِى الْجَنَّةِ اَوْفِى النَّارِ.

(আমি আমার শাইখ সৈয়দ আলী হাওয়াছ (রাদিআল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি 'আমার মতে ওই পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কামিল হিসেবে গণ্য হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজ মূরীদের পিতার ঔরসে থাকাকালীন গতিবিধি সংক্রান্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া, এমনকি 'মীছাকের দিন' থেকে তার বেহেশত কিংবা দোযখ প্রবেশ করা অবধি তার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন।)

শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) فيوض الحرمين নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ-

ثُمَّ اَنَّهٗ يَنْجَذِبُ اِلٰى خَيْرِ الْحَقِّ فَيَصِيْرُ عَبْدَ اللّٰهِ فَيَتَجَلّٰى لَهٗ كُلُّ شَىْءٍ

অতঃপর সেই 'আরিফ' ব্যক্তি হক তা'আলার সুমহান দরবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আত্মবিলীন হয়ে যান, এরপর তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হন। তখন তাঁর কাছে প্রত্যেক কিছুই উন্মুক্ত ও প্রতিভাত হয়ে যায়।)

মিশকাত শরীফের প্রথম খণ্ডে 'কিতাবুত দাওয়াতের ذكر الله والتقرب শীর্ষক অধ্যায়ে বুখারী শরীফের সুত্রে হযরত আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا.

(আল্লাহ তা'আলা ফরমান, সেই প্রিয় বান্দাকে যখন আমি ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যদ্দারা তিনি শুনেন, চোখ হয়ে যাই, যদ্দারা তিনি দেখেন, হাত হয়ে যাই, যদ্দারা কোন কিছু ধরেন, এবং পা হয়ে যাই, যদ্দারা তিনি

চলাফেরা করেন।)

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) ও হযরত ইলয়াস (আলাইহিস সালাম) এখনও পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবিত আছেন। তাঁরা এখন উম্মতে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওলী হিসেবে গণ্য। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) যখন পৃথিবীতে (পুনরায়) তশরীফ আনবেন, তখন তিনিও এ উম্মতের ওলী হিসেবে আসবেন। তাঁদের (হযরত খিযির, ইলিয়াস ও ঈসা (আলাইহিস সালাম) ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তঁদের জ্ঞানও এখন হুযুর আলাইহিস সালামের উম্মতের ওলীগণেরই জ্ঞান হিসেবে পরিগণিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিবরণ)

এ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে ইলমে গায়বের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের সমস্ত আয়াতের বিবরণ,যেগুলো বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীছ সমূহের বিবরণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে উলামায়ে কিরাম ও ফকীহগণের উক্তি সমূহের বিবরণ এবং চতুর্থ পচ্ছেদে যুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক আপত্তি সমূহের বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি জরুরী বিষয়ের উপর আলোকপাত করা দরকারঃ-

(১) যে সমস্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ, বা ফকীহগণের উক্তিসমূহে হুযুর আল-ইহিস সালামের অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, সে সবের দ্বারা হয়তো সত্ত্বাগত জ্ঞান কিংবা সমস্ত জ্ঞাতবিষয় তথা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের সমপরিমাণ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, খোদা প্রদত্ত জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়নি। তা' যদি না হয়, তা'হলে এসব আয়াত ও হাদীছসমূহ এবং ইতিপূর্বে অদৃশ্য জ্ঞানের সমর্থনে উপস্থাপিত আয়াত ও হাদীছসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিরূপে সম্ভবপর হবে?

আল্লামা ইবন হাজর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'ফাতওয়ায়ে হাদিছীয়াতে' এ ধরনের দলীলসমূহের উত্তরে বলেছেনঃ-

مَعْنَاهَا لَايَعْلَمُ ذٰلِكَ اسْتِقْلَالاً وَعِلْمَ اِحَاطَةٍ اِلَّااللهُ تَعَالٰى اَمَّا
اَلْمُعْجِزَاتُ وَالْكَرَامَاتُ فَبِاِعْلَامِ اللهِ تَعَالٰى.

(ওসবের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্ত্বাগতভাবে ও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য বিষয়াদি কেউ জানতে পারে না। অবশ্য কারামত ও মু'জিযা হিসেবে প্রকাশিত অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ কর্তৃক জ্ঞাত করানোর ফলেই সম্ভবপর হয়ে থাকে।

বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণ বলেন যে, যে সব দলীলে ইলমে গায়বের স্বীকৃতি রয়েছে, আর যেসব দলীলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, সেইগুলো দ্বারা পার্থিব সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা সেসব কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীছ ও উলামায়ে উম্মতের উক্তি সমূহের বিপরীত, যেগুলো আমি ইলমে গায়বের সমর্থনে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞান, অনুরূপ লওহে মাহফুজের 'জ্ঞান জগতে সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। উপরন্তু হুযুর আলাইহিস সালামের ইরশাদ রয়েছেঃ সমস্ত জগত আমার নিকট এ হাতের মতই দৃশ্যমান। সুতরাং এ ধরনের সমন্বয় সাধনমূলক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে বাতিল।

(২) ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপস্থাপিত দলীলসমূহ যথা আল্লাহর কালাম 'আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না' বা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ইরশাদ 'আমি গায়ব জানি না' কিংবা ফকীহগণের উক্তি 'যে খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে ইলমে গায়বের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে, সে কাফির' ইত্যাদি যাবতীয় দলীল স্বয়ং তাদের মতেরও বিপরীত। কেননা তাঁরাও অদৃশ্য জ্ঞানের কিয়দাংশের সমর্থক। কেবল পূর্বাপর সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং, উল্লিখিত আয়াত ও উক্তিসমূহ থেকে তাঁরাও রেহাই পেতে পারেন না। কেননা, শুধু একটি বিষয়েরও ইলমে গায়ব স্বীকার করা হলে তাদের পেশকৃত দলীলের বিপরীত হয়ে যায়। তর্কশাস্ত্রের অকাট্য বিধি অনুযায়ী 'সামান্য নঞর্থক যুক্তি বাক্যের' সহিত বিশেষ সর্তক যুক্তি বাক্যের বিরোধিতার' সম্বন্ধ থাকে। দু'টি পরস্পর বিরোধী যুক্তি বাক্যের প্রথমটি সত্য হলে, দ্বিতীয়টি মিথ্যা হবেই, আবার দ্বিতীয়টি মিথ্যা হলে প্রথমটি অবশ্যই সত্য হবে। সুতরাং, এ ক্ষেত্রেও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান নেই' ও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর আংশিক অদৃশ্য জ্ঞান আছে' এ দুটো বিরুদ্ধ বিরোধিতামূলক' বাক্য একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না।

(৩) ভিন্ন মতাবলম্বীগণ আরও বলেন যে, ঐ সমস্ত দলীলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইলমে গায়বকে অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু আংশিক জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়নি। যদি তাই হয়, তাহলে কোন মতানৈক্যই রইলো না। কেননা, সৃষ্টি পূর্বাপর যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান علم ماكان وما يكون খোদার জ্ঞান সমুদ্রের এক ফোঁটা মাত্র। আমরাও তো খোদার জ্ঞানের মুকাবেলায় হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানকে আংশিক বলেই দাবী করি।

(৪) ভিন্ন মতাবলম্বীরা বলে যে, ইলমে গায়ব খোদারই একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। তাই খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য এ জ্ঞান স্বীকার করাটা কুফর। তাদের এ কথায় তারা নিজেরাও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। কেননা খোদার গুণাবলীর যে কোন একটিতে অন্য কাউকে শরীক করা যেমন কুফর, সব গুণাবলীতে শরীক করাও তথৈবচ। যেমন, যে ব্যক্তি সৃষ্টি জগতের যে কোন একটি জিনিসের স্রষ্টারূপে কোন বান্দাকে স্বীকার করে, সে যেমন বিধর্মী হয়ে যায়, তেমনি যে ব্যক্তি অন্য কাউকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করে, সেও কাফির হয়ে যায়। অতএব, তাঁরাও যেহেতু হুযুর আলাইহিস সালামের আংশিক ইলমে গায়বকে স্বীকার করেন, সেহেতু কুফরী থেকে তাঁদেরকেও রক্ষা নেই। তবে, হ্যাঁ, একথাই বলুন যে সত্ত্বাগত ও স্বয়ং সম্পূর্ণজ্ঞান খোদারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য, আর (খোদা) প্রদত্ত জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামের একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এতে কোন শিরক হলো না। এটাইতো আমরা বলি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াতের বিবরণ)

(১) قُلْ لَّا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ.

(আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদের নিকট বলছি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার আছে এবং এও বলছি না যে, আমি গায়ব জানি।)

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের চার ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথমতঃ এ আয়াতটি সত্ত্বাগত ইলমে গায়বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ ইলমে গায়বকে অস্বীকার করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্য এ রকম বলা হয়েছে। চতুর্থতঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হলো আমি দাবী করছি না যে, আমি গায়ব জানি। অর্থাৎ ইলমে গায়বের দাবীদার হওয়ার ব্যাপারটিই অস্বীকার করা হয়েছে; স্বয়ং ইলম গায়বের অস্বীকৃতি নয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন।

'তাফসীরে নিশাপুরী'তে এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে লিখা হয়েছেঃ-

يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ عَطْفًا عَلٰى لَا اَقُوْلُ لَكُمْ اَىْ قُلْ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ فَيَكُوْنُ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ الْغَيْبَ بِالْاِسْتِقْلَالِ لَا يَعْلَمُهٗ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থাৎ এ আয়াতে এও হতে পারে যে, لَا اَعْلَمُ বাক্যটি সংযোজক অব্যয় واو এর মাধ্যমে لَا اَقُوْلُ لَكُمْ বাক্যটির সহিত সম্পর্কযুক্ত। এতে অর্থ দাঁড়ায়ঃ হে মাহবুব, (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনি বলে দিন যে আমি গায়ব জানি না। তখন গায়ব বলতে সত্ত্বাগত ইলমে গায়বই বোঝা যাবে, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো আয়ত্ত্বে নেই।

'তাফসীরে বায়যাবী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছেঃ-

لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ مَالَمْ يُوْحَ اِلَىَّ اَوْلَمْ يَنْتَصِبْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ.

অর্থাৎ আমি গায়ব জানিনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়, বা এ ব্যাপারে কোন দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এও হতে পারে যে এ আয়াতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের অস্বীকৃতির কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। 'তাফসীরে কবীরে' এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ-

قَوْلُهٗ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ يَدُلُّ عَلٰى اِعْتِرَافِهٖ بِاَنَّهٗ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُوْمَاتِ.

('আমি গায়ব জানি না' কুরআনে উল্লেখিত এ ফরমান দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালামের এ কথারই স্বীকারোক্তির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম) সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নন।

অথবা, এরূপ উক্তি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে। 'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ-

وَاِنَّمَا نَفِي عَنْ نَفْسِهِ الشَّرِيْفَةِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاعْتِرَافًا لِلْعُبُوْدِيَةِ فَلَسْتُ اَقُوْلُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَدَّعِيْهِ.

অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম নিজের পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে এ সকল বিষয়ের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। এটা এ জন্য যে, এতে আল্লাহর নিকট তাঁর অনুনয়-বিনয় ও স্বীয় বন্দেগীর স্বীকারোক্তি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ওসব ব্যাপারে কিছু বলছি না, এবং কোন কিছুর দাবীও করছি না।

তাফসীরে 'আরাইসুল বয়ানে উল্লেখিত আছেঃ-

وَتَوَاضَعَ حِيْنَ اَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْاِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ اَنْ كَانَ اَشْرَفَ خَلْقِ اللّٰهِ مِنَ الْعَرْشِ اِلَى الثَّرٰى وَاَطْهَرَ مِنَ الْكَرُوْبِيِّيْنَ وَالرُّوْحَانِيِّيْنَ خُضُوْعًا لِجَبَرُوْتِهِ وَخُشُوْعًا لِمَلَكُوْتِهِ.

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) নিজের সত্ত্বাকে মানুষের নির্ধারিত স্তরে রেখে বিনয়ভাবে প্রকাশ করেছেন। অথচ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন 'আরশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ফিরিশতা এমনকি 'রূহানীয়ীন' নামক ফিরিশতাগণের চাইতেও অধিক পবিত্র। আল্লাহর মহান প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সামনে অনুনয়-বিনয় ও তাঁর মহান ইলমে গায়বের দাবী সম্পর্কেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন "আমি ইলমে গায়বের অধিকারী বলে দাবী করছি না।"

তাফসীরে 'নিশাপূরীতে' আছেঃ

اَىْ لَا اَدَّعِى الْقُدْرَةَ عَلٰى كُلِّ الْمَقْدُوْرَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُوْمَاتِ.

অর্থাৎ আমি দাবী করছিনা যে, আমি সবকিছু করার সামর্থ রাখি, কিংবা সমস্ত কিছু জানি।

'তাফসীরে কবীরে' একই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

اَىْ لَا اَدَّعِىْ كَوْنِىْ مَوْصُوْفًا بِعِلْمِ اللّٰهِ وَبِمَجْمُوْعِ هٰذَيْنِ الْكَلَامَيْنِ حَصَلَ اَنَّهُ لَا يَدَّعِى الْاِلٰهِيَّةَ.

অর্থাৎ আমি আল্লাহর জ্ঞানে গুণান্বিত হওয়ার দাবী করি না। আয়াতের দু'অংশকে একত্রিত করলে সারমর্ম হয়, হুযুর আলাইহিস সালাম খোদা হওয়ার দাবী করেন না।

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এ একই আয়াতের তাফসীরে আছেঃ-

عَطْفٌ عَلٰى عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا مُذَكَّرَةٌ لِلنَّفْىِ اَىْ وَلَا اَدَّعِىْ اَنِّىْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ مِنْ اَفْعَالِهِ تَعَالٰى عَلٰى اَنَّهَا عِنْدِىْ وَلٰكِنْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ فَمَنْ قَالَ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ اَخْطَاءَ فِيْمَا اَصَابَ.

অর্থাৎ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ বাক্যটির সাথেই عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ বাক্যটির সম্বন্ধ রয়েছে। এবং "لَا" অক্ষরটি এখানে অতিরিক্ত অস্বীকৃতির স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি আল্লাহর কার্যকালাপ সমূহের অদৃশ্য বিষয়াদি জানার এ বলে দাবী করি না যে, আল্লাহর ধনভাণ্ডার সমূহ তো আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি তা' বলি না।' সুতরাং, যে ব্যক্তি বলে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গায়ব জানতেন না, সে এ আয়াতের গুঢ় মর্মার্থ অনুধাবনে ভুল করেছে, যদিও সে বাহ্যিক দিক থেকে আয়াতের শাব্দিক অর্থ ঠিকই করেছে।

'তাফসীরে মাদারিকে' এ আয়াতের শব্দ বিন্যাস প্রসংগে বলা হয়েছেঃ-

وَمَحَلُّ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ لِاَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقُوْلِ كَاَنَّهُ قَالَ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ وَلَا هٰذَا الْقَوْلَ.

অর্থাৎ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ বাক্যটির শব্দ বিন্যাসগত অবস্থানের সহিত সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ বাক্যটি 'খবর' বিশেষ। কেননা, لَا اَقُوْلُ এর পরে যে কথাটি বলা হয়েছে, সে কথাটিরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ বাক্যটিও। অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যেন একথাই বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে না এটা বলছি, না ওটা, কোনটাই বলছি না।

তাফসীরে 'নিশাপূরী'তে আছেঃ-

اَیْ قُلْ لَاَعْلَمُ الْغَیْبَ فَیَکُوْنُ فِیْهِ دَلَالَةٌ عَلٰی اَنَّ الْغَیْبَ بِاسْتِقْلَالٍ لَا یَعْلَمُ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থাৎ বলুন, 'আমি গায়ব জানি না' এখানে 'গায়ব' বলতে সত্ত্বাগত ও স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে 'গায়ব' জানার কথাই বোঝানো হয়েছে, যেভাবে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্যঃ এ আয়াতের দু'জাগায় لَااَقُوْلُ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম لَااَقُوْلُ পর দু'টি বিষয়ের কথা উল্লেখিত আছে। (১) 'আমি বলছি না, যে আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে।' এবং (২) 'এও বলছি না যে আমি গায়ব জানি'; দ্বিতীয় لَااَقُوْلُ পর মাত্র একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। তা' হলোঃ 'আমি বলছি না যে, আমি ফিরিশতা।' এর তাৎপর্য হলো প্রথমোক্ত দু'টি বিষয়ে শুধু দাবীর অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হয়েছে, কিন্তু কথিত বিষয়টির স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে ২য় لَااَقُوْلُ দ্বারা দাবী ও দাবী করার বিষয় উভয়টি সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডারও আছে, এবং আমি গায়বও জানি, কিন্তু এগুলোর ধারক বলে দাবী করি না।

'মিশকাত শরীফে' فَضَائِلِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ শীর্ষক অধ্যায় উল্লেখিত আছেঃ

اُوْتِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنَ الْاَرْضِ

অর্থাৎঃ আমাকে পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ অর্পণ করা হয়েছে। ইলমে গায়ব সম্পর্কিত হাদীছসমূহ ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন "আমি আসলে ফিরিশতাও নই এবং ওটার দাবীও করছি না।" এ অন্তর্নিহিত তাৎপর্য না হলে لَااَقُوْلُ বাক্যটি একবার ব্যবহার করাই যথেষ্ট ছিল, দু'জায়গায় কেন বলা হলো? যদি আমার বর্ণিত ব্যাখ্যা সমূহের আলোকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করা না হয়, তাহলে এ আয়াতটি ভিন্নমতাবলম্বীদেরও মতের বিপরীত হবে। কেননা, ইলমে গায়বের কিয়দাংশ তারাও স্বীকার করেন। অথচ এ আয়াতে সম্পূর্ণরূপে বিষয়টির অস্বীকার করা হচ্ছে। অধিকন্তু, এখানে لَکُمْ দ্বারা কাফিরদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে হে কাফিরগণ, আমি তোমাদের কাছে বলছি না যে,

আমার কাছে ধনভাণ্ডারসমূহ আছে। তোমরা চোর। চোরের কাছে ধনভাণ্ডারের কথা বলা যায় না। যাতে তোমরা শয়তানের মত গোপন রহস্যাবলী চুরি করতে না পার। আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর শয়তানের যাওয়ার পথে এ জন্যই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন যে, সে চোর। তবে হ্যাঁ, এ কথা হযরত সিদ্দীক আকবর (রাদিআল্লাহু আনহু) এর কাছে বলা যাবে যে, 'আমাকে আল্লাহর ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ অর্পণ করা হয়েছে' আবার এখানে عِنْدِیْ শব্দের উল্লেখ করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে' যে, ধনভাণ্ডার আমার হাতে নেই আমার কর্তৃত্বাধীনে আছে। কেননা, ধনভাণ্ডার ভাণ্ডার রক্ষকের কাছে ও মালিকের মালিকানাধীনেই সুরক্ষিত থাকে। আ-মিতো ভাণ্ডার রক্ষক নই (আমি বরং মালিক)। দেখেননি, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইঙ্গিতে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, তাঁরই মুবারক অঙ্গুলিগুলো হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছে?

(২) وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ.

(যদি আমি গায়ব জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণ পুঞ্জীভূত করতাম।) তাফসীরকারকগণ এ আয়াতেরও তিনটি ভাবার্থ ব্যক্ত করেছেনঃ- (এক) হুযুর আলাইহিস সালামের এ উক্তিটা হচ্ছে বিনয় জ্ঞাপক। (দুই) এখানে আল্লাহর জানা যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনই মূল উদ্দেশ্য; (তিন) সত্ত্বাগত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ জ্ঞানের অস্বীকারই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

'নসীমুর রিয়ায' নামক গ্রন্থে এ আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছেঃ-

قَوْلُهٗ وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ فَاِنَّ الْمَنْفِیَّ عِلْمُهٗ مِنْ غَیْرِ وَاسِطَةٍ وَاَمَّا اِطِّلَاعُهٗ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰی فَاَمْرٌ مُتَحَقِّقٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰی فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ.

(অদৃশ্য বিষয়াদির সমর্থন এ আয়াতের وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ الخ পরিপন্থী নয়। কেননা, এখানে মাধ্যম বিহীন অর্জিত অদৃশ্য জ্ঞানকেই অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক জানানোর ফলশ্রুতিতে হুযুর আলাইহিস সালামের গায়ব জানার বিষয়টি যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত সত্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖ (আল্লাহ নিজের অদৃশ্য বিষয়াদি কারো নিকট প্রকাশ করেন না।) এখানে আল্লাহর জানা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হয়েছে।

'শরহে মওয়া কিফে, আল্লামা মীর সৈয়দ শরীফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেনঃ-

اَلْاِطِّلَاعُ عَلٰى جَمِيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ لَايَجِبُ لِلنَّبِىِّ وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ (الاية) وَجَمِيْعُ مُغَيَّبَاتٍ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.

(নবীর জন্য সমস্ত গায়ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ জন্যেই নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেনঃ وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ الاية আর, সমস্ত অদৃশ্য বিষয় হলো অসীম, সীমাবদ্ধতার গণ্ডী বহির্ভূত।

অথবা, এরূপ উক্তি অনুনয় বিনয় প্রকাশের নিমিত্তে করা হয়েছে।

'সাবী' হাশিয়ায়ে জালালাইনে এ আয়াত প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ-

اِنْ قُلْتَ اَنَّ هٰذَا يَشْكُلُ مَعَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ اَنَّهُ اُطْلِعَ عَلٰى جَمِيْعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَالْجَوَابُ اَنَّهُ قَالَ ذَالِكَ تَوَاضُعًا.

(যদি আপনারা বলেন, এ আয়াতটি পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যের (হুযুর আলাইহিস সালাকে সমস্ত দ্বীনী ও পার্থিব অদৃশ্য বিষয় সমূহ অবহিত করা হয়েছে) বিপরীত, তাহলে এর উত্তর হবেঃ এ উক্তিটা করা হয়েছে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে।)

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই 'জুমাল-হাশিয়ায়ে জালালাইন' থেকে উদ্ধৃতি করা হয়েছেঃ

فَاِنْ قُلْتَ قَدْ اَخْبَرَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ قَدْ جَاءَتْ اَحَادِيْثُ فِى الصَّحِيْحِ بِذٰلِكَ وَهُوَ مِنْ اَعْظَمِ مُعْجِزَاتِهِ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْتُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ قَالَهُ تَوَاضُعًا وَّاَدَبًا وَالْمَعْنٰى لَااَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّااَنْ يُطْلِعَنِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيُقَدِّرَهُ لِىْ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ قَالَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُطْلِعَهُ اللّٰهُ عَلَى الْغَيْبِ فَلَمَّا اَطْلَعَهُ اللّٰهُ اَخْبَرَ بِهٖ.

(আপনারা হয়তো প্রশ্ন করবেন, হুযুর আলাইহিস সালাম অনেক অদৃশ্য বিষয়ের খবর দিয়েছেন। এ সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীছও বর্ণিত আছে এবং ইলমে গায়ব হলো হুযুর আলাইহিস সালামের এক বড় মুজিযা। তাহলে এ সমস্ত কথা এবং উক্ত আয়াত لَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ এর মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে? এর

উত্তরে আমি বলবোঃ হতে পারে যে, এখানে বিনয় ও নম্রতার খাতিরে তিনি এরূপ বলেছেন এবং এর অর্থ হচ্ছে খোদার পক্ষ থেকে অবহিত হওয়া ছাড়া আমি গায়ব জানি না। এও হতে পারে যে, এ উক্তিটা ইলমে গায়বের অধিকারী হওয়ার আগেই করা হয়েছিল। যখন আল্লাহ তাআলা হুযুর আলাইহিস সালামকে ইলমে গায়ব দান করেন, তখনই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গায়বের খবর দিয়েছেন।

'আল্লামা সুলাইমান জুমাল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'ফুতুহাতে ইলাহিয়া' নামক হাশিয়ায়ে জালালাইনের' ২য় খণ্ডের ২৫৮ পৃষ্ঠায় অনুরূপ কথাই বলেছেনঃ

اَىْ قُلْ لَااَعْلَمُ الْغَيْبَ فَيَكُوْنُ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ الْغَيْبَ بِالْاِسْتِقْلَالِ لَايَعْلَمُ اِلَّااللّٰهُ.

অর্থাৎ বলে দিন, আমি গায়ব জানি না। অতএব, আয়াত থেকে ইহাই বোঝা যায় যে, সত্ত্বাগতভাবে গায়বী বিষয়াদি নাজানার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সত্ত্বাগতভাবে খোদা ব্যতীত আর কেউ গায়বী বিষয়াদি জানেনা।

তাফসীরে সা'বীতে এ আয়াতের তাফসীরে আছেঃ-

اَوْ اَنَّ عِلْمَهُ بِالْمُغَيَّبِ كَلَّا عِلْمٍ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ لَاقُدْرَةَ لَهُ عَلٰى تَغْيِيْرِ مَاقَدَّرَ اللّٰهُ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ لَوْكَانَ لِىْ عِلْمٌ حَقِيْقِىٌّ بِاَنْ اَقْدِرَ عَلٰى مَااُرِيْدُ وُقُوْعَهُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ.

(হুযুর আলাইহিস সালামের গায়ব জানাটা না জানার মতই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যা' কিছু নির্ধারণ করেছেন, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তখন এ আয়াতের অর্থ হবে যদি আমি ইলমে হাকীকীর অধিকারী হতাম, যাতে আমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে প্রভূত কল্যাণ পুঞ্জীভূত করতে পারতাম।)

এ তাৎপর্যটা খুবই যুক্তিযুক্ত। কেননা, এ আয়াতের অর্থ হলো যদি আমি গায়ব জানতাম, তাহলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম, এবং আমাকে কোন কষ্ট পেতে হতো না। শুধু কোন বিষয় সম্পর্কে জানাটা কল্যাণ প্রাপ্তি ও বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না কল্যাণ লাভের ও বিপদ থেকে বাঁচার বিশেষ ক্ষমতা না থাকে। আমার জানা আছে যে, বার্ধক্য আসবে, তখন আমাকে অনেক বার্ধক্যজনিত কষ্ট সহ্য করতে হবে। কিন্তু বার্ধক্য প্রতিরোধ করার কোন শক্তি আমার নেই। আমি আজ জানতে পারলাম যে, কয়েক দিন পর খাদ্য শস্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আমার কাছে আজ এত টাকা নেই যে, এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ

খাদ্যশস্য খরিদ করে রাখতে পারি। বোঝা গেল যে, কল্যাণ লাভ ও বিপদ থেকে বাঁচার ব্যাপারটি জ্ঞান ও ক্ষমতা উভয়টির উপর নির্ভরশীল। এ আয়াতে কুদরতের উল্লেখ নেই। তাই 'ইলমে গায়ব' বলতে ঐ 'ইলমকেই বোঝানো হয়েছে, যা কুদরত বা শক্তি সামর্থের সহিত সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সত্ত্বাগত জ্ঞান, যা খোদা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয়, যার সাথে কুদরতের সহাবস্থান অপরিহার্য। আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ না করলে এর অন্য কোন অর্থই বিশুদ্ধ হয় না। কেননা উক্ত সাপেক্ষ বাক্যটিতে (আয়াতে) পূর্বগ ও অনুগের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকছে না, যা না হলে 'কিয়াস' সঠিক হয় না।

দেওবন্দীরা এ আয়াতের অর্থ করেন এরূপঃ যদি আমি গায়ব জানতাম, তাহলে প্রভূত, কল্যাণ সঞ্চয় করতাম এবং আমার উপর কোন বালামুসীবত আসতো না। কিন্তু যেহেতু আমার কাছে কল্যাণও নেই এবং মুসীবত থেকে বাঁচাও নেই, সেহেতু আমি গায়ব জানি না।

আমরাও আয়াতের এ ধরনের অর্থ করতে পারি, ভেবে দেখতে পারেন। "যদি আমার কাছে মঙ্গলজনক কিছু থাকে এবং আমি মুসীবত থেকে রক্ষা পাই, তাহলে জেনে নাও যে, আমার ইলমে গায়বও আছে।" আমার কাছে মঙ্গলজনক অনেক কিছুতো আছেই। যেমন কুরআনই প্রমাণ করে مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا। (যাকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।) অন্যত্র বলা হয়েছে اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (আমি আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছি।) আর এক জায়গায় আছে يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন) এ ছাড়া আমি বিপদাপদ থেকে তো নিরাপদ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ফরমাচ্ছেনঃ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (আল্লাহ আপনাকে লোকদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।) সুতরাং, আমার ইলমে গায়বও আছে। এ আয়াত তো ইলমে গায়বের প্রমাণবহ, এখানে ইলমে গায়বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে না।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছেঃ-

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ اِلٰى اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتَ السَّاعَةِ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ وَهُوَ لَايُنَافِى الْحَصْرُ فِى الْاٰيَةِ كَمَا لَايَخْفٰى.

(কোন কোন মাশায়িখ এ কথাও বলেছেন যে, নবী আলাইহিস সালামের আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের বদৌলতে কিয়ামতের সুনির্দিষ্ট সময় জানাছিল। তাঁদের এ উক্তি এ আয়াতের حصر বা সীমাবদ্ধতার (ইলমে গায়ব একমাত্র আল্লাহরই সহিত সীমাবদ্ধ।) পরিপন্থী নয়, ইহা সুস্পষ্ট।

(৩) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ

(তাঁরই কাছে রয়েছে গায়বের চাবিসমূহ। একমাত্র তিনিই ঐগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত।)

তাফসীরকারকগণ বলেছেন 'মফাতিহুল গায়ব' مَفَاتِحُ الْغَيْبِ দ্বারা হয়তো 'গায়বের ভাণ্ডার' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খোদার জানা সবকিছুর জ্ঞান। কিংবা আয়াতে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান বা সম্মুখে হাজির করার তথা বস্তু সমূহের সৃষ্টির সামর্থ থাকার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কেননা, চাবির কাজ হলো তালা খুলে বাহিরের জিনিস ভিতরে ও ভিতরের জিনিস বাহিরে আনা-নেওয়া। অনুরূপ অদৃশ্যকে দৃশ্যমান ও দৃশ্যমানকে অদৃশ্য করার অর্থাৎ সৃষ্টি ও মৃত্যু প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে।

তাফসীরে কবীরে এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে লিখা হয়েছেঃ

فَكَذٰلِكَ هٰهُنَا لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِجَمِيْعِ الْمَعْلُوْمَاتِ عَبَّرَ هٰذَا الْمَعْنٰى بِالْعِبَارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَعَلَى التَّقْدِيْرِ الثَّانِىْ اَلْمُرَادُ مِنْهُ الْقُدْرَةُ عَلٰى كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ.

অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই তাঁর জ্ঞাত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান রাখেন, তাই সে কথাটিই তিনি উক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আয়াতের দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ হলো সম্ভবপর সবকিছু করার সামর্থ থাকা। এই কথাটুকু ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে- তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্য বিষয়াদির চাবিসমূহ।।"

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষণে লিখা হয়েছেঃ

وَقَلَمُ تَصْوِيْرِهَا الَّذِىْ هُوَ مِفْتَاحٌ يُفْتَحُ بِهٖ بَابُ عِلْمِ تَكْوِيْنِهَا عَلٰى صُوْرَتِهَا وَكَوْنِهَا هُوَ الْمَلَكُوْتُ فَبِقَلَمِ مَلَكُوْتِ كُلِّ شَىْءٍ يَكُوْنُ كُلُّ شَىْءٍ

وَقَلَمُ الْمَلَكُوْتِ بِيَدِاللّٰهِ لِاَنَّ الْغَيْبَ هُوَ عِلْمُ التَّكْوِيْنِ.

ঐসমস্ত বস্তুর নক্‌শা তৈরী করার কলম, যেটি এমন একটি চাবি, যদ্দারা সেই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় (ঐ সমস্ত বস্তুর যথোপযুক্ত আকৃতিতে)। উহাই হচ্ছে 'মালাকুত'। সুতরাং, প্রত্যেক বস্তুই তার মালাকুতের কলম দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করে। আর মালাকুতের কলম হচ্ছে আল্লাহর হাতে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে 'গায়ব' বলতে কোন কিছু সৃষ্টি করার জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে।

'তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِجَمِيْعِ الْمَعْلُوْمَاتِ عَبَّرَ هٰذَا الْمَعْنٰى بِهٰذَا الْعِبَارَةِ وَعَلَى التَّفْسِيْرِ الثَّانِىْ يَكُوْنُ الْمَعْنٰى وَعِنْدَهٗ خَزَائِنُ الْغَيْبِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ عَلٰى كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ.

(আল্লাহ তা'আলা যে সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, এ আয়াতের দ্বারা সেই কথাটাই তিনি বর্ণনা করেছেন। ২য় তাফসীর মতে এর অর্থ হবে আল্লাহর কাছে গায়বের ভাণ্ডার রয়েছে। এর মর্মার্থ হলো সম্ভবপর প্রত্যেক কিছুর উপর তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

অথবা, এ অর্থও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জ্ঞান ছাড়া কেউ গায়বের চাবিসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে না।

তাফসীরে 'আরায়েসুল বয়ানে' আছেঃ

قَالَ الْحَرِيْرِىُّ لَايَعْلَمُهَا اِلَّاهُوَ وَمَنْ يُّطْلِعُهٗ عَلَيْهَا مِنْ خَلِيْلٍ وَحَبِيْبٍ اَىْ لَا يَعْلَمُهَا الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ قَبْلَ اِظْهَارِهٖ تَعَالٰى ذٰلِكَ لَهُمْ.

(আল্লামা হারীরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, ঐ সমস্ত চাবি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এবং তার প্রিয় বান্দাগণ (যাঁদেরকে তিনি অবহিত করেছেন) ছাড়া আর কেউ জানে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহ কর্তৃক জ্ঞাত করার আগে সেগুলো সম্পর্কে জানতেন না।

'তাফসীরে 'ইনায়াতুল কাযী'তে এ আয়াত সম্পর্কে উল্লেখিত আছেঃ

وَجْهُ اخْتِصَاصِهَا بِهٖ تَعَالٰى اَنَّهٗ لَايَعْلَمُهَا كَمَاهِىَ اِبْتِدَاءً اِلَّا هُوَ.

(গায়বের চাবিসমূহ খোদার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হওয়ার কারণ হলো এগুলো আদিতে যেরূপে ছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানে না।)

এ আয়াতের ভাবার্থ আমি যা' বর্ণনা করেছি'তা' যদি গ্রহণ করা না হয়, তা'হলে এ আয়াতটি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদেরও মতের বিপরীত হবে। কেননা, তারাও আংশিকরূপে গায়ব এর জ্ঞান স্বীকার করেন, অথচ এ আয়াত ইলমে গায়বকে পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

সূক্ষ্ম রহস্যঃ জনৈক ভদ্রলোক আমাকে বলেছেন যে, আ'লা হযরত (কুঃ সিঃ) এখানে একটা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। সেটা হলো এ আয়াতে আছে عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ অন্যত্র আছে لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ মাফাতিহ ও মাকালীদ' (مفاتح ও مقاليد) শব্দদ্বয়ের অর্থ হচ্ছে চাবিসমূহ। যদি مفاتح শব্দটির প্রথম ও শেষ অক্ষর। (م ও ح) এবং مقاليد শব্দটির প্রথম ও শেষ অক্ষর م ও د একত্রিত করা হয় তখন (محمد) শব্দ গঠিত হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রসুলুল্লাহ আলাইহিস সালামের সত্ত্বা হলো নিখিল বিশ্ব বিকাশের চাবিকাঠি। لَايَعْلَمُهَا اِلَّاهُوَ (ঐগুলো সম্পর্কে তিনিই জানেন) আয়াতের এ অংশটুকুর দ্বারা একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রকৃত পক্ষে যেরূপ বিরাজমান, সেরূপে কেউ তাঁকে জানে না। 'হাকীকাতে মুহাম্মদীয়া, কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। مفاتح শব্দটি বহুবচন আকারে এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, তাঁর প্রত্যেকটি প্রেমময় আচরণ রহ্‌মতে ইলাহীর চাবি বিশেষ, তাঁর নূর হচ্ছে নিখিল জগতের চাবিস্বরূপ। হাদীছে উক্ত হয়েছেঃ كُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُّوْرِىْ (সমস্ত মাখলুক আমার নূর থেকে সৃষ্ট) কিয়ামতের দিন তাঁর সিজ্‌দা শাফায়াতের চাবি, বেহেশতের মাঝে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পবিত্র নাম প্রত্যেক নেয়ামতের চাবি এবং বেহেশতে তাঁর পদার্পণ সকলের জন্য বেহেশত উন্মুক্ত হওয়ার চাবি। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আমার রচিত গ্রন্থ 'শানে হাবিবুর রাহমান' দেখুন।

আরও একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্যঃ এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, গায়বের

চাবিসমূহ রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কাছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ চাবি দিয়ে কারো জন্য গায়বের দরজা খোলা হয়েছে কিনা? বা কাউকে কোন চাবি দেয়া হয়েছে কিনা? এর জওয়াব কুরআন হাদীছের মধ্যেই রয়েছে, পর্যালোচনা করুন। কুরআন ইরশাদ করেছে إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (আমি (আল্লাহ) আপনার জন্য সুস্পষ্টভাবে খুলে দিয়েছি) কি খুলে দিয়েছেন? এ সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ আমার রচিত কিতাব "শানে হাবিবুর রাহমান বি আয়াতিল কুরআন" পর্যালোচনা করে দেখুন।

তালা-চাবিতে বস্তুই সযত্নে রাখা হয়, যা' খুলে বের করতে হয়; আর যা' খুলে বের করতে হয়না, তা' যমীনে পুঁতে ফেলা হয়। এতে বোঝা গেল যে, গায়ব' তাঁকে দেয়ার ছিল, তাই চাবিতে রাখা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে আছে اُوْتِيْتُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْاَرْضِ (আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে।) এ থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামকে চাবিও দেয়া হয়েছে, আর তাঁর জন্য দরজাও উন্মুক্ত করা হয়েছে।

(৪) قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ .

(আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান সমূহ ও যমীনে যারা আছেন, তারা গায়ব জানেন না।)

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের দুটি ভাবার্থ লিখেছেন-সত্ত্বাগতভাবে 'গায়ব কেউ জানে না বা সমস্ত গায়বও কেউ জানে না।

তাফসীরে 'আলমুয়াজে জলীলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ

مَعْنَاهُ لَايَعْلَمُ الْغَيْبَ بِلَادَلِيْلِ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ بِلَا تَعْلِيْمٍ اَوْ جَمِيْعَ الْغَيْبِ .

(এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিনা দলীলে বা জ্ঞাত করানো ছাড়া, সম্পূর্ণ গায়ব খোদা ভিন্ন অন্য কেউ জানে না।)

'তাফসীরে মাদারিকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

وَالْغَيْبُ مَالَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَّلَا اَطْلَعَ عَلَيْهِ مَخْلُوْقٌ .

(গায়ব হলো উহাই, যা'র কোন প্রমাণ উপস্থাপিত নেই এবং সৃষ্টিকূলের কাউকে যা' জ্ঞাত করা হয়নি।)

'তাফসীরে মাদারিকের' এ ব্যাখ্যা থেকে বোঝা গেল যে, উক্ত মুফাসসিরের পরিভাষায় প্রদত্ত জ্ঞানকে 'ইলমে গায়ব' বলা হয় না; কেবল সত্ত্বাগত জ্ঞানকে ইলমে গায়ব বলা হয়। এখন আর কোন সমস্যাই রইলো না। কেননা, যে সব আয়াতে ইলম গায়ব এর অস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো সত্ত্বাগতভাবে জানা গায়ব সম্পর্কে প্রযোজ্য। এ আয়াতের কিছু আগে আছেঃ

مَامِنْ غَائِبٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ اِلَّافِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ .

(ভূ-মণ্ডল ও নভঃমণ্ডলে যা' কিছু অদৃশ্য আছে, তা সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।) এ আয়াত থেকে বোঝা গেল প্রত্যেকটি 'গায়ব' লওহে মাহফুজ ও কুরআনের মধ্যে মওজুদ আছে।

'ফাতওয়ায়ে ইমাম নববীতে' উল্লেখিত আছেঃ

مَامَعْنٰى قَوْلِ اللّٰهِ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَاشْبَاهُ ذٰلِكَ مَعَ اَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَافِىْ غَدٍ وَالْجَوَابُ مَعْنَاهُ لَايَعْلَمُ ذٰلِكَ اِسْتِقْلَالًا وَاَمَّا الْمُعْجِزَاتُ وَالْكَرَامَاتُ فَحَصَلَتْ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ لَااِسْتِقْلَالًا .

(কুরআনের আয়াত لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ ও এ ধরনের অন্যান্য আয়াতের কি অর্থ হতে পারে? হুযুর আলাইহিস সালামতো ভবিষ্যতের খবর জানেন। এর উত্তর হলো গায়বকে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে (সত্ত্বাগতভাবে) কেউ জানে না। তাহলে মু'জিযা ও কারামতের কি তাৎপর্য হবে? এর উত্তর হবে, এতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবহিত করার ফলেই এ জ্ঞান অর্জিত, সত্ত্বাগত বা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে নয়।)

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহঃ) 'ফাতওয়ায়ে হাদীছিয়া'তে বলেনঃ-

مَاذَكَرْنَاهُ فِى الْاٰيَاتِ صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِىُّ فِىْ فَتَاوَاهُ فَقَالَ لَايَعْلَمُ ذٰلِكَ اِسْتِقْلَالًا وَعِلْمُ اِحَاطَةٍ بِكُلِّ الْمَعْلُوْمَاتِ .

(আমি এ আয়াত সম্পর্কে যা কিছু বলেছি, ইমাম নববী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর ফাত্ওয়ায় এটা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, গায়ব সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে ও আল্লাহর জ্ঞাত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত নয়।)

'শরহে শিফা ই-খফফাজীতে' আছেঃ

هذا لاينا في الايات الدالة على انه لايعلم الغيب الا الله فان النفي علما من غير واسطة اما اطلاعه عليه باعلام الله فامر متحقق.

(এ বক্তব্যটি ওই সমস্ত আয়াতের পরিপন্থী নয়, যে গুলো থেকে বোঝা যায় যে, খোদা ছাড়া আর কেউ গায়ব জানেনা। কেন না, সেই আয়াত সমূহে মাধ্যমবিহীন জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, কিন্তু খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের ফলশ্রুতিস্বরূপ জানার বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত।)

যদি উক্ত আয়তের এ ভাবার্থ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এ আয়াতটি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের মতের বিপরীত হবে। কেননা, তারাও হুযুরের আংশিক ইলমে গায়ব স্বীকার করেন, অথচ এ আয়াতে সম্পূর্ণরূপে তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু তারা শয়তান ও মৃত্যুর ফিরিশতাকেও ইলমে গায়বের অধিকারী বলে স্বীকার করেন। ('বারাহীনে কাতিয়া' গ্রন্থে ৫০ পৃষ্ঠা দেখুন।) তারা এ আয়াতের কি মর্মার্থ গ্রহণ করবেন? কুরআন শরীফে আছে. ان الحكم الا لله (আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম করার অধিকার নেই) অন্যত্র আছে له مافى السموات ومافى الارض (আসমান যমীনে যা' কিছু আছে সব কিছু আল্লাহরই) আর এক জায়গায় ইরশাদ করা হয়েছে। وكفى بالله شهيدا (আল্লাহ তা'আলাই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করা হয়েছে وكفى بالله وكيلا (আল্লাহ তা'আলাই ওকীল হিসেবে যথেষ্ট।) আরো এক জায়াগায় আছে وكفى بالله حسيبا (আল্লাহ তা'আলাই হিসাব গ্রহণকারী রূপে যথেষ্ট।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, রাজত্ব, মালিকানা, সাক্ষ্য, কার্যনির্বাহের ক্ষমতা, হিসাব গ্রহণ ইত্যাদি আল্লাহরই জন্য 'খাস' (বৈশিষ্ট্য সূচক গুণাবলী।) কিন্তু এখন ইসলামী রাজ্যের বাদশাহকে শাসক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রীর মালিক, বিধর্মীদেরকে ওকীল ও হিসাব নিকাশকারী এবং সাধারণ লোকদেরকে মামলা মুকাদ্দমায় সাক্ষীরূপে সবাই স্বীকার করেন। এটা কেমনে হয়? এটা শুধু এজন্য যে, উল্লিখিত আয়াত সমূহে রাজত্ব, মালিকানা ইত্যাদি দ্বারা যথার্থ ও সত্ত্বাগত গুণের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আর, এসব গুণাবলী অন্যান্যদের বেলায় খোদা প্রদত্ত হিসেবে স্বীকৃতি হয়েছে। অনুরূপভাবে গায়ব সম্পর্কিত আয়াতের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ অপরিহার্য। অর্থাৎ আয়াতে যথার্থ ও সত্ত্বাগত জ্ঞানের অস্বীকৃতি এবং খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা

হয়েছে।

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ. (৫)

(আমি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কবিতা আবৃত্তি শিক্ষা দিইনি, এবং তা' তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাল্লাম) সম্মান-প্রতিপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে অশোভনীয়ও বটে। এটা উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন বৈ আর কিছু নয়।)

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের তিনটি মর্মার্থ ব্যক্ত করেছেন। প্রথমতঃ علم 'ইলম' শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে; যেমন-জানা, প্রতিভা চর্চা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এখানে এ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে কবিতা আবৃত্তির প্রতিভা দিইনি। একথা নয় যে, তঁকে ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ কবিতাবলী যাচাই করার প্রতিভা দিইনি। দ্বিতীয়তঃ, কবিতার দু'ধরনের অর্থ আছে। এক) ছন্দোবদ্ধ শব্দের মিল সম্বলিত কথা (গযল)। দুই) মিথ্যা মনগড়া ও কাল্পনিক কথাবার্তা। এ আয়াতের এ 'শের' শব্দটি দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাঁকে মিথ্যা, মনগড়া ও কাল্পনিক কথা বার্তা শিক্ষা দিইনি। তিনি যা কিছু বলেন, তা সত্য। তৃতীয়তঃ 'কবিতা' বলতে এখানে সংক্ষিপ্ত ও রহস্যাবৃত কথাবার্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাঁকে প্রত্যেক কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান দান করেছি, ধাঁধাঁপূর্ণ; সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য

কথাবার্তা শিখাইনি। কুরআনই ইরশাদ করেন وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (এ কুরআন বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত।) علم শব্দটি এখানে প্রতিভা অর্থে ব্যবহৃত। কুরআন করীম ইরশাদ করছে وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ (আমি তাঁকে তোমাদের জন্য পরিধেয় সরঞ্জাম প্রস্তুতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছি।)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ দায়লমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হযরত জাবির (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ عَلِّمُوْا بَنِيْكُمُ الرَّمْىَ. (তোমরা নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে তীরান্দাযী শিক্ষা দাও।)

'তাফসীরে রূহুল বায়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ كَانَ لَايُحْسِنُهُ وَلٰكِنْ كَانَ يُمَيِّزُ جَيِّدَ الشِّعْرِ وَرَدِيْئَهُ.

সর্বাধিক সঠিক কথা হলো, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সুন্দরভাবে কবিতা আবৃত্তি করতেন না, কিন্তু ভাল-মন্দ কবিতার পার্থক্য নির্ণয় করে ফেলতেন।)

তাফসীরে রূহুল বয়ানে সে একই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখিত আছেঃ

إِنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ إِنْشَاءُ الشِّعْرِ. তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জন্য কবিতা রচনা নিষিদ্ধ ছিল। এখানে شعر শে'র শব্দের অর্থ হলো মিথ্যা বর্ণনা।) মক্কার কাফিরগণ বলতো যে, কুরআন শরীফ হলো কবিতা, আর হুযুর আলাইহিস সালাম হলেন কবি بَلْ هُوَ شَاعِرٌ (তিনি বরঞ্চ একজন কবি) এ'শে'র' শব্দ বলতে তারা মিথ্যা বর্ণনাকে বোঝাতো। তাই এদের এ অবান্তর উক্তি খণ্ডন করার জন্য এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. (এটা উপদেশ ও উজ্জ্বল কুরআন বৈ অন্য কিছু নয়।) উক্ত আয়াতে যদি شعر বলতে ছন্দোবদ্ধ পদ্যাকারে রচিত কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এ আয়াতের শেষোক্ত অংশের সাথে ওই একই আয়াতের প্রথমোক্ত অংশের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

'তাফসীরে মাদারিকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

اَىْ مَاعَلَّمْنَا النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ الشِّعْرِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ بِتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ الشِّعْرَ عَلٰى مَعْنٰى اَنَّ الْقُرْاٰنَ لَيْسَ بِشِعْرٍ.

অর্থাৎ আমি নবী আলাইহিস সালামকে কবিতা আবৃত্তি শিক্ষা দিইনি, বা তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতে গিয়ে কবিতা শিখায়নি। আসল কথা হলো 'কুরআন কল্পনা প্রসূত কবিতা নয়।

'তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ

وَلَمَّا نَفٰى اَنْ يَّكُوْنَ الْقُرْاٰنُ مِنْ جِنْسِ الشِّعْرِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ.

যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের একথা 'কুরআন কাব্য জাতীয় উদ্ভট চিন্তাধারা' খণ্ডন করে দিল, তখন ইরশাদ করলেন-এটা উপদেশ ও উজ্জল কুরআন বৈ অন্য কিছু নয়।)

তাফসীরে খাযেনে আরও উল্লেখিত আছেঃ-

قِيْلَ اِنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالُوْا اِنَّ مُحَمَّدًا شَاعِرٌ وَّمَايَقُوْلُهُ شِعْرٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَكْذِيْبًا لَّهُمْ وَمَاعَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ.

বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ বংশের কাফিরগণ বলে ছিল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম হলেন একজন কবি এবং তিনি যা কিছু বলেন (কুরআন) তা' হলো কবিতা। তাদের এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে - وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ الخ (আমি তাঁকে 'শে'র' শিখাইনি।)

বিঃ দ্রঃ- উল্লেখ্য যে এখানে বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণ প্রশ্ন করে থাকেন যে, বর্ণিত আছে যে, নবী আলাইহিস সালামের পবিত্র যবান কবিতা পাঠের উপযোগী ছিল না। অর্থাৎ তিনি কোন কবিতা পাঠ করতেই শব্দ বিন্যাস, ছন্দ ইত্যাদির বিকৃতি ঘটতো। যেমন, তাফসীরে খাযেনেই বর্ণিত আছেঃ

اَىْ مَايَسْهُلُ لَهُ ذٰلِكَ وَمَا يَصْلَحُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَوْ اَرَادَ نَظْمَ شِعْرٍ لَمْ يَتَاَتَّ لِذٰلِكَ.

অর্থাৎ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জন্য কবিতা আবৃত্তি তত সহজ ছিল না, এবং যতাযথভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন না। যদি কখনও পদ্যাকারে কবিতা আবৃত্তি করার ইচ্ছা করতেন, এটা তাঁর জন্য সম্ভবপর হতো না।

তাফসীরে মাদারিকে আছেঃ-

اَىْ جَعَلْنَاهُ بِحَيْثُ لَوْ اَرَادَ قِرْءَةَ شِعْرٍ لَمْ يَتَسَهَّلْ.

অর্থাৎ আমি তাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছি যে তিনি কবিতা পাঠের ইচ্ছা করলেও যেন তাঁর জন্য তা সহজ না হয়।

'তাফসীরে কবীরে' আছেঃ-

وَمَايَتَسَهَّلُ لَهُ حَتّٰى اَنَّهُ اِنْ تَمَثَّلَ لَهُ بَيْتَ شِعْرٍ سُمِعَ مِنْهُ مُزَاحَفًا.

(তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জন্য কবিতা সহজ ছিল না এমনকি তিনি কোন কবিতার চরণ আবৃত্তি করতে চাইলে, তা' ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও বেসুরে শোনা যেত।)

উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর হলো এ যে, কাব্য জ্ঞান ও কাব্য আবৃত্তির জ্ঞান এক নয়। অনেক বড় বড় কবিও সূর দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন না, আবার

অনেক প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠক ও কাওয়ালও কাব্য জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেও কাব্য আবৃত্তির পূর্ণ সামর্থ রাখেন। আপনি রুটি তৈরী করতে জানেন না, কিন্তু রুটি ভাল কি মন্দ, পুরু কি পাতলা ইত্যাদি বিষয় ভাল করেই বুঝতে পারেন।

আপনাদের উক্ত ভাষ্য থেকে একটুকুই বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামের কবিতা পাঠের প্রতিভা বা কোন রূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু একথা নয় যে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কবিতার গুণাগুণ বিচারের জ্ঞান ছিল না। আমরাও তো তাই বলছি-কতেক কবিতা তাঁর পছন্দ এবং কতেক অপছন্দ ছিল।

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' সেই একই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

كَانَ اَحَبَّ الْحَدِيْثِ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشِّعْرُ وَاَيْضًا كَانَ اَبْغَضَ الْحَدِيْثِ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشِّعْرُ.

হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে কবিতা খুবই পছন্দনীয় ছিল তবে কোন কোনটি আবার অতীব না পছন্দও ছিল।)

আবার অনেক হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কোন কোন কবির কবিতামালা পাঠ করতেন এবং এগুলোর ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। সেরূপ কবিতার একটি পংক্তি হলো اَلَاكُلُّ شَيْئٍ مَاخَلَا اللّٰهُ بَاطِلٌ. (সাবধান! আল্লাহ ছাড়া যা' কিছু আছে, সবই বাতিল।) যদি তাঁর কবিতা সম্পর্কে ভালমন্দ জ্ঞান না থাকতো, তাহলে তার প্রশংসাই বা করতেন কিরূপে? কুরআনে উল্লেখিত কবিতা বলতে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট অর্থপূর্ণ উক্তির বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

قَالَ الشَّيْخُ الْاَكْبَرُ اِعْلَمْ اَنَّ الشِّعْرَ مَحَلٌّ لِلْاِجْمَالِ وَاللُّغْزِ وَالتَّوْرِيَةِ اَىْ مَارَمَزْنَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْئًا وَّلَا اَلْغَزْنَا وَلَا خَطَبْنَاهُ بِشَيْئٍ وَنَحْنُ نُرِيْدُ شَيْئًا وَلَاجَعَلْنَا لَهُ الْخِطَابَ حَيْثُ لَمْ يَفْهَمْ.

(শাইক আকবর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন, একথা জানতে হবে যে, কবিতা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট, ধাঁধাঁ ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পূর্ণ উক্তির সহিত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব উক্ত আয়াতের অর্থ হবে, আমি প্রিয় নবীর কাছে কোন কিছু ইশারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিনি, এবং এ রকমও করিনি যে একটি কথার ইচ্ছা করে অপর একটি বিষয় প্রকাশ করেছি। তাঁর সাথে এমন কোন সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট কথাও বলিনি, যা' তাঁর বোধগম্য হয় না।)

(৬) مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.

(ওই সকল নবীগণের কারো অবস্থা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করেছি, এবং অনেকের অবস্থা ব্যক্ত করেনি।)

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের কয়েকটি প্রায়োগিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথমতঃ এখানে সকল নবীগণের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়নি বরং কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার বিষয়টির অস্বীকৃতিই নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন কোন নবীর ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আয়াতে সুবিস্তৃত বর্ণনার অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে, তবে সবার সামগ্রিক, সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ প্রকাশ্য ওহীতে সবার কথা উল্লেখ করা হয়নি, অপ্রকাশ্য ওহীতে সবার কথা বলা হয়েছে।

'তাফসীরে সাবী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যাউল্লেখ করা হয়েছেঃ-

اِنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى عَلِمَ جَمِيْعَ الْاَنْبِيَاءِ تَفْصِيْلًا كَيْفَ لَاوَهُمْ مَخْلُوْقُوْنَ مِنْهُ وَخَلْفَهُمْ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلٰكِنَّهُ الْعِلْمُ الْمَكْنُوْنُ وَاِنَّمَا تَرَكَ بَيَانَ قَصَصِهِمْ لِاُمَّتِهٖ رَحْمَةً بِهِمْ فَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ اِلَّا بِمَا كَانُوْا يُطِيْقُوْنَ.

(হুযুর আলাইহিস সালাম সকল নবীগণের বিস্তারিত তথ্য না জেনে পৃথিবী থেকে তশরীফ নিয়ে যাননি। কেননা, নবীগণ সবাই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নূর থেকেই সৃষ্ট হয়েছেন এবং মিরাজের পবিত্র রাতে 'বায়তুল মুকাদ্দিসে' সবাই তাঁর মুক্তাদী হয়েছিলেন। কিন্তু এটা হলো গোপনীয় বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান। আর ঐ সকল নবীগণের বিস্তারিত বিবরণ উম্মতের প্রতি মেহেরবাণীস্বরূপ বাদ দিয়েছেন। তাদেরকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেননি।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'মিরকাতের' প্রথম খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায়

উল্লেখিত আছেঃ-

هٰذَا لَايُنَافِى قَوْلَهُ تَعَالَى مِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ لِاَنَّ الْمَنْفِىَّ هُوَ التَّفْصِيْلُ وَالثَّابِتُ هُوَالْاِجْمَالُ اَوِالنَّفْىُ مُقَيَّدٌ بِالْوَحِى الْجَلِىِّ وَالثُّبُوْتُ مُتَحَقِّقٌ بِالْوَحْىِ الْخَفِىِّ .

(এ বক্তব্য আয়াত- مِنْ هُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ এর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা, আয়াতে অস্বীকৃতি বিষয়টি হলো সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যক্ত তথ্যসমূহ অথবা অস্বীকৃতি হলো প্রকাশ্য ওহী (কুরআন) মারফত বর্ণনা করার বিষয়টির, আর স্বীকৃতি হলো অপ্রকাশ্য ওহীর (হাদীছ) মাধ্যমে বর্ণনা করার ব্যাপারটির।

এ প্রসঙ্গে কুরআন ইরশাদ করেছেঃ-

كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَانُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ .

(আমি আপনাকে সমস্ত রসূলের কাহিনী শুনাই, যাতে আপনার হৃদয়ে স্থিতি আসে।)

(৭) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ .

(যেদিন আল্লাহ তা'আলা রসুলগণকে একত্রিত করে বলবেন, আপনারা (স্ব-স্ব উম্মতের পক্ষ হতে) কি উত্তর পেয়েছেন? আরয করবেন, আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত।)

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের তিন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথমটা হলো, আপনার জ্ঞানের মুকাবিলায় আমাদের কোন জ্ঞান নেই। দ্বিতীয়টা হলো আদব ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এ ধরনের বিনীত নিবেদন করা হবে। তৃতীয়টা হলো কিয়ামতের মাঠে যখন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলের মুখ থেকে 'নফসী' নফসী' রব উঠবে, তখনই নবীগণ এরূপ বলবেন। পরে অবশ্য আরয করবেন; আমরা নিজ নিজ উম্মতের কাছে আপনার নির্দেশাবলী প্রচার করেছি, কিন্তু তারা মানেনি। কাফিরগণ বলবে, আমাদের কাছে আপনার নির্দেশাবলী পৌঁছেনি। এ ব্যাপারে উম্মতে মুস্তাফা আলাইহিস সালাম নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

فَعَلٰى هٰذَا الْقَوْلِ اِنَّمَا نَفَوُا الْعِلْمَ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَاِنْ كَانُوْا عُلَمَاءَ لِاَنَّ عِلْمَهُمْ صَارَ كَلَا عِلْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ .

(এ উক্তির দ্বারা নবীগণ নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবেন, যদিওবা তাঁরা সম্যকরূপে সবকিছুই জানবেন। এরূপ উক্তি করার কারণ হবে আল্লাহর জ্ঞানের সামনে তাদের জ্ঞান অজ্ঞানতার মতই প্রতিভাত হবে।)

'তাফসীরে মাদারিকে' আছেঃ

قَالُوْا ذٰلِكَ تَادُّبًا اَىْ عِلْمُنَا سَاقِطٌ مَعَ عِلْمِكَ فَكَاَنَّهُ لَاعِلْمَ لَنَا .

(ওই সকল নবীগণ এরূপ উক্তি করবেন মহান আল্লাহর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে। অর্থাৎ তাঁরা বলবেন, প্রভু হে! আমাদের জ্ঞান তোমার অসীম জ্ঞানের সামনে অজ্ঞানতায় পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং, আমাদের যেন কোন জ্ঞানই নেই।

তাফসীরে কবীরে' এ আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

اِنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَمَا عَلِمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَالِمٌ لَايَجْهَلُ حَلِيْمٌ لَايَسْفَهُ عَادِلٌ لَايَظْلِمُ عَلِمُوْا اَنَّ قَوْلَهُمْ لَايُفِيْدُ خَيْرًا وَّلَايَدْفَعُ شَرًّا فَالْاَدَبُ فِى السُّكُوْتِ وَتَفْوِيْضِ الْاَمْرِ اِلَى اللّٰهِ وَعَدْلِهٖ فَقَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا .

(নবীগণ যখন জানেন যে, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী, অজ্ঞ নন, প্রজ্ঞাময় ও ধৈর্যশীল, নির্বোধ নন, ন্যায়পরায়ণ, অত্যাচারী নন, তখন তাঁরা বুঝে নিবেন যে, তাঁদের কোন কথা দ্বারা কোন মঙ্গল হবে না, কিংবা কোনরূপ বিপদ মুক্তিও হবে না। এমতাবস্থায় আদব রক্ষা ও সম্মান প্রদর্শনের একমাত্র উপায় নীরব থাকা ও বিষয়টি আল্লাহর ন্যায়নীতির উপর ছেড়ে দেয়া। তাই তাঁরা আরয করবেন আমাদের কোন জ্ঞানই নেই।

'তাফসীরে বায়যাবীতে' এ আয়তের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছেঃ

وَقِيْلَ الْمَعْنٰى لَاعِلْمَ لَنَا اِلٰى جَنْبِ عِلْمِكَ .

(বলা হয়েছে যে, এ আয়তের অর্থ হচ্ছে-প্রভু হে! আপনার জ্ঞানের মুকাবিলায় আমাদের কোন জ্ঞান নেই।)

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ-

اِنَّ هٰذَا الْجَوَابَ يَكُوْنُ فِىْ بَعْضِ مَوَاطِنِ الْقِيٰمَةِ وَتَرْجِعُ عُقُوْمَ لَهُمْ اِلَيْهِمْ فَيَشْهَدُوْنَ عَلٰى قَوْمِهِمْ اَنَّهُمْ بَلَّغُوْا الرِّسَالَةَ وَاَنَّ قَوْمَهُمْ كَيْفَ رَدُّوْا عَلَيْهِمْ.

(এ ধরনের উত্তর কিয়ামতের মাঠে কোন এক স্থানে দেয়া হবে। অতঃপর ধীর স্থির হয়ে নবীগণ (আলাইহিস সালাম) নিজ নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন- আমরা রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছিলাম আর আমাদের উম্মতগণ আমাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল (সংক্ষিপ্ত)।

(৮) وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ.

(আমি জানিনা যে আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে আর তোমাদের সাথেই বা কিরূপ আচারণ করা হবে।)

বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণ এ আয়াতকে প্রামাণ্য দলীলরূপে গ্রহণ করে নিজেদের মতবাদের সমর্থন পেশ করে থাকেন। তারা বলেন, হুযুর আলাইহিস সালামের নিজের খবর নেই, অন্য কারো খবর রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। কেননা, তিনি এ বিষয়ে জ্ঞাত নন যে, কিয়ামতের ময়দানে আমাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হবে। কিন্তু তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি মত প্রকাশ করেছেন- প্রথমতঃ এ আয়াত مَاۤ اَدْرِىْ দ্বারা 'দিরায়তের'ই অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে; ইলমের নয়। অনুমান ও আন্দাজের উপর ভিত্তি করে কোন কিছুর জ্ঞানকে 'দিরায়ত' বলা হয়। (এই 'দিরায়ত' থেকে 'আদরি' শব্দটি গঠিত হয়েছে।) অর্থাৎ এ কথা মনে করো না যে, আমি ওহী ব্যতীত অনুমানের ভিত্তিতেই এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি, বরং ওহীর মাধ্যমেই সবকিছু জেনেছি। দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতটি হুযুর আলাইহিস সালামকে কিয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত করার আগেই নাযিলকৃত। সুতরাং, এটা রহিত (মানসুখ) বলে গণ্য।

'তাফসীরে সাবী'তে এর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

مَاخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى عَلَّمَهُ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ

مَا يَعْمَلُ بِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِجْمَالًا وَّتَفْصِيْلًا.

(হুযুর আলাইহিস সালাম এ ধরাধাম থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে তাঁর সাথে ও মুমিনগণের সাথে দুনিয়া ও আখিরাতে কি ধরনের ব্যবহার করা হবে, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ও বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছেন।)

মোল্লা আবদুর রহমান ইবন মোহাম্মদ দামেশকী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'রিসালায়ে নাসিখ ও মানসুখ'(رساله ناسخ ومنسوخ)নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন।

وَمَاۤ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ.

(অর্থাৎ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ আয়াতটি مَاۤ اَدْرِىْ الخ. আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে।)

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াত প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَرِحَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوْا وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى مَا اَمْرُنَا وَاَمْرُ مُحَمَّدٍ اِلَّا وَاحِدٌ اَوْمَالَهٗ عَلَيْنَا مِنْ مَّزِيَّةٍ وَفَضْلٍ لَوْلَا اَنَّهٗ مَابْتَدَعَ مَا يَقُوْلُهٗ لَاَخْبَرَهُ الَّذِىْ بَعَثَهٗ بِمَا يَفْعَلُ بِهٖ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ (الاية) فَقَالَتِ الصَّحٰبَةُ هَنِيْئًالَكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَا ذَا يُفْعَلُ بِنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ (الاية) وَاَنْزَلَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا وَهٰذَا قَوْلُ اَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَعِكْرَمَةَ قَالُوْا اِنَّمَا هٰذَا قَبْلَ اَنْ يُّخْبَرَ بِغُفْرَانِ ذَنْبِهٖ وَاِنَّمَا اُخْبِرَ بِغُفْرَانِ ذَنْبِهٖ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَنُسِخَ ذٰلِكَ.

(যখন আয়াতটি নাযিল হয়, তখন মুশরিকগণ খুশী হয়ে বলতে লাগলো 'লাত ও উয্যা মূর্তিদ্বয়ের শপথ! আমাদের ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর একই অবস্থা; আমাদের উপর তাঁর কোন প্রাধাণ্য বা অন্য কোন মর্যাদা নেই। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কুরআনের কালামসমূহ নিজেই রচনা

করে না বলতেন, তাহলে তার প্রেরক খোদা তা'আলা অবশ্যই বলে দিতেন যে তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন।' তখন আল্লাহ তা'আলা لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ الخ আয়াতটি নাযিল করলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) আরয করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে মুবারকবাদ জানাই, আপনি তো জেনে ফেললেন, আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আমাদের কি গতি হবে? তখন আল্লাহ তা'য়ালা لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ...الْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ. (আল্লাহ মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) আয়াটি নাযিল করলেন। এবং وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلاً كَبِيْرًا. (মুমিনদেরকে এ শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণী আছে) আয়াতটিও নাযিল করলেন। হযরত আনাস, কাতদা ও ইকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু) এ মত পোষণ করেন। তাঁদের অভিমত হলো এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ওই আয়াতের আগে, যে আয়াতে হুযুর আলাইহিস সালামের মাগফিরাতের খবর দেয়া হয়েছে। তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়ার সন্ধির বছরই এ খবর দেয়া হয়েছিল। সুতরাং, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।)

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, لَااَدْرِىْ আয়াতটি একটি 'বিবরণাত্মক বাক্য' এবং খবর বা বিবরণ রহিত হতে পারে না। এর কয়েকটি উত্তর আছে, প্রথমতঃ উলামায়ে কিরামের অনেকেই খবর রহিত হওয়ার বৈধতার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, যেমন وَاِنْ تُبْدُوْا الخ আয়াতটি لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অনুরূপ, لَااَدْرِىْ الخ আয়াতটিকে হযরত আব্বাস, আনাস ও ইবন মালিক اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ الخ আয়াত দ্বারা রহিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (তাফসীরে কবীর, দুররে মনসুর ও আবুস সাউদ দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয়ত এ আয়াতে قُلْ لَااَدْرِىْ শব্দ দ্বারা যেহেতু নির্দেশ বুঝায় সেহেতু এর সাথেই রহিত হওয়ার ব্যাপরটি সম্পর্কিত। তৃতীয়তঃ কোন কোন আয়াত আকারের দিক দিয়ে বিবৃতিমূলক বাক্যের মত দেখা যায়, কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক থেকে 'আদেশসূচক বাক্য' রূপে গণ্য হয়। যেমন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ - لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ইত্যাদি। এ ধরনের আয়াত সমূহ রহিত হওয়া জায়েয। চতুর্থতঃ এ আপত্তিটা আমাদের উপর প্রযোজ্য নয়, বরং সে সব তাফসীর ও হাদীছ সম্পর্কে প্রযোজ্য, যদ্দারা 'খবর' রহিত হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয়েছে।

যদি এ আয়াতের উপরোক্ত মর্মার্থ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে আয়াতের বাহ্যিক শাব্দিক অর্থ অনেক হাদীছের বিপরীত হবে। হুযুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন প্রশংসার ঝাণ্ডা لِوَاءُ الْحَمْدِ আমার হাতেই থাকবে।' হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও সকল আদম সন্তান-সন্ততি আমার পতাকাতলে অবস্থান গ্রহণ করবেন। শাফাআতে কুবরা অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমিই সুপারিশ করবো। আমার হাউয এ রকম হবে, এর পানপাত্র এ রকম হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) বেহেশ্‌তী, ও হযরত হাসান ও হুসাইন (রাদিআল্লাহু আনহু) বেহেশ্‌তে নওজোয়ানদের নেতা, হযরত ফাতিমা যুহরা (রাদিআল্লাহু আনহু) জান্নাতে মেয়েদের নেত্রী। কাউকে লক্ষ্য করে বলেছেন 'তুমি জাহান্নামী।' জনৈক ব্যক্তি খুবই উত্তমরূপে জিহাদ করছিল, সাহাবায়ে কিরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) ওর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কিন্তু হুযুর আলাইহিস সালাম ফরমালেন 'সে জাহান্নামী। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, সে আত্মহত্যা করেছিল। যদি নাউযুবিল্লা! হুযুর আলাইহিস সালামের নিজের খবর না থাকে, তাহলে নিজের ও অন্যান্যদের এসব খবর কিভাবে শোনাচ্ছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যার ঈমান রেজিস্ট্রি করবেন, তিনি কামিল ঈমানদার। এখানে আরও অনেক উদহারণ দেয়া যায়। কিন্তু বক্তব্য সংক্ষেপণ করার উদ্দেশ্যে এখানে ক্ষান্ত হলাম। খোদা সবাইকে বিষয়টি উপলব্ধি করার শক্তি দান করুন। আমীন।

(৯) لَا تَعْلَمُهُمْ. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ.

(আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি তাদেরকে জানি।)

এ আয়াতে বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণ আরও একটি প্রমাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন যে, হুযুর আলাইহিস সালামের দরবারে আগত মুনাফিকদেরকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চিনতেন না। তাই ইলমে গায়বের প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে? তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, এ আয়াতের পরেই وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ. (এবং নিশ্চয় তাদের কথার ধরন থেকে তাদেরকে চিনে ফেলবেন) আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। সুতরাং, এ আয়াতটি রহিত হিসেবে গণ্য হয়। অথবা এ রকম ব্যাখ্যাও হতে পারে যে আমি (আল্লাহ) বাতলিয়ে না দিলে আপনি (হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে চিনতেন না।

'তাফসীরে জুমালে' এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে লিখা হয়েছেঃ-

فَاِنْ قُلْتَ كَيْفَ نُفِىَ عَنْهُ عِلْمُ بِحَالِ الْمُنَافِقِيْنَ وَاَثْبَتَهُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ فَالْجَوَابُ اَنَّ اٰيَةَ النَّفِىْ نَزَلَتْ قَبْلَ اٰيَةِ الْاِثْبَاتِ.

(প্রশ্ন করতে পারেন যে, হুযুর আলাইহিস সালাম কর্তৃক মুনাফিকদের অবস্থা জানার বিষয়টি কেন অস্বীকার করা হলো? অথচ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ. আয়াতে তাঁর জানার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর জওয়াব হলো অস্বীকৃতিসূচক আয়াতটি স্বীকৃতিসূচক আয়াতের আগে অবতীর্ণ হয়েছিল।

একই 'জুমালে' وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ. আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَايَتَكَلَّمُ مُنَافِقٌ عِنْدَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّاعَرَفَهُ وَيَسْتَدِلُّ عَلٰى فَسَادِ بَاطِنِهٖ وَنِفَاقِهٖ

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে মুনাফিকদের হুযুর আলাইহিস সালামের দরবারে কথা বলতেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে চিনে ফেলতেন এবং তাদের অন্তরের অসৎ উদ্দেশ্য ও কপটতার পরিচায়ক প্রমাণও উপস্থাপিত করতেন।)

'তাফসীরে বায়যাবীতে' এ আয়াত প্রসঙ্গে লিখা আছেঃ-

خَفِىَ عَلَيْكَ حَالُهُمْ مَعَ كَمَالِ فِطْنَتِكَ وَصِدْقِ فِرَاسَتِكَ.

(আপনার পূর্ণবোধশক্তি ও মানুষ চিনার সঠিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাদের (মুনাফিকদের) অবস্থা আপনার নিকট গোপন রয়ে গেছে।)

এ তাফসীর থেকে বোঝা গেল যে, এ আয়াতে অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে জানার বিষয়টির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। আয়াতের এ ধরনের ব্যাখ্যাবলী গ্রহণ করা না হলে, এটা সমস্ত হাদীছের বিপরীত হয়ে যাবে, যে গুলোতে এ কথা প্রমাণিত যে হুযুর আলাইহিস সালাম মুনাফিকদেরকে চিনতেন, কিন্তু জেনে শুনেও তাদের অবস্থা গোপন করতেন।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আইনী'র ৪র্থ খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় হযরত ইবন মসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اُخْرُجْ يَافُلَانُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ فَاَخْرَجَ مِنْهُمْ نَاسًا فَفَضَحَهُمْ.

(হুযুর আলাইহিস সালাম জুমা'র দিন খুতবা পাঠ করছিলেন। অতঃপর নামোল্লেখপূর্বক বললেন, হে অমুক, বের হয়ে যাও। কেননা, তুমি মুনাফিক। এ রকম করে অনেক ব্যক্তিকে অপদস্থ করে বের করে দিয়েছিলেন।)

মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) রচিত 'শরহে শিফা' এর ১ম খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছেঃ-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُنَافِقُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ ثَلٰثَةَ مِائَةٍ وَمِنَ النِّسَاءِ مِائَةً وَسَبْعِيْنَ.

(হযরত ইবন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে মুনাফিকদের পুরুষের সংখ্যা ছিল তিনশ, আর মহিলার সংখ্যা ছিল একশত সত্তর।)

আমি ইতোপূর্বে ইলমে গায়বের সমর্থনে একটি হাদীছ পেশ করেছি। উক্ত হাদীছে হুযুর আলাইহিস সালাম বলেছেন- 'আমার সামনে আমার সমস্ত উম্মতকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমি তাদের মধ্যে মুনাফিক, কাফির ও মুমিনগণকে চিহ্নিত করেছি। এতে মুনাফিকগণ আপত্তি উথাপন করলো। তখন তাদের আপত্তির জওয়াবে কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। বলা বাহুল্য, যাবতীয় দলীল সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্যে এরূপ প্রায়োগিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অধিকন্তু, আয়াতে বর্ণিত বক্তব্য সাধারণত ক্ষোভ প্রকাশের জন্য করা হয়ে থাকে। বাপ নিজ শিশুকে শাস্তি দিবার সময় কেউ যদি রক্ষা করে তখন তিনি বলেন, এ অসভ্যকে তুমি চিন না, আমি ভালরূপে চিনি। এতে জ্ঞানের অস্বীকৃতি বুঝায় না।

(১০) وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا

(তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আপনি কখনও জানাযার নামায পড়বেন না।)

হুযুর আলাইহিস সালাম আবদুল্লাহ ইবন উবাই নামক কট্টর মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েছিলেন কিংবা পড়তে চেয়েছিলেন। এমন সময় হযরত ফারূকে আজম (রাদিআল্লাহু আনহু) নামায না পড়তে অনুরোধ করলেন। কিন্তু

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অনুরোধ রক্ষা করলেন না। তখনই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যেখানে তাঁকে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যদি তাঁর ইলমে গায়ব থাকতো, তাহলে তিনি মুনাফিকের জানাযার নামায পড়লেন কেন?

এর উত্তর হচ্ছে হযরত আব্বাস ((রাদিআল্লাহু আনহু) এ মুনাফিকের নিকট একটু ঋণী ছিলেন, এবং তার ছেলে কিন্তু খাঁটি মুমিন ছিলেন। উক্ত মুনাফিক নিজে ওসীয়ত করে গিয়েছিল যে তার জানাযার নামায যেন হুযুর আলাইহিস সালাম পড়ান। সে সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সুতরাং, তখনকার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত অনুমতি অনুসারে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমল করেছিলেন। তাফসীরে কবীর ও রূহুল বয়ানে উল্লেখিত আছে যে, তার ওসীয়ত দ্বারা তার তাওবাই প্রমাণিত হয়। শরীয়তের হুকুম বাহ্যিক দিকের উপর বর্তায়। হুযুর আলাইহিস সালাম সে অনুযায়ী আমল করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল না যে তাঁর হাবিবের দুশমন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক। তাই কুরআন করীম হযরত ফারুক (রাদিআল্লাহু আনহু) এর মতের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। মোট কথা, এ বিষয়টি ইলমে গায়বের সহিত মোটেই সম্পৃক্ত নয়। আবদুল্লাহর মুনাফিক হওয়ার বিষয়টি সবার জানা ছিল। তবুও তার জানাযার নামায আদায়ের মধ্যে অনেক কল্যাণময় দিক ছিল। দয়াময়ের বদান্যতা ও মহানুভবতা অনিচ্ছাকৃতভাবেই প্রকাশ পেয়ে যায়। তা' না হলে ইহা কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে যে হযরত ফারুকে আজম (রাদিআল্লাহু আনহু) যা' জানতে পারলেন, তা' হুজুর আলাইহিস সালাম জানতে পারলেন না?

(১১) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ. قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ
وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّاقَلِيْلاً.

(আপনার কাছে এরা আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করছে, আপনি বলুন, আত্মা হচ্ছে খোদার হুকুমে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্তু। এবং তোমরা মাত্র যৎসামান্য জ্ঞানই লাভ করেছ।

বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণ এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, আত্মা কি, হুযুর আলাইহিস সালামের সে জ্ঞান ছিল না। সুতরাং, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পুর্ণ ইলম গায়বের অধিকারী হননি। এখানে তিনটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

প্রথমতঃ এ আয়াতে এ কথা কোথায় আছে যে 'আমি (আল্লাহ) হুযুর আলাইহিস সালামকে আত্মার জ্ঞান দান করিনি"? আর হুজুর আলাইহিস সালামই বা কোথায় বলেছেন,- 'আত্মা সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই। সুতরাং, এ আয়াতকে আত্মা-সম্পর্কিত জ্ঞানের অস্বীকৃতিসূচক দলীল হিসেবে গ্রহণ করাটাই ভুল। এখানে তো প্রশ্নকারী কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, 'তোমাদেরকে যৎসামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে, আত্মার মূলতত্ত্বের জ্ঞান তোমাদের নেই।'

দ্বিতীয়তঃ হযরত কিবলায়ে আলম শাইখ মেহর আলী শাহ সাহেব ফাযেলে গোলড়বী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তার রচিত 'সাইফে চিশতিয়া নামক কিতাবে হযরত মুহিউদ্দীন ইবন আরবীর উদ্ধৃতি দিয়েঃ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ. এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ বলে দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট। অর্থাৎ আলম বা জগত অনেক আছে। যথা 'আলমে আনাসির' (জড় জগত), 'আলমে আরওয়াহ' (আত্মিক জগত) আলমে আমর, আলমে ইমকান' ইত্যাদি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম জগত। রূহ হচ্ছে আমরের অন্তর্ভুক্ত আর তোমরা হচ্ছ আলমে আনাসিরের আওতাভুক্ত। তাই তোমরা এর মূলতত্ত্ব বা স্বরূপ জানতে পারবে না। কেননা, (ওহে কাফিরগণ,) তোমরা তো যৎকিঞ্চিত জ্ঞানের অধিকারী মাত্র।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' আয়াত لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ الْاَبْصَارَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছেঃ

لِاَنَّهُ تَجَاوَزَفِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَنْ عَالَمِ الْعَنَاصِرِ ثُمَّ عَنْ عَالَمِ الطَّبْعِيَّةِ ثُمَّ عَنْ عَالَمِ الْاَرْوَاحِ حَتّٰى وَصَلَ اِلٰى عَالَمِ الْاَمْرِوَعَيْنُ الرَّاْسِ مِنْ عَالَمِ الْاَجْسَامِ فَانْسَلَخَ عَنِ الْكُلِّ وَرَاٰى رَبَّهُ بِالْكُلِّ.

(হুযুর আলাইহিস সালাম মিরাজের রাতে 'আলমে আনাসির' থেকে অগ্রসর হয়ে 'আলমে তাবীয়াত' অতঃপর 'আলমে আরওয়াহ' অতিক্রম করে সর্বশেষে 'আলমে আমর পর্যন্ত পৌছেন। শরীরের এ চর্মচোখ 'আলমে আজসামের' অন্তর্ভুক্ত বিধায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ জগতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক হয়ে যান এবং মহান আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সর্বসত্ত্বা দিয়ে অবলোকন করেন।)

এ থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম মিরাজের রাতে শুধু যে

'আলমে আমর' পরিভ্রমণ করেছেন, তা নয়, বরং নিজেও 'আলমে আমরের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং স্বীয় প্রতিপালককে অবলোকন করেন। আর সেই আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আত্মা বা রূহ। এমতাবস্থায় আত্মা তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কাছে গোপন থাকতে পারে কি? আমরা যেরূপ এ জগতের শারীরিক কাঠামোসমূহ দেখেই পরিচয় পাই, তিনিও (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অনুরূপভাবেই আত্মার পরিচয় লাভ করেন। কারণ রূহও সে একই 'আলমে আমর' এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক রূহ সম্পন্ন ছিলেন কেননা, হযরত মারয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন মানবী, আর হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন রূহ। কুরআনেই আছে فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا (আমি হযরত মারয়ামের কাছে আমার রূহ অর্থাৎ জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) কে পাঠিয়ে ছিলাম।) এবং তাঁর ঈসা (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি হয়েছিল হযরত জিব্রাইলের ফুঁক থেকে। এ জন্য রূহ ও মানব এ উভয়ের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান আছে তাঁর মধ্যে।

'ফুতুহাতে মক্কিয়া' কিতাবের ৫৭৫ অধ্যায়ে শাইখ আকবর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ফরমানঃ-

فَكَانَ نِصْفُهُ بَشَرًا وَنِصْفُهُ الْاٰخَرُرُوْحًا مُطَهَّرًا مَلَكًا لِاَنَّ جِبْرِيْلَ وَهَبَهُ لِمَرْيَمَ.

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন অর্ধেক মানব এবং অপর অর্ধেক পূত পবিত্র আত্মাবিশিষ্ট। কেননা তাঁকে জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) হযরত মারয়ামের নিকট অর্পণ করেছেন।)

তাঁর সৃষ্টিও হুযুর আলাইহিস সালামের নূর থেকে। তাই হুযুর আলাইহিস সালাম হচ্ছেন যেন আপাদমস্তক রূহ (আত্মা)

তাফসীরে রূহুল বয়ানে' لَاتُدْرِكُ الخ আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরও লিখা হয়েছেঃ-

اَلْحَقِيْقَتُ الْمُحَمَّدِيَّةُ هِىَ حَقِيْقَةُ الْحَقَائِقِ وَهُوَ الْمَوْجُوْدُ الْعَامُ الشَّامِلُ.

(হাকীকতে মুহাম্মদীয়া সমস্ত হাকীকতের হাকীকত এবং উহাই সমগ্র সৃষ্টিতেই

ব্যাপৃত।)

সুতরাং, উক্ত আয়াতের অর্থ হল রূহ হচ্ছে, যা' নির্দেশসূচক كُنْ 'কুন' এর ফলশ্রুতিতে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয় এবং উহাই হচ্ছে হাকীকতে মুহাম্মদীয়া, যাঁর সৃষ্টি হলো সরাসরি মাধ্যম ছাড়াই আর বাকী সব কিছুর সৃষ্টি তাঁর নূর থেকে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, তিনিই (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন জগতের 'হাকীকী রূহ'।

'তাফসীরে কবীরে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ এখানে 'রূহ' শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন বা হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কাফিরগণ প্রশ্ন করেছিল, কুরআন কি, কবিতা, না মনগড়া কাহিনী? বা জিব্রাইল কে, এবং এখানে কিভাবে আসেন তিনি? উত্তর দেয়া হয়েছে, কুরআন হচ্ছে খোদার নির্দেশাবলী, কবিতা কিংবা যাদু নয়। আর জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) খোদার হুকুমেই আসেন। কুরআনেই বলা হয়েছে وَمَانَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِرَبِّكَ. (আপনার প্রভুর হুকুম ছাড়া তিনি অবতরণ করেন না।)

উক্ত তাফসীরে কবীরে আরও বলা হয়েছেঃ-

فَاِذَا كَانَ مَعْرِفَتُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُمْكِنَةً بَلْ حَاصِلَةً فَاَىُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ مَعْرِفَةِ الرُّوْحِ.

হুযুর আলাইহিস সালাম যখন খোদাকে চিনলেন, রূহকে কেন চিনবেন না?)

তৃতীয়তঃ তাফসীরকারক ও হাদীছবেত্তাগণ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে হুযুর আলাইহিস সালামের রূহের জ্ঞান ছিল।

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

قِيْلَ اِنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ مَعْنَى الرُّوْحِ لٰكِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِهٖ لِاَنَّ تَرْكَ الْاَخْبَارِ كَانَ عَلَمًا لِنُبُوَّتِهٖ وَالْقَوْلُ الْاَصَحُّ اَنَّ اللّٰهَ اسْتَاْثَرَ بِعِلْمِ الرُّوْحِ.

(বলা হয়েছে যে, নবী আলাইহিস সালামের রূহের স্বরূপ জানা ছিল, কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি তিনি। কেননা, না বলাটাই ছিলো তাঁর নবুওয়াতের আলামত। এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক সঠিক মত হলো যে রুহের জ্ঞান আল্লাহ্‌ সহিত

বিশেষভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

এ ইবারতে রূহ সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদানকারীকে মুশরিক' বলা হয়নি বা তাদের মতকেও ভুল বলা হয়নি।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

جَلَّ مَنْصَبُ حَبِيْبِ اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ جَاهِلاً بِالرُّوْحِ مَعَ اَنَّهُ عَالِمٌ بِاللّٰهِ وَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ.

(হুযুর আলাইহিস সালাম রূহ সম্পর্কে অনবহিত, অথচ আল্লাহ সম্পর্কে অবগত- এধরনের অশোভন উক্তি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ক্ষেত্রে খাটে না। মহা প্রভু তাঁর প্রতি স্বীয় অসীম অনুগ্রহের উল্লেখ পূর্বক ইরশাদ করেছেন যে, 'যা' কিছু আপনি জানতেন না, তা আপনাকে অবহিত করেছি'।

'তাফসীরে মাদারিকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আছেঃ-

وَقِيْلَ كَانَ السَّوَالُ عَنْ خَلْقِ الرُّوْحِ يَعْنِىْ هُوَ مَخْلُوْقٌ اَمْ لاَ وَقَوْلُهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ دَلِيْلُ خَلْقِ الرُّوْحِ فَكَانَ جَوَابًا.

(বলা হয়েছে যে, এখানে প্রশ্নটি ছিল রূহের সৃষ্টি সম্পর্কে। অর্থাৎ রূহ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত কিনা? আল্লাহর ইরশাদ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ দ্বারা রূহ সৃষ্ট বলেই প্রমাণিত হল। সুতরাং, এটি হচ্ছে তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর।)

এ ইবারত থেকে বোঝা গেল যে, উক্ত আয়াতে রূহের জ্ঞান থাকা, না থাকার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি, বরং এখানে আলোচনা হয়েছে রূহের মাখলুক (সৃষ্ট) হওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে।

'মাদারেজুন নাবুওয়াতের' দ্বিতীয় খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায়ঃ-

وصل ایزارسانی کفار فقراء صحابه را. শীর্ষক পরিচ্ছেদে শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) উল্লেখ করেছেনঃ-

چه گونه جرأت کند مؤمن عارف که نفئی عالم بحقیقت روح
ازسید المرسلین وامام العارفین کند وداده است اورا حق
سبحانه علم ذات وصفات خود وفتح کرده برائے او فتح مبین

ازعلوم اولین وآخرین روح انسانی چه باشد که درجنب جامعیت
وے قطره ایست از دریا وذره ایست ازبیدا.

(একজন 'আরিফ' মুমিন হুযুর আলাইহিস সালাম সম্পর্কে রূহের মৌলতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার ধৃষ্টতা কিরূপে প্রদর্শন করতে পারেন? যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (হুযুর) স্বীয় সত্ত্বা ও গুণাবলীর জ্ঞান দান করেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের তুলনায় মানবাত্মা 'সম্পর্কিত জ্ঞানের আর কতটুকুইবা বিশেষত্ব থাকতে পারে। এ'তো যেন সমদ্রের এক কাতরা, বা সুবিস্তৃত প্রান্তরের একটি পরমাণু সদৃশ মাত্র।)

সুবিখ্যাত 'ইহয়াউল উলুম' কিতাবে ইমাম গায্যালী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

وَلاَ تَظُنَّ اَنَّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مَكْشُوْفًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ فَكَيْفَ يَعْرِفُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ فَلاَيَبْعُدُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ مَكْشُوْفًا لِبَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ.

(এ কথা মনে করবেন না যে, হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট রূহের রহস্য উৎঘাটিত হয়নি। কেননা, যে নিজেকে চিনতে পারে না, সে আল্লাহকে কিভাবে চি- নতে পারে? কোন কোন ওলী ও আলেমে রব্বানীর নিকটও রূহের রহস্য উন্মোচনের ব্যাপারটি বিচিত্র কিছু নয়।)

উপরোক্ত ভাষ্যসমূহ থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামকে রূহের জ্ঞান দান করা হয়েছে। অধিকন্তু, তারই বদৌলতে কোন কোন আলেম ও ওলীও এ জ্ঞান লাভ করেছেন। কিছু সংখ্যক লোক এটা অস্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু সে সম্পর্কে কোন দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। উপরন্তু, কোন বিষয়ে স্বীকৃতি সূচক ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বিবিধ দলীল পাওয়া গেলে স্বীকৃতিসূচক প্রমাণ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। উসুলের বিধিবদ্ধ নিয়মই হচ্ছে এরূপ, যা' পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

(১২) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ.

(আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন" আপনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন কেন?)

তবুকের যুদ্ধে কোন কোন মুনাফিক মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে অংশ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। তদের এ ছল-ছাতুরী হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে ধরা পড়েনি। তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দিয়ে দেন। তাই এ আয়াতে কেন তিনি অনুমতি দিলেন সে কারণে তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হয়েছে। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইলম গায়বের অধিকারী হতেন, তা'হলে আসল ব্যাপারটি তাঁর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়তো।

উত্তরঃ এ আয়াতে হুযুর আলাইহিস সালামকে না কোন ভর্ৎসনা করা হয়েছে, না তিনি তাদের চালবাজী সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাই-হে ওয়াসাল্লাম) তাদের অবস্থা জেনেও তাদের গোমর ফাঁস না করেই অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে অপরাধীদের গোপনীয়তা রক্ষাকারী! আপনি তাদেরকে কেন অপদস্থ করলেন না? ভর্ৎসনা করা হয় ভুলত্রুটির জন্য। এখানে কোন্ ধরনের ত্রুটি হলো? عَفَاللّٰهُ (আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন) হচ্ছে আশীর্বাদসূচক বাক্য; ভর্ৎসনার জন্য এ বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়নি।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا. فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا. (১৩)

(আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে এরা জিজ্ঞাসা করছে যে, উহা কোন্ সময়ের অপেক্ষায় আছে? এ তথ্যের সাথে আপনার কীই বা সম্পর্ক আছে'?

এ আয়াতকে বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণ তাদের দাবীর সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ উত্থাপন করে বলেন যে, কিয়ামত কখন হবে, এ সম্বন্ধে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান ছিল না। তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে 'ইলমে গায়ব' এর অধিকারী হননি। বস্তুতঃ সঠিক কথা হলো যে আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালামকে এ জ্ঞানও দান করেছেন। তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের কয়েকটি প্রায়োগিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এক, এ আয়াতটি কিয়ামতের জ্ঞান দান করার পূর্বেই নাযিল করা হয়েছিল। দুই, এ উক্তি দ্বারা প্রশ্নকারীদের উত্তর দেয়া থেকে তাঁকে বিরত রাখাই উদ্দেশ্য, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন নয়। তৃতীয়তঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا অর্থাৎ আপনি নিজেইতো

কিয়ামতের লক্ষণসমূহের অন্যতম। আপনাকে দেখেই তাদের জেনে নেওয়া উচিত যে কিয়ামত নিকটবর্তী। চতুর্থতঃ এখানে বলা হয়েছে, তাঁকে সে সব তথ্য পৃথিবীতে প্রকাশ করার জন্য পাঠানো হয়নি।

'তাফসীরে সাবী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

وَهٰذَا قَبْلَ اِعْلَامِهٖ بِوَقْتِهَا فَلَايُنَافِى اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

(এ আয়াতটি হুযুর আলাইহিস সালামকে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে অবহিত করার পূর্বেই নাযিলকৃত। সুতরাং, এ বক্তব্যটি সে উক্তির বিপরীত নয়, যেখানে বলা হয়েছে 'পৃথিবী থেকে হুযুর আলাইহিস সালাম বিদায় গ্রহণ করেননি, ততক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন। তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' আছেঃ-

قَدْذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ اِلٰى اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتَ السَّاعَةِ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ وَهُوَ لَايُنَافِى الْحَصْرَ فِى الْاٰيَةِ.

কোন কোন মাশায়িখ এ মত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক উক্ত সময় সম্পর্কে তাকে অবহিত করার ফলশ্রুতিতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের সময় সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং এ উক্তিটি এ আয়াতের অন্তর্নিহিত 'সীমাবদ্ধতার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কিয়ামতের সময় সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহর জন্য খাস। মাশায়িখের উপরোক্ত উক্তিটি কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা জ্ঞাপক এ আয়াতটির বিপরীত নয়।)

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' ৯ম পারার- يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেও এ ভাষ্যই উল্লেখিত আছে। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর পূর্ণ বয়স সত্তর হাজার বছর এবং এ তথ্যটি বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। তাই বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামের কিয়ামতের জ্ঞান ছিল।

তাফসীরে 'খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছঃ-

وَقِيْلَ مَعْنَاهُ فِيْمَا اِنْكَارٌ لِسُوَالِهِمْ اَىْ فِيْمَا هٰذَا السُّوَالُ ثُمَّ قَالَ

اَنْتَ يَامُحَمَّدُ مِنْ ذِكْرَاهَا اَىْ مِنْ عَلَامَاتِهَا لِاَنَّكَ اٰخِرُ الرُّسُلِ فَكَفَا هُمْ ذٰلِكَ دَلِيْلًا عَلٰى دُنُوِّهَا.

(কারো কারো মতে فِيْمَا শব্দ দ্বারা কাফিরদের অবাঞ্ছিত প্রশ্নের অযৌক্তিকতার কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের এ আবার কোন্ ধরনের প্রশ্ন। অতঃপর বলেছেন-হে মুহাম্মদ- (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। আপনি নিজেই কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম। কেননা আপনি হলেন সর্বশেষ নবী। সুতরাং, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ হিসাবে তাদের জন্য এতটুকুইতো যথেষ্ট। 'তাফসীরে মাদারিকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছেঃ-

اَوْكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ السَّاعَةَ وَيُسْاَلُ عَنْهَا حَتّٰى نَزَلَتْ فَهُوَ تَعَجُّبٌ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهَا.

(অথবা ' হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামত সম্পর্কিত ব্যাপারে অনেক কিছু বর্ণনা করতেন এবং এ প্রসঙ্গে তাকে বিবিধ প্রশ্ন করা হতো। শেষ পর্যন্ত এ আয়তটি অবতীর্ণ করা হয়। সুতরাং, এ আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এত অতিরিক্ত বর্ণনার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।) এ আয়াতের মর্মার্থ হলো আপনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের আর কত বর্ণনা দিবেন।

উক্ত তাফসীরে মাদারিকে এ আয়াত প্রসঙ্গে আরও উল্লেখিত আছেঃ-

اَوْفِيْمَا اِنْكَارٌ لِسُوَالِهِمْ عَنْهَا اَىْ فِيْمَا هٰذَا السُّوَالُ ثُمَّ قَالَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا وَاَنْتَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِهَا فَلَا مَعْنٰى لِسُوَالِهِمْ عَنْهَا.

(অথবা فِيْمَا, শব্দ দ্বারা কাফিরদের অবান্তর প্রশ্নের অসারতার কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ প্রশ্নটিইবা কোন্ ধরনের। অতঃপর বলেছেন 'আপনি এ কিয়ামতের চিহ্ন সমূহের একটি। সুতরাং, এমতাবস্থায় তাদের কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করার কীই বা অর্থ হতে পারে?) এ আয়াতের মর্মার্থ হলো- কিয়ামত সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করাটা অহেতুক, আপনি নিজেই কিয়ামতের আলামত স্বরূপ। তবুও তারা কেন এ প্রশ্ন করে?।

'তাফসীরে মাদারিকে' সে একই আয়াত প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছেঃ-

قِيْلَ فِيْمَا اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مُتَّصِلٌ بِالسُّوَالِ اَىْ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا وَيَقُوْلُوْنَ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ثُمَّ اسْتَانَفَ فَقَالَ اِلٰى رَبِّكَ.

(এবং বলা হয়েছে যে, فِيْمَا اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. এ অংশটুকুর সম্পর্ক হচ্ছে আয়াতে উক্ত প্রশ্নের সাথে। কাফিরগণ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে? এবং তারা এও বলে যে আপনি এ জ্ঞান কোত্থেকে পেলেন? এরপর আল্লাহ তা'আলা নিজের কথা পুনরারম্ভ করে বলেন اِلٰى رَبِّكَ (এ জ্ঞান তার উৎস আল্লাহর দিকেই প্রত্যাগমন করে।)

এখন এ আয়াতের মর্মার্থ হলো কাফিরগণ জিজ্ঞাসা করছিলো এ জ্ঞান কোত্থেকে লাভ করলেন? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর তরফ থেকে। সুতরাং, আয়াতটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানেরই প্রমাণবহ।

উপরোক্ত তাফসীরে উক্ত আয়াত এর তাফসীরে আরও লিপিবদ্ধ আছে।

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا اَىْ لَمْ تُبْعَثْ لِتُعَلِّمَهُمْ بِوَقْتِ السَّاعَةِ اِنَّمَا اَنْتَ الخ

(অর্থাৎ আপনাকে এ জন্য পাঠানো হয়নি যে, তাদেরকে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে অবহিত করবেন।)

এখন আলোচ্য আয়াতের আসল মতলব হলো কাফিরগণ যে বলে "যদি আপনি কিয়ামতের খবর দিতে পারেন তাহলে আপনি নবী, অন্যথায় নবী নন। এটা নিছক বাজে প্রলাপ বৈ আর কিছু নয়। কেননা, কিয়ামতের খবর দেয়াটা নবুওয়াতের অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবীর জন্য যা জরুরী, তা হচ্ছে ধর্মের নির্দেশাবলীর প্রচার করা।

মাদারিজুন নাবুওয়াতের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪০ পৃষ্ঠায় ایذا رسانی کفار فقراء صحابه را. শীর্ষক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছেঃ-

وبعضے علماء علم ساعت نیز مثل ایں معنی گفته اند.

অর্থাৎ কোন কোন আলেম রূহ সম্পর্কিত জ্ঞানের মত কিয়ামত সম্পর্কেও হুযুর

আলাইহিস সালামের জ্ঞান আছে বলে স্বীকার করেন।

يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللّٰهِ. (১৪)

(তারা আপনাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যে কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান যেন আপনার নিজস্ব গবেষণালব্ধ। আপনি তাদের বলে দিন যে, এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।)

বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণ এ আয়াতটি উপস্থাপন করে বলেন যে, কিয়ামত সম্বন্ধে হুযুর আলাইহিস সালামের কোন জ্ঞান নেই। এর দুটি উত্তর রয়েছে। এক, এ আয়াতের মধ্যে কোথায় আছে যে হুযুর আলাইহিস সালামকে কেয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ দান করেননি? এখানে তো শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে এ জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই। এ জ্ঞান দান করা সম্পর্কে কোন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়নি এখানে। দুই' এ আয়াতটি কিয়ামতের জ্ঞান দান করার আগেই নাযিলকৃত। তাফসীরে সাবীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছেঃ-

وَالَّذِىْ يَجِبُ الْاِيْمَانُ بِهٖ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ الَّتِىْ تَحْصُلُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُهَا كَمَاهِىَ عَيْنَ يَقِيْنٍ لِمَا وَرَدَ رُفِعَتْ اِلَى الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ فِيْهَا كَمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذِهٖ وَوَرَدَ اَنَّهٗ اُطْلِعَ عَلَى الْجَنَّةِ وَمَا فِيْهَا وَالنَّارِ وَمَافِيْهَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ وَلٰكِنْ اُمِرَ بِكِتْمَانِ بَعْضِهَا.

(এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশ্বাস করা একান্ত দরকার, সেটা হচ্ছে নবী আলাইহিস সালাম পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সে সমস্ত অদৃশ্য ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যা দুনিয়া ও আখিরাতে সংঘটিত হবে। তাঁর জ্ঞান একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জ্ঞাত তথ্যের মত। কেননা, হাদীছে বর্ণিত আছে- 'আমার সামনে দুনিয়াকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমি নিজের হস্তস্থিত বস্তু দেখার মত সবকিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলাম। আরও বর্ণিত আছে যে, তাঁকে বেহেশ্‌ত ও

সেখানকার যাবতীয় নিয়ামত, দোযখ ও সেখানকার যাবতীয় শাস্তি ও যন্ত্রণা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত করা হয়েছে। তবে এ সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য তাঁকে গোপন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের ব্যাখা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এ আয়াতটির আসল ইবারত হচ্ছে يَسْئَلُوْنَكَ عَنْهَا كَاَنَّكَ حَفِىٌّ অর্থাৎ ওই সকল লোক আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করছে যেন আপনি তাদের প্রতি বড় মেহেরবান। আপনি তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করবেন। অথচ এটা খোদার ভেদসমূহের অন্যতম যা অপরের কাছে গোপন রাখা একান্ত দরকার। এতে বোঝা গেল যে হুযুর আল-াইহিস সালামের কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু তা প্রকাশ করার অনুমতি নেই।

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ (১৫)

(লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন যে এ সম্পর্কে আল্লাহই জ্ঞাত)

তাফসীরে সাবীতে এ আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষণে লিখা হয়েছে -

اِنَّمَا هُوَ وَقْتُ السُّوَالِ وَالْاَفَلَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اَطْلَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে কেউ সম্যকরূপে অবগত নয় কথাটি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার সময় প্রযোজ্য ছিল। কেননা নবী আলাইহিস সালাম দুনিয়া থেকে তশরীফ নিয়ে যাননি, যে পর্যন্ত না তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা' আলা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যার মধ্যে কিয়ামতও অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াত প্রসঙ্গে তাফসীরে রুহুল বয়ানে' আছে -

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ النَّبِىِّ اَنْ يَّعْلَمَ الْغَيْبَ بِغَيْرِ تَعْلِيْمٍ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى

(নবী হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে এরূপ কোন শর্ত নেই যে, আল্লাহ কর্তৃক জ্ঞাত করা ছাড়া অদৃশ্য বিষয়াদি জানতে হবে।

আয়াতে কাউকে কিয়ামতের জ্ঞান দান করা সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা

হয়নি। সুতরাং, হুযুর আলাইহিস সালাম এসম্পর্কে অনবহিত - একথাটি আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণই ভুল ।

তাফসীরে সা'বীতে إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ আয়াতটির ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ

الْمَعْنَى لَا يُفِيْدُ عِلْمَهُ غَيْرَهُ تَعَالَى فَلَا يُنَافِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أُطْلِعَ عَلَى مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ وَمِنْ جُمْلَتِهِ عِلْمُ السَّاعَةِ

(এর অর্থ হলো – কিয়ামতের জ্ঞান খোদা ছাড়া কেউ দিতে পারে না । সুতরাং, আয়াতটি ঐ বর্ণনার পরিপন্থী নয় , যেখানে বলা হয়েছে নবী আলাইহিস সালাম দুনিয়া থেকে তশরীফ নিয়ে যাননি , যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পূর্বাপর যাবতীয় ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। কিয়ামতের জ্ঞানও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত ।

বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের অস্বীকৃতির সমর্থনে মিশকাত শরীফের শুরুতে সন্নিবেশিত এ রেওয়াতটি পেশ করেন; হজরত জিব্রাইল (আঃ) একদা হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে আরয করছিলেন أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ (আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে খবর দিন।) তখন হুযুর আলাইহিস সালাম বলেছিলেন ঃ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে আমি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী কিছু জানি না। এ থেকে বোঝা গেল যে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের জ্ঞান নেই । কিন্তু এ দলীলটাও দ্বিবিধ কারণে একেবারে ভিত্তিহীন । এর একটি কারণ হলো এতে হুযুর আলাইহিস সালাম স্বীয় জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি । কেবল অপেক্ষাকৃত বেশী জ্ঞানের অস্বীকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন । তা নাহলে তিনি বলতেন لَا أَعْلَمُ (আমি জানি না)

এরূপ না বলে এত লম্বা চওড়া কথাই বা কেন বললেন? এর মূল বক্তব্য এও হতে পারে যে,হে জিব্রাইল, এ প্রসঙ্গে আমার ও আপনার জ্ঞান একই ধরনের । অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে আমি যেরূপ অবগত আপনিও সেরূপ অবগত আছেন । কিন্তু এ জনসমক্ষে রহস্যের উদঘাটন সমীচীন নয় । দ্বিতীয় কারণ হলো উত্তর শুনে

জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) আরয করছিলেন فَأَخْبِرْ عَنْ أَمَارَاتِهَا -(তা'হলে কিয়ামতের লক্ষণ সমূহ বলে দিন)। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করলেন। যেমন সন্তান -সন্ততির অবাধ্য হওয়া, নীচু জাতের লোকদের পার্থিব সম্মানের অধীকারী হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি । যার কিয়ামত সম্পর্কে কোন ধারণাই না থাকে তাঁর নিকট লক্ষণ জিজ্ঞাসা করার কীইবা তাৎপর্য হতে পারে। কোন কিছুর লক্ষণ বা খোঁজ জানতে হলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত লোককেই তো জিজ্ঞাসা করা হয়।

উল্লেখ্য যে হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। মিশকাত শরীফের জুমা অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে ঃ - لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (জুমার দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে)

আঁ হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজ হাতের শাহাদত ও মধ্যমা আঙুলীদ্বয় একত্রিত করে বলেছিলেন بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ আমার এ ধরায় আগমন ও কিয়ামত এ দু'আঙুলীর মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।) অর্থাৎ আমার যুগের পরেই কিয়ামত অনুষ্ঠিতব্য। (মিশকাত শরীফঃ খুতবায়ে ইয়াওমে জুমা শীর্ষক অধ্যায়) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের সব লক্ষণই এমনভাবে নির্দেশ করেছেন যে একটি কথাও বাদ দেননি। আজ আমি হলফ করে বলতে পারি যে কিয়ামত এক্ষুণি সংঘটিত হতে পারে না। কেননা এখনও দাজ্জাল আসেনি হযরত মসীহ (আলাইহিস সালাম) ও মাহদী (আলাইহিস সালাম) এর আবির্ভাব হয়নি । এবং সূর্যও পশ্চিম দিকে উদিত হয়নি। এসব লক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সুনিশ্চিত ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করে দিয়েছেন। এর পরও কিয়ামতের জ্ঞান না থাকার কি অর্থ হতে পারে? শুধু এতটুকু বলা যায় যে সনের কথা উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ অমুক সনে কিয়ামত সংঘটিত হবে একথা বলেন নি। স্মর্তব্য যে হুযুর আলাইহিস সালাম-এর যুগে সন প্রচলিত হয়নি। হিজরী সন হযরত উমর ফারুকের (রাদিআল্লাহু আনহু) শাসনামলে প্রবর্তিত হয়। হিজরতের ঘটনা ঘটে রবিউল আউয়াল মাসে কিন্তু হিজরী সনের সূচনা হয় মহররম মাস থেকে। সে যুগে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে কোন বৎসর বিশেষ কোন গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা ঘটলেই তার স্মৃতিবাহী রূপে উক্ত ঘটনার সঙ্গে সনকে সম্পৃক্ত করে দেয়া হতো। যেমন হাতীর বছর, বিজয়ের বছর, হুদাইবিয়ার বছর ইত্যাদি। এমতাবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট হিজরী সনের উল্লেখ আদ্যে সম্ভবপর ছিল কি ?

তাই ঐ দিনের যাবতীয় লক্ষণ বলে দিয়েছেন। যে পবিত্র সত্ত্বা বিস্তারিতভাবে এতগুলো লক্ষণের বর্ণনা দিতে পারেন, তিনি কিভাবে সে বিষয়ে অজ্ঞ হতে পারেন? অধিকন্তু আমি ইলমে গায়েবের সমর্থনে পূর্বে একটি হাদীছ পেশ করেছি, যেখানে উক্ত হয়েছে যে হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামত অবধি যাবতীয় ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর পরেও কিয়ামত সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা চিন্তা করার অবকাশ থাকতে পারে কি? দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটার সাথে সাথেই তো কিয়ামত। আর হুযুর আলাইহিস সালামের আরও জানা আছে যে যাবতীয় ঘটনাবলীর মধ্যে কোন্‌টার পর কোন্‌টা ঘটবে। যে সর্বশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন উহাই দুনিয়ার সমাপ্তি ও কিয়ামতের সূচনার সুস্পষ্ট দিক দর্শনরূপে প্রতিভাত হবে। দুটো পরস্পর মিলিত বস্তুর বা বিষয়ের একটির সমাপ্তির জ্ঞান অপরটির সূচনার জ্ঞান অবশ্যম্ভাবীরূপে জন্ম দেয়। এ ব্যাপারে খুব মনোযোগ সহকারে চিন্তা ভাবনা দরকার। একথাটি প্রণিধান যোগ্য অতিশয় তাৎপর্যমণ্ডিত ও অনবদ্য, যা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও মুরশিদ হযরত সদরুল আফাজেল মওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী সাহেব (রহঃ) তার এক ভাষণে বলে ছিলেন।

(১৬) اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ط

(নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনি জানেন মায়ের পেটে যা' কিছু আছে, কেউ একথা জানে না যে কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না যে কোন্ জায়গায় সে প্রাণ ত্যাগ করবে । নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় জ্ঞানী ও অবহিতকারী।

এ আয়াতকে সামনে রেখে ভিন্নমতাবলম্বীগণ বলেন যে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নেই, এটি আল্লাহর গুণ। যে অপর কাউকে এগুলোর অধিকারী সাব্যস্ত করবে, সে মুশরিক বলে গণ্য হবে। কিয়ামত কখন হবে, বৃষ্টি কখন হবে, গর্ভবতী মহিলার গর্ভে ছেলে কি মেয়ে, আগামী কাল কি হবে এবং কে কোথায় মারা যাবে – এ পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞানকে পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান (عُلُوْمِ خَمْسَه) নামে অভিহিত করা হয়। এ আয়াতের সমর্থনে তারা মিশকাত শরীফের শুরুতে উল্লেখিত রেওয়াতেটিও উপস্থাপন করেন, যেখানে বলা

হয়েছে জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) হুযুর আলাইহিস সালামকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিই ইরশাদ করেছিলেন ঃ-

فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُ هُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَرَءَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

অর্থাৎ ওই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ জানে না। এর পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উক্ত আয়াতটি তিলওয়াত করেন।

আমি এ পঞ্চ জ্ঞান সম্পর্কে একান্ত ন্যায়ানুগ বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাচ্ছি এবং সুধি পাঠকবৃন্দের ন্যায় সঙ্গত বাচ-বিচার ও মহান আল্লাহর নিকট এ আলোচনাটুকু গৃহীত হওয়ার আশা রাখি। আমি প্রথমে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের উক্তি, এর পর উক্ত হাদীছ প্রসঙ্গ সর্বজনমান্য মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য ও সর্বশেষে আমার নিজের যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য পেশ করছি।

তাফসিরাতে আহমদীয়ায় উক্ত আয়াতের ব্যাখায় উল্লিখিত আছে -

وَلَكَ اَنْ تَقُوْلَ اِنَّ عِلْمَ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ لَا يَعْلَمُهَا اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ لٰكِنْ يَجُوْزُ اَنْ يُعَلِّمَهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ مُحِبِّيْهِ وَاَوْلِيَاءِهٖ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ بِمَعْنَى الْمُخْبِرِ

(আপনিএ কথাও বলতে পারেন যে, এ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে খোদা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কিন্তু এও সঙ্গতঃ যে আল্লাহ তা'আলা তার ওলী ও প্রিয়জনদের মধ্যে যাকে/ যাদেরকে ইচ্ছে এ সমস্ত বিষয়ে অবহিত করেন। আয়াতের মধ্যেই এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে উক্ত হয়েছে - (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) আল্লাহ জ্ঞানী ও অবহিতকারী এ খরীরুন خَبِيْرٌ শব্দটি মুখবিরুন ' مُخْبِرٌ অবহিতকারী অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে।)

তাফসীরে সাবীতে আয়াতাংশ। مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

اَىْ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهَا وَاَمَّا بِاِعْلَامِ اللّٰهِ لِلْعَبْدِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَالْاَنْبِيَاءِ وَبَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ قَالَ تَعَالٰى وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ء قَالَ تَعَالٰى فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ اللّٰهِ يُطْلِعُ بَعْضَ عِبَادِهِ الصّٰلِحِيْنَ عَلٰى

بَعْض الْغَيْبَات فَتَكُوْنُ مُعْجِزَةً لِلنَّبِيِّ وَكَرَامَةً لِلْوَلِيِّ وَ لِذَ الِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ اَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَطْلَعَهُ عَلٰى تِلْكَ الْخَمْسِ –

অর্থাৎ ওই সব বিষয় কেউ সত্ত্বাগতভাবে জ্ঞাত নয়, কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক অবহিত করার ফল শ্রুতিতে জানার ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নেই। যেমন নবীগণ ও মুষ্টিমেয় ওলীগণ সে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন - এসব লোক আল্লাহর জ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করতে পারেন না, তবে যতটুকু আল্লাহ চান, ততটুকু পারেন। আরও ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তার মনোনীত রসুলগণ ছাড়া অন্য কারো নিকট তার রহস্যাবলী ও অদৃশ্য বিষয়াদি উন্মোচন করেন না। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার কোন প্রিয় বান্দাকে কোন কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে কোনরূপ অন্তরায় নেই। অতএব জ্ঞানের প্রকাশ নবীর "মুজিযা ও ওলীর 'কারামত' হিসাবে গণ্য হবে। এ জন্য সুবিজ্ঞ আলিমগণ বলেন যে, সঠিক কথা হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালাম ইহজগত থেকে তশরীফ নিয়ে যাননি, যতক্ষণ না পঞ্চবিষয়ে তাকে অবহিত করা হয়েছে।

তাফছিরে আরাঈসুল বয়ানে আয়াতাংশ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ

এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে –

سَمِعْتُ اَيْضًا مِنْ بَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ اَنَّهُ اَخْبَرَ مَا فِي الرَّحْمِ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَرَئَيْتُ بِعَيْنِى مَااَخْبَرَ

কোন কোন ওলীর কাছে শুনেছি যে তাঁরা গর্ভস্থিত শিশু ছেলে কি মেয়ে সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আগে ভাগেই বলে দিয়েছেন, এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি যে তারা যা বলেছেন তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা আছে।

وَمَا رُوِىَ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ مِنَ الْاَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوْبِ فَبِتَعْلِيْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِمَّا بِطَرِيْقِ الْوَحْىِ اَوْ بِطَرِيْقِ الْاِلْهَامِ وَالْكَشْفِ وَكَذَا اَخْبَرَ بَعْضُ الْاَوْلِيَاءِ عَنْ نُزُوْلِ الْمَطَرِ وَاَخْبَرَ عَمَّافِي الرَّحْمِ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى فَوَقَعَ كَمَا اَخْبَرَ

(নবী ও ওলীগণ থেকে যে সব অদৃশ্য বিষয়াদির খবর আছে, সেগুলো খোদা কর্তৃক অবহিত করার ফলশ্রুতি স্বরূপ তথা ওহী 'ইলহাম' বা 'কশফের' মাধ্যমে তারা জ্ঞাত হন। যেমন- কোন কোন ওলী বৃষ্টি বর্ষণ সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তারা যে রকম বলেছেন ঠিক সে রকমই হয়েছে।

কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের পর্যালোচনা আমি ইতিপূর্বেই করেছি উহাও পঞ্চ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত তাফসীর সমূহের ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীব আলাইহিস সালামকে পঞ্চ জ্ঞান দান করেছেন এবং এ আয়াতে খবীর خَبِيْرٌ – শব্দটি মুখবির مُخْبِرٌ অর্থাৎ অবহিতকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক তাফসীরের উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে এখানেই শেষ করলাম। এখন বাকী রইল মিশকাত শরীফের কিতাবুল ঈমানের শুরুতে উল্লেখিত হাদীছটির প্রসঙ্গ, যেখানে বলা হয়েছে ওই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে কেউ জানে না। এখন উক্ত হাদীছের বিবিধ ভাষ্যের দিকে নজর দিন।

ইমাম করতবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে), ইমাম আঈনি (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ও ইমাম কুসতলানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাতের কিতাবুল ঈমানের ১ম পরিচ্ছেদ ঐ হাদীছের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন ঃ-

فَمَنِ ادَّعٰى عِلْمَ شَيْئٍ مِنْهَا غَيْرَ مُسْنَدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِبًا فِىْ دَعْوَاهُ

সুতরাং, যে কেউ হুযুর আলাইহিস সালামের মাধ্যম ছাড়া এ পঞ্চ বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে সে স্বীয় দাবীতে মিথ্যুক।)

'আশআতুল লম'আত'গ্রন্থে শাইখ আব্দুল হক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

مراد انست كه بے تعليم الهى بحساب عقل اينها را نداند از امور غيب اند كه جز خدائے تعالى كے ان اند مگر انكه وى تعالى ازنزد خود كے رابوحى والهام بداناند

অর্থাৎ হাদীছের ভাবার্থ হলো এ সব অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ কর্তৃক অবহিত করা ছাড়া কেউ স্বীয় প্রজ্ঞা ও সহজাত জ্ঞানের বলে জ্ঞাত হতে পারে না । কেননা সেগুলো সম্পর্কে খোদা ব্যতীত আর কেউ জ্ঞাত নয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দেন তিনিই জ্ঞাত হন।

ইমাম কুসতলানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শরহে বুখারীর কিতাবুত তাফসীর সুরা 'রা'দে উল্লেখ করেছেন ঃ-

لَايَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهُ وَاِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَسُوْل فَاِنَّهٗ يُطْلِعُهٗ عَلٰى غَيْبِهٖ وَالْوَلِىُّ التَّابِعُ لَهٗ يَاخُذُهٗ عَنْهُ

(কিয়ামত কখন হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তার মনোনীত রসুল ছাড়া আর কেউ জানে না। কেননা মহাপ্রভু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসুলকে তাঁর গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। সেই রসুলের অনুসারী ওলী তাঁর (রসুল) নিকট থেকে সে জ্ঞান লাভ করেন ।

اشراط الساعة শীর্ষক انجاحا جه حاشيه ابن ماجه নামক গ্রন্থের অধ্যায়ে এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে ঃ-

اَخْبَرَ الصِّدِّيْقُ زَوْجَتَهٗ بِنْتَ خَارِجَةَ اَنَّهَا حَامِلَةٌ بِنْتٍ فَوُلِدَتْ بَعْدَ وَفَاتِهٖ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فَهٰذَا مِنَ الْفِرَاسَةِ وَالظَّنِّ وَيُصَدِّقُ اللّٰهُ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ

(হযরত সিদ্দীক আকবর (রাদিআল্লাহু আনহু) নিজের স্ত্রী বিনতে হারিজাকে বলছিলেন যে তিনি কন্যা সন্তান গর্ভধারণ করেছে। সিদ্দীক আকবরের ওফাতের পর উম্মে কুলসুম বিনতে সিদ্দীক জন্ম গ্রহণ করেন। এ খবরটি ছিল তার দিব্য জ্ঞান ও ধারণা প্রসুত। আল্লাহ তা'আলা মুমিনের দিব্য ধারণাকে সত্যে পরিণত করেন।

সৈয়দ শরীফ আবদুল আযীয মাসউদ كتاب الابريز নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ–

هُوَعَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ مِنْ شَيْئٍ مِنَ الْخَمْسِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الْاٰيَةِ وَكَيْفَ يَخْفٰى ذَالِكَ وَالْاَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ اُمَّتِهِ الشَّرِيْفَةِ يَعْلَمُوْنَهَا وَهُمْ دُوْنَ الْغَوْثِ فَكَيْفَ بِالْغَوْثِ فَكَيْفَ بِسَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ الَّذِىْ هُوَسَبَبُ كُلِّ شَيْئٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْئٍ

হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের কোনটিই গোপন নয়। এসব বিষয় তার সুদূর প্রসারী দৃষ্টি এড়াতে পারে কি ভাবে? যেখানে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের সাতজন কুতুবও এগুলো সম্বন্ধে অবগত। তাঁরা তো গাউছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিত। এখন গাউছের জ্ঞান সম্পর্কে কি বলা হবে? আর যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্ঞানী গুণীদের. সরদার, যিনি সমস্ত কিছুর মূল এবং যার থেকে সবকিছুই বিকশিত সে পবিত্র সত্ত্বার জ্ঞান সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করবেন?

আল্লামা জালাল উদ্দীন সয়ুতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) জামে সগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'রাওয়াযুন নযীরে এ হাদীছ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّاهُوَ مَعْنَاهُ بِاَنَّهٗ لَايَعْلَمُهَا اَحَدٌ بِذَاتِهٖ اِلَّاهُوَ لٰكِنْ قَدْ يَعْلَمُ بِهٖ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ فَاِنَّ ثَمَّ مَنْ يَعْلَمُهَا وَقَدْ وَجَدْنَا ذَالِكَ بِغَيْرِ وَاحِدٍ كَمَا رَئَيْنَا جَمَاعَةً عَلِمُوْا مَتٰى يَمُوْتُوْنَ وَعَلِمُوْامَافِى الْاَرْحَامِ

হুযুর আলাইহিস সালামের اِلَّاهُوَ বলার অর্থ হচ্ছে যে. সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া সত্ত্বাগতভাবে আর কেউ জ্ঞাত নয় তবে কখনো আল্লাহ কর্তৃক অবহিত করার ফলে জ্ঞাত হওয়া যায় । কেননা এখানে এমন বুযুর্গলোক আছেন যারা এগুলো সম্পর্কেও জানেন । এ ধরনের অনেক ব্যক্তি আমি দেখেছি। যেমন- আমি এমন এক সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাঁরা জানতেন, কখন তাঁরা ইনতিকাল করবেন। এমনিভাবে তারা গর্ভস্থিত শিশু সম্পর্কে জানতেন।)

এ আল্লামা জালালউদ্দীন সয়ুতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)"খসায়েস শরীফে " উল্লেখ করেছেন ঃ- عُرِضَ عَلَيْهِ مَا هُوَ كَائِنٌ فِىْ اُمَّتِهٖ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

(হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট সে সমস্ত বিষয় বা ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে, যা তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকবে ।

আল্লামা ইব্রাহিম বাইজুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শরহে কাসীদায়ে বুর্দার ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন

لَمْ يَخْرُجِ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّابَعْدَ اَنْ اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِهٰذِهِ الْاُمُوْرِ الْخَمْسَةِ

(হুযুর আলাইহিস সালাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে তশরীফ নিয়ে যাননি, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পঞ্চ বিষয়ের عُلُوْمِ خَمْسَةِ জ্ঞান দান করেন)।

জামেউন নিহায়া جمع النهاية গ্রন্থে আল্লামা শুনওয়ায়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেনঃ-

وَقَدْ وَرَدَانَّ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يُخْرِجِ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اَطْلَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ -

(এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ তা'আলা নবী অলাইহিস সালামকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাননি, যতক্ষণ না প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করেন।)

এ আল্লামা শুনওয়ায়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একই কিতাবে আরও বলেনঃ-

قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ لَايَعْلَمُ هٰذِهِ الْخَمْسَ عِلْمًا لِدُنِّيًا ذَاتِيًا بِلَا وَاسِطَةِ اِلَّا اللّٰهُ فَالْعِلْمُ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ مِمَّا اخْتَصَّ لِلّٰهِ بِهِ وَاَمَّا بِوَاسِطَهِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ

(কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, উক্ত পঞ্চ বিষয় علوم خمسة সম্পর্কে সত্ত্বাগত ও মাধ্যম বিহীন একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অবহিত নয়। এ রকম জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারটি কেবল আল্লাহর জন্য সীমিত। কিন্তু কোন মাধ্যম-সূত্রে লব্ধ জ্ঞান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নয়।)

'আরবায়ীনে ইমাম নববী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফুতুহাতে ওয়াহবিয়া'তে ফাযিল ইবন 'আতিয়া বলেছেনঃ-

اَلْحَقُّ كَمَا قَالَ جَمْعٌ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اَطْلَعَهُ عَلٰى كُلِّ مَا اَبْهَمَ عَنْهُ اِلَّا اُمِرَ بِكَتْمِ بَعْضٍ وَالْاِعْلَامِ بِبَعْضٍ -

(সঠিক কথা হলো, যা দ্বীনী মনীষীদের এক সম্প্রদায় বলেছেন-আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালামকে এ ধরাধাম থেকে নিয়ে যাননি, যতক্ষণ না যাবতীয় গুপ্ত ও রহস্যাবৃত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অবশ্য কোন কোন তথ্য গোপন রাখার ও কোন কোনটি ব্যক্ত করার জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন।)

শাহ আবদুল আযীয সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন'

নামক গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ-

نقل مي كند كه وا لد شيخ ابن حجر رافر زند نمی زيست كبيده خاطربحضور شيخ رسيد - شيخ فرمود كه از پشت تو فرزندے خواهد آمد كه بعلم خوددنيا راپركند خود دنيا را پركند

(বর্ণিত আছে যে, শাইখ ইবন হাজর (রহমতুল্লাহে আনহু) এর পিতার কোন সন্তান বাঁচতো না। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বীয় শাইখ সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁর শাইখ বললেন 'তোমার ঔরস থেকে এমন একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, যাঁর জ্ঞানালোকে সারা দুনিয়া উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।)

এতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চ জ্ঞানের علم خمسه সমর্থনে ঐতিহ্যগত বা কুরআন হাদীছে রিওয়ায়েতকৃত প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হলো। এর যুক্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ (আকলী-দলীল) হচ্ছে,ভিন্নমতাবলম্বীগণও একথা স্বীকার করেন যে, হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকূলের থেকে অনেক বেশী। এ তথ্যের উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে তাদের রচিত 'তাহযীরুন্নাস' নামক গ্রন্থ থেকে পেশ করেছি। এখন দেখতে হবে সৃষ্টিকূলের কাউকে উক্ত পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে কিনা।

মিশকাত শরীফের 'কিতাবুল ঈমান বিল কদর' এ আছে-হুযুর আলাইহিস সালাম মায়ের গর্ভে শিশুর শারীরিক গঠন প্রণালীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেনঃ-

ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحَ -

অতঃপর মহাপ্রতিপালক চারটি বিষয় সহকারে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তিনি সে শিশুর আমল, মৃত্যু, জীবিকা এবং সে সন্তান নেককার হবে, না বদকার হবে এ চারটি বিষয় লিখে যান। এরপর 'রূহ' ফুঁকে দেওয়া হয়।)

এগুলোও হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে বলতে হয়, বর্তমান ও বিগত সকল মানুষের এ চারটি বিষয়ে ভাগ্যলিপির লেখক ফিরিশতাও জ্ঞাত।

মিশকাত শরীফের একই অধ্যায়ে আছেঃ-

كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ سَنَةٍ -

(আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টিকুলের নিয়তি বা তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন।

বোঝা গেল যে, লওহে মাহফুজে উক্ত পঞ্চ বিষয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তা'হলে লওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ এবং অনুরূপ নবীগণ, এমন কি ওলীগণও যাদের দৃষ্টি লওহে মাহফুজের দিকে নিবদ্ধ থাকে, এ পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। মিশকাত শরীফের উক্ত 'কিতাবুল ঈমান বিল কদর' এ উল্লেখিত আছে যে, আল্লাহ কর্তৃক তার প্রভুত্বের স্বীকৃতি সূচক প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন يوم ميثاق হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে তাঁর সমস্ত আওলাদের রূহ গুলো সাদা-কালো বর্ণে দেখানো হয়েছিল। কালো রূহগুলো ছিল কাফিরদের, আর সাদাগুলো মুসলমানদের। মি'রাজের সময় হুযুর আলাইহিস সালাম হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কে এমন এক অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, যখন তাঁর ডান দিকে সাদা এবং বাম দিকে কালো বর্ণের রূহসমূহ বিরাজমান ছিল। অর্থাৎ বেহেশতী ও দোযখী লোকগণ তাঁর যথাক্রমে ডান ও বাম পার্শ্বে বিরাজমান ছিল। মুমিনদেরকে দেখে তিনি আনন্দিত, আর কাফিরদেরকে দেখে দুঃখিত হতেন। এ মিশকাত শরীফের 'কিতাবুল ঈমান বিল কদর'-এ আরও উল্লেখিত আছে যে, একদিন হুযুর আলাইহিস সালাম নিজের দু'হাতে দু'টো কিতাব নিয়ে সাহাবীদের সমাবেশে আগমন করেন। ডান হাতস্থিত কিতাব সম্পর্কে বলেন-এতে বেহেশতিগণের নাম, তাঁদের নিজ নিজ গোত্রের নাম সহ উল্লেখিত আছে, এবং অপর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে-সমস্ত দোযখবাসীর নাম, তাদের নিজ নিজ গোত্রের নামসহ। পরিশেষে সে সমস্ত নামের মোট সংখ্যা কত হবে, তার যোগফলও দেয়া হয়েছে।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা 'আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মিরকাত' গ্রন্থে বলেছেন-

اَلظَّاهِرُ مِنَ الْاِشَارَةِ اَنَّهُمَا حِسِّيَانِ وَقِيْلَ تَمْثِيْلٌ

হাদীছে ব্যবহৃত নির্দেশসূচক সর্বনাম (এ কিতাবটি-) থেকে একথাই বোঝা যায় যে, ওই কিতাবগুলো দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল) এ মিশকাত শরীফের 'কবরের আযাব' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তি যখন মুনকীর নকীর ফিরিশতাদ্বয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য বা অকৃতকার্য হয়, তখন ফিরিশতাদ্বয় বলেনঃ

قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا -

(আমরা আগেই জানতাম যে, তুমি এ রকম উত্তর প্রদান করবে।) বোঝা গেল যে, মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার পূর্বে উক্ত ফিরিশতাদ্বয় তার 'নেককার' ও 'বদকার' হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হন। পরীক্ষাটা নিছক কানুনের অনুসরণ বা কেউ যাতে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে মর্মে আপত্তি করতে না পারে, সে জন্য করা হয়ে থাকে। হাদীছ শরীফে আছে যে, কোন নেককার বান্দার সঙ্গে তার স্ত্রী দুনিয়াতে ঝগড়াঝাটি করলে, বেহেশত থেকে হুর ডাক দিয়ে বলে, "সে তোমার কাছে কয়েক দিনের মেহমান মাত্র। শীগগির সে আমাদের কাছে ফিরে আসবে। তাই তাঁর সাথে ঝগড়া করো না।" (মিশকাত শরীফের 'কিতাবুন নিকাহ ফি ইশরাতিন নিসা' দ্রষ্টব্য) উপরোক্ত হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, 'হুর'ও একথা জানতে পারে যে, সে ব্যক্তির পরিণাম ভালই হবে। হুযুর আলাইহিস সালাম বদর যুদ্ধের একদিন আগে যমীনের উপর রেখা অংকিত করে বলেন, এখানে অমুক কাফির, ওখানে অমুক কাফির মারা যাবে। (মিশকাত শরীফের কিতাবুল জিহাদ দ্রষ্টব্য) এতে বোঝা যায় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওদের মৃত্যুবরণের সুনির্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন।

উল্লেখিত হাদীছসমূহ থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কতেক প্রিয় বান্দাগণকেও উক্ত পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান-দান করেছেন। আর হুযুর আলাইহিস সালামের ব্যাপক জ্ঞান তাঁদের সবার সমষ্টিগত জ্ঞানের পরিধিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কিভাবে সম্ভব যে হুযুর আলাইহিস সালাম পঞ্চ জ্ঞানের অধিকারী হবেন না? এ থেকে এও প্রমাণিত হলো যে, পঞ্চ জ্ঞান খোদা প্রদত্ত ও অচিরন্তন হওয়ার কারণে আল্লাহর গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যথায়, কেউ এ জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও অধিকারী হতো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কোন গুণে আংশিক বা সামগ্রিকরূপে কারও শরীক হওয়া বৈধ হতে পারে না। এ সব দলীলের উত্তর প্রদান বিরোধী মতাবলম্বীদের পক্ষে ইনশা আল্লাহ সম্ভবপর হবে না।

وَمَايَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلَّااللّٰهُ (১৭)

কুরআনের বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের (মুতশাবিহাত আয়াতের) মর্ম আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।'

এ থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামের 'মুতশাবিহাত' আয়াতের লক্ষ্যার্থের জ্ঞান ছিল না।

উত্তরঃ এ আয়াতে এ কথা কোথায় বলা হলো যে, আমি (আল্লাহ) 'মুতশাবিহাত আয়াতের' জ্ঞান কাউকে প্রদান করিনি? মহাপ্রভু তো ইরশাদ করেছেন- اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ [দয়াবান আল্লাহ (নিজের প্রিয় বন্ধুকে) কুরআন শিখিয়েছেন।] যখন মহাপ্রভুই সমগ্র কুরআন হুযুরকে শিখিয়েছেন তখন মুতশাবিহাত আয়াতও নিশ্চয়ই শিখিয়েছিলেন এজন্য হানাফী মাযহাবের সর্বসম্মত 'আকীদা' হলো হুযুর আলাইহিস সালাম মুতশাবিহাত সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞাত, অন্যথায় সেগুলো নাযিল করাটাই অনর্থক হবে। শাফিঈ মাযহাবলম্বীদের মতে বিজ্ঞ আলিমগণও মুতশাবিহাত আয়াত সমূহের জ্ঞান রাখেন। তাঁরা আয়াত এর وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ পরেই বিরাম চিহ্ন তথা 'ওয়াকফ' আছে বলে মত পোষণ করেন এবং উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেন-মুতশাবিহার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ও বিজ্ঞ উলামা ছাড়া আর কেউ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের অস্বীকৃতিসূচক হাদীছসমূহের বর্ণনা)

ভিন্নমতাবলম্বীগণ অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকৃতির সমর্থনে অনেক হাদীছ উপস্থাপন করে থাকেন। সে সমস্ত দলীলের সার্বিক মোটামুটি উত্তর হলো, সেই হাদীছসমূহে হুযুর আলাইহিস সালাম কোথাও একথা বলেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে অমুক বিষয়ের জ্ঞান দান করেননি। বরং কোন হাদীছে আছে اَللّٰهُ اَعْلَمُ-(আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত), কোন জায়গায় আছে-'আমি কি জানি?' কোন জায়গায় উল্লেখিত আছে-'অমুক বিষয় সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম কিছুই বলেননি, আবার কোন জায়গায় আছে-'হুযুর আলাইহিস সালাম অমুক ব্যক্তির নিকট একথাটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এসব উক্তি থেকে ইলমে গায়েবের অস্বীকৃতি প্রকাশ পায় না। কোন কথা না বলা বা কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বা 'আল্লাহই অধিক জ্ঞাত' বলার

মধ্যে অনেক কল্যাণময় উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে। এমন অনেক বিষয় আছে, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছে ব্যক্ত করেননি, এমনকি প্রশ্ন করার পরেও সরাসরি উত্তর না দিয়ে গোপন রেখেছেন। আবার অনেক বিষয় সম্পর্কে বিশ্বপ্রতিপালক ফিরিশতাদেরকেও জিজ্ঞাসা করেন। তাহলে কি আল্লাহরও জ্ঞান নেই? দেখি, এমন একটি অকাট্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত সহীহ হাদীছ উপস্থাপন করুন, যেখানে ইলমে গায়ব প্রদান করার বিষয়টির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ইনশা .আল্লাহ, তারা কখনও উপস্থাপন করতে পারবেন না। এতটুকু উত্তরই যথেষ্ট ছিল। তবুও তাদের উল্লেখিত 'মশহুর' হাদীছসমূহ উল্লেখপূর্বক পৃথক পৃথকভাবে উত্তর প্রদানে প্রয়াস পাচ্ছি। وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقِ (আল্লাহর কাছেএর তওফীক প্রার্থনা করছি।

বিঃ দ্রঃ যে হাদীছ তাবেয়ী এবং তৎপরবর্তী অসংখ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যাঁদের সংখ্যাধিক্যের বিচার করলে উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত হয় এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না,এ ধরনের হাদীছকে 'হাদীছে মশহুর' বলা হয়।

১নং আপত্তিঃ 'মিশকাত শরীফের' ইলানুন নিকাহ اعلان النكاح অধ্যায়ের প্রথম হাদীছে আছে, হুযুর আলাইহিস সালাম কোন এক বিবাহ অনুষ্ঠানে তশরীফ নিয়েছিলেন, তথায় আনসারের কিশোরীগণ দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গের শোকগাঁথার গান গাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেউ এ পংক্তিটিও আবৃত্তি করেঃ-

وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ

(আমাদের মধ্যে এখন এক নবীও আছেন, যিনি আগামীকাল কি হবে, তা'ও জানেন)। তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করলেন-'একথা বাদ দাও, ওটাই গাইতে থাক, যা প্রথমে গাচ্ছিলে'। এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব ছিল না। যদি থাকতো তাহলে ওই মেয়েদের সে কথা বলার সময় বাঁধা দিতেন না। সত্যি কথা বলতে বাধা দিলেন কেন?

উত্তরঃ প্রথমতঃ চিন্তা করা দরকার যে, এ পংক্তিটি সে সব মেয়েরা নিজেরাই রচনা করেনি। কেননা ওই কন্যাদের পক্ষে কবিতা রচনা সম্ভব পর নয়। আর কোন কাফির বা মুশরিকও সেটি রচনা করেনি। কেননা, ওরা তো হুযুর আলাইহিস সালামকে নবী হিসেবে মানতো না। তাই নিঃসন্দেহে এটি কোন সাহাবীর রচিত কবিতারই পংক্তি হবে। এখন বলুন, ঐ কবিতা রচয়িতা সাহাবী (মা'আযাল্লা)

মুশরিক কিনা? আর হুযুর আলাইহিস সালাম উক্ত কবিতা রচয়িতাকে মন্দও বলেননি, কিংবা কবিতারও বিরূপ কোন সমালোচনা করেন নি। ওটা গাইতে বারণ করেছেন মাত্র। প্রশ্ন হলো, কেন বারণ করলেন? এর পেছনে চারটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ কেউ যদি আমাদের সামনে আমাদের প্রশংসা করে, তখন বিনয়াবনত কণ্ঠে আমরা বলি "আরে মিঞা! এ সব কথা বাদ দিন, অন্য কথা বলুন"। এখানেও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিনয় প্রকাশার্থে উপরোক্ত উক্তি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ হাস্য-কৌতুক ও গান-বাজনার পরিবেশের মধ্যে নাত'বা তাঁর প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। 'নাত' পাঠ এর জন্য আদব ও ভক্তির প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ গায়বকে তার নিজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধিত করাটাই তার পছন্দ হয়নি। চতুর্থতঃ আজকাল যেমন 'নাত' আবৃত্তিকারীগণ 'নাত' ও শোকগীতি এক সাথে মিলিয়ে পাঠ করে, সেরূপ শোকগীতির মধ্যখানে নাত পড়াটাই তাঁর অপছন্দ ছিল।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাতে' উক্ত হাদীছ প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ-

لِكَرَاهِيَةِ نِسْبَةِ عِلْمِ الْغَيْبِ اِلَيْهِ لِاَنَّهُ لَايَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّمَايَعْلَمُ الرَّسُوْلُ مِنَ الْغَيْبِ مَا اَعْلَمَهُ اَوْ لِكَرَاهِيَةِ اَنْ يُذْكَرَ فِى اَثْنَاءِ ضَرْبِ الدُّفِّ وَاَثْنَاءِ مَرْثِيَةِ الْقَتْلٰى لِعُلُوِّمَنْصَبِهِ مِنْ ذٰلِكَ

অর্থাৎ তার নিজের সত্ত্বার প্রতি ইলমে গায়বকে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত করাতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তা নিষেধ করছিলেন। কেননা অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে খোদা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না; রসুল জানেন সে সমস্ত অদৃশ্য বিষয় বা বস্তু, যা আল্লাহ অবহিত করেন। বা দফ বাজিয়ে অথবা নিহত ব্যক্তিবর্গের শোক গাঁথা গেয়ে তাঁর প্রশংসা করাটাই তাঁর অপছন্দ ছিল। কেননা, তাঁর মান মর্যাদা সে পরিবেশে প্রশংসিত হওয়ার সম্মানের চাইতে আরো অনেক বেশী।

'আশআতুল লম'আত' গ্রন্থে এ হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছে-

گفته اند که منع آنحضرت ازیں قول بجهت آنست که دروے اسناد علم غیب است به آنحضرت را ناخوش آمد وبعضے گوئیند که بجهت آں است که ذکر شریف وے در اثنا لهو مناسب نه باشد ، অর্থাৎ ভাষ্যকারগণ বলেন, হুযুর আলাইহিস সালাম ওটাকে এ জন্যই

নিষেধ করেছেন যে, উক্ত পংক্তিতে ইলমে গায়বকে সরাসরি হুযুরের সহিত সম্বন্ধিত করা হয়েছে। সুতরাং, এটা তাঁর পছন্দ হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, হাস্য কৌতুকের পরিবেশে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রশংসা সূচক উল্লেখ সমীচীন নয়।

২নং আপত্তিঃ মদীনা শরীফে আনসারের লোকেরা বাগানের মদ্দা খেজুর গাছের শাখা-প্রশাখা মাদ্দী গাছের সঙ্গে লাগিয়ে দিতেন, যাতে ফলন বেশী হয়। হুযুর আলাইহিস সালাম তাঁদেরকে এ কাজ করতে বারণ করেছিলেন। (এ কাজকে আরবীতে 'তালকীহ' تلقيح বলা হয়।) তখন তাঁরা এ পদ্ধতি (তালকীহ) ছেড়ে দিলেন। খোদার কি শান! ফলন কম হলো। এর অভিযোগ তাঁর সমীপে পেশ করা হলে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ

(তোমাদের পার্থিব বিষয়াবলীতে তোমরাই অধিক জ্ঞাত।)

বোঝা গেল 'তালকীহ' করা থেকে বিরত রাখলে যে ফসল কম হবে, সে জ্ঞান তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছিল না। অধিকন্তু আনসারদের জ্ঞান যে তাঁর থেকে বেশী, তাই প্রমাণিত হলো।

উত্তরঃ হুযুর আলাইহিস সালাম কর্তৃক 'তোমাদের পার্থিব কাজকর্মে তোমরা অধিক জ্ঞাত' একথা বলার মধ্যে বিরক্তি বা অসন্তোষই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন, যখন তোমরা ধৈর্যধারণ করছ না, তোমরাই তোমাদের ব্যাপারে ভাল জান। যেমন আমরা কাউকে কোন কথা বললে সে যখন এতে সাত পাঁচ চিন্তা করতে থাকে, তখন আমরা বলি, ভাই, তোমার ব্যাপার তুমিই জান। এরূপ উক্তির লক্ষ্যার্থ জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন নয়।

'শরহে শিফায়' মোল্লা আলী কারী (রহঃ) 'মু'জিযাত' শীর্ষক বর্ণনায় লিখেছেনঃ

وَخَصَّهُ اللّٰهُ مِنَ الْاِطِّلَاعِ عَلٰى جَمِيْعِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ وَاسْتُشْكِلَ بِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَدَ الْاَنْصَارَ يُلَقِّحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ لَوْ تَرَكْتُمُوْهُ فَتَرَكُوْهُ فَلَمْ يَخْرُجْ شَيْئًا - اَوْخَرَجَ شَيْصًا فَقَالَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ قَالَ الشَّيْخُ السَّنُوْسِيُّ اَرَادَ اَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلٰى خَرْقِ

اَلْعَوَائِدِ فِى ذَالِكَ اِلٰى بَابِ التَّوَكُّلِ وَاَمَّا هُنَا كَ فَلَمْ يَمْتَثِلُوْا فَقَالَ اَنْتُمْ اَعْرَفُ بِدُنْيَا كُمْ وَلَوِ امْتَثَلُوْا وَتَحَمَّلُوْا فِى سَنَةٍ اَوْسَنَتَيْنِ لَكُفُوْ اَمْرَ هٰذِهِ الْمِحْنَةِ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালামকে দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণময় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মনোনীত করেছে। এ নিয়ে এখন আপত্তি হচ্ছে যে, তিনি আনসারের লোকদের বৃক্ষরাজির তালকীহ করতে দেখে বলেছিলেন, এ অভ্যাস পরিত্যাগ করাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাই তাঁরা এ প্রথা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে কোন ফলন হলো না। বা ফলন কম হলো। তখনই (তাঁদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেনঃ তোমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে তোমরাই ভাল জান।' শাইখ সিন্নোসী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চেয়েছিলেন-তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত কাজ করে তাদেরকে নির্ভরশীলতার তোরণদ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে। কিন্তু তাঁরা ধৈর্যধারণ করলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, 'তোমরাই জান।' যদি তাঁরা এটি মেনে নিতেন এবং দু' এক বছর ক্ষতি স্বীকার করতেন, তাহলে এ অহেতুক পরিশ্রম থেকে রেহাই পেয়ে যেতেন।

মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একই 'শরহে শিফার' দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ-

وَلَوْ ثَبَتُوْا عَلٰى كَلَامِهٖ اَفَاقُوْا فِى الْفَنِّ تَقَعُ عَنْهُمْ كُلْفَةُ الْمُعَالَجَةِ

(যদি তাঁরা হুযুর আলাইহিস সালামের কথায় অবিচল থাকতেন, তাহলে সে বিষয়ে (ক্ষেতে উৎপাদনের) অনেক দূর এগিয়ে যেতেন এবং 'তাঁদের এ 'তলকীহ' এর কষ্টও দূরীভূত হয়ে যেতো।)

সু-প্রসিদ্ধ فصل الخطاب কিতাবে আল্লামা কায়সারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

وَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَتِهٖ وَاِنْ كَانَ يَقُوْلُ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ

যমীন ও আসমানে পরমাণুসম কোন বস্তুও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপক জ্ঞানের পরিধি বহির্ভূত নয়। যদিও বা তিনি বলতেন,

'দুনিয়াবী ব্যাপারে তোমরাই জান।

হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কখনও কৃষি কাজ করেননি, কৃষকদের সংশ্রবেও ছিলেন না। কিন্তু দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়ার আগেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বেশী করে গম চাষ করার জন্যে। আরও বলেছিলেনঃ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْبُلِهٖ (যা কর্তন করবে, তা খোসা ছাড়ানো ছাড়াই রক্ষিত করে রাখবে।) অর্থাৎ কৃষকদেরকেও গম সংরক্ষণের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। এখনও গমকে ভুষির মধ্যে রেখেই হিফাজত করা হয়। কৃষি কাজের এ গোপন বিষয় সম্পর্কে কিভাবে তিনি জ্ঞাত হলেন? তিনি বলেছিলেন

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ٥

(যমীনের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে আমাকে নিয়োজিত করুন, আমি এর হিফাজতকারী ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত)। এ সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কার থেকে শিখলেন তিনি? হুযুর আলাইহিস সালামের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান কি হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর চেয়েও কম? (মায়াযাল্লা!)

৩নং আপত্তিঃ 'তিরমিযী' শরীফের কিতাবুত তাফসীর-এর সুরা আনআমে আছে, হযরত মসরুক (রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লা আনহা) থেকে বর্ণনা করছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, হুযুর আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রভুকে দেখেছেন বা কোন কিছু গোপন করেছেন, তবে সে মিথ্যাবাদী। আরও বলেছেন-

وَمَنْ زَعَمَ اَنَّهٗ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ -

(এবং যে কেউ বলে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম আগামীকালের কথা বলতে পারেন, সে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করলো।

উত্তরঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহা) এর এ তিনটি উক্তি থেকে বাহ্যিক অর্থে যা বুঝা যাচ্ছে, তা মূল বক্তব্য নয়। এ উক্তিসমূহ তিনি নিজের রায়ের উপর ভিত্তি করেই করেছেন। এ বিষয়ে কোন 'মরফূ' হাদীছ (যা সনদের সূত্র হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছেছে) উপস্থাপন করেননি; তিনি বরং কুরআনের আয়াতের উপর ভিত্তি করেই স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। মহাপ্রভুকে দেখা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) যে

রিওয়ায়েত পেশ করেছেন, এখন পর্যন্ত এ তথ্যটি মুসলিম সমাজে সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে 'মাদারেজুন নাবুওয়াত' নসীমুর রিয়ায ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী ও আমার রচিত গ্রন্থ 'শানে হাবীবুর রহমানের' সুরা ওয়াননজমের' ব্যাখ্যায় বর্ণিত তথ্যসমৃদ্ধ পর্যালোচনা দেখুন। অনুরূপ, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহা) যে বলেছেন, হুযুর আলাইহিস সালাম কোন কিছু গোপন করেননি, তাঁর এ উক্তিতে প্রচারোপযোগী শরীয়তের নির্দেশাবলীর কথাই বলা হয়েছে। কেননা খোদার অনেক নিগূঢ় রহস্য তো মানুষের নিকট ব্যক্ত করেননি। 'মিশকাত শরীফ' এর কিতাবুল ইলম' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আবু হুরাইয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছেঃ তিনি বলেছেন, হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট থেকে আমি (হযরত আবু হুরাইরা) দু'ধরনের জ্ঞান লাভ করেছি, এক ধরনের জ্ঞান আমি প্রচার করেছি' দ্বিতীয় ধরনেরটা যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করি' তাহলে আপনারা আমার গলা কেটে দিবেন।

এ কথা থেকে বোঝা গেল যে, খোদার ভেদ সম্পর্কিত তথ্যাবলী অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে উদঘাটন করা হয়নি। অনুরূপ, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহা) যে বলেছেন, 'আগামীকালের কথা হুযুর আলাইহিস সালাম জানতেন না' এ কথার দ্বারা সত্ত্বাগত ভাবে না জানার কথাই বলা হয়েছে। অন্যথায়, তাঁর বক্তব্য অনেক হাদীছ ও কুরআনের আয়াতের বিপরীত প্রতিপন্ন হবে। হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামত, দাজ্জাল' ইমাম মাহদী (আলাইহিস সালাম) 'হাউজে কাউছার', শাফায়াত, এমন কি হযরত হুসাইন (রাদিআল্লাহু আনহু) এর শাহাদত বরণ, বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কাফিরদের নিহত হওয়া ও তাদের নিহত হওয়ার স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। আরও মজার ব্যাপার যে, যদি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহা) এর উক্তির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা ভিন্নমতাবলম্বীদের ধ্যান ধারণারও বিপরীত হয়ে যাবে। কেননা তারাও তো অনেক অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞানের কথা স্বীকার করে থাকেন, অথচ এখানে সে বিষয়ের সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হচ্ছে। আজ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার হবে, সূর্য উদিত হবে, রাত আসবে এগুলোও তো আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীর জ্ঞানের সাথেই সম্পৃক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহা) অবশ্য হুযুরের স্বশরীরে মি'রাজের ঘটনাকেও অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এর উত্তরে বলা হয় যে, মিরাজের ঘটনা তাঁর বিবাহের আগেই সংঘটিত হয়েছিল, যার জন্য এ বিষয়টি তাঁর জ্ঞানানুভূতিতে আসেনি।

৪নং আপত্তিঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাদিআল্লাহু আনহা) গলার হার হারানো গিয়েছিল, জায়গায় জায়গায় তল্লাসী করানোর পরেও এর হদিস পাওয়া

যায়নি। অবশেষে উটের নিচ থেকেই সেটি উদ্ধার করা হয়। যদি হুযুর আলাইহিস সালামের অদৃশ্য জ্ঞান থাকতো অনুসন্ধানকারী লোকদেরকে সে সময় কেন বললেন না যে, হার ওখানে আছে? অতএব বোঝা গেল যে, সে সম্পর্কে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জ্ঞাত ছিলেন না।

উত্তরঃ এ হাদীছ থেকে তাঁর না বলাটাই বোঝা যায়, না জানার ব্যাপারটি প্রতীয়মান হচ্ছে না। আর না বলার পেছনে অনেক রহস্য থাকে। সাহাবায়ে কিরামদের কেউ কেউ চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহান প্রতিপালক তা বলেননি। তাহলে কি আল্লাহ তা'আলারও জানা ছিল না? খোদার ইচ্ছা ছিল, সিদ্দীকার (রাদিআল্লাহু আনহু) হার হারিয়ে যাক, মুসলমানগণ ওটার তল্লাশী করতে করতে এখানে সাময়িক অবস্থান করুক, যুহরের সময় হোক; পানি পাওয়া না যাক। তখনই হুযুর আলাইহিস সালামের খেদমতে আরয করা হোক যে, তাঁরা এখন কি করবেন। এ প্রেক্ষাপটে আয়াত তায়াম্মুম নাযিল হোক, ফলস্বরূপ হযরত সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর মাহাত্ম্য বিকশিত হোক। কিয়ামত পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে আগমনকারী মুসলমানগণ একথাটি অনুধাবন করুক যে, তাঁরই বদৌলতে আমরা তায়াম্মুমের নির্দেশ পেলাম। যদি তখনই হারের কথা বলে দেয়া হতো, তাহলে 'আয়াতে তায়াম্মুম' নাযিল হতো কি জন্য? মহা প্রতিপালকের কর্মকাণ্ড তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ থেকেই উদ্ভুত হয়ে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় যে, যে নয়ন কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থা অবলোকন করে, সেই নয়নের কাছে উটের নিচে চাপাপড়া কোন বস্তু গোপন থাকতে পারে কিভাবে? খোদা, মাহবুব আলাইহিস সালামের শান-মান অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন।

৫নং আপত্তিঃ মিশকাত শরীফ الحوض والشفاعة শীর্ষক অধ্যায়ে আছেঃ

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ

(হাউজে কাওছারের' কিনারায় আমার কাছে এমন কোন কোন সম্প্রদায় আসবে, যাদেরকে আমি চিনি, আর তারাও আমাকে চিনে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝখানে দৃষ্টি প্রতিরোধক যবনিকা খাড়া করে দেয়া হবে। আমি তখন বলবো, এরা আমার লোক। এর প্রত্যুত্তরে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার

পরে তারা কি ধরনের নতুন নতুন কার্যাবলী উদ্ভাবন করেছে। অতঃপর আমি বলবো দূরে যাক, দূরে যাক সে ব্যক্তি, যে আমার পরে ধর্মকে পালটিয়ে দিয়েছে।)

এ থেকে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন আপন পর, মুমিন ও কাফিরকে চিনবেন না। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উক্ত ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে বলবেন, 'এরা আমার সাহাবা, আর ফিরিশতাগণ বলবেন, আপনি জানেন না।'

উত্তরঃ হুযুর আলাইহিস সালামের ওদেরকে সাহাবা বলার উদ্দেশ্য হবে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশ করা, অর্থাৎ বিদ্রূপের সুরে বলা হবে যে ওদেরকে আসতে দাও। ওরাতো আমার বড় অকপট সাহাবা।' আর ফিরিশতাগণের এ রকম আরয করার উদ্দেশ্য হবে ওদেরকে সেকথা শোনায়ে বিষণ্ণ করা। তা' না হলে ফিরিশতাগণ ওদেরকে এ পর্যন্ত আসতে দিবেন কেন? যেমন কুরআন করীমে আছে জাহান্নামী কাফিরকে বলা হবেঃ

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمِ

(শাস্তির মজা বুঝ, তুমি তো মেহেরবান ও সম্মানিত ব্যক্তি।) হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও সূর্যকে দেখে বলেছিলেন- – هٰذَا رَبِّىْ (এই আমার প্রতিপালক)। এখানে আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো যে, এখন তো (হাদীছ বর্ণনার সময়)হুযুর আলাইহিস সালাম এ সম্পর্কিত ঘটনা সম্পর্কে অবগত এবং বলছেন। اَعْرِفُهُمْ (আমি তাদেরকে চিনি।) তাহলে কি সে দিন ভুলে যাবেন? উপরন্তু, কিয়ামতের দিন মুসলমানদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে। যেমন ওযুর সময় ধোয়া হয় এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ উজ্জ্বলরূপে ভাস্বর হওয়া, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হওয়া, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ (সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হবে, আর অনেকের চেহারা কাল, মলিন দেখাবে।) ডান হাতে আমলনামা থাকা, কপালে সিজদার চিহ্ন প্রতিভাত হওয়া ইত্যাদি।

(মিশকাত শরীফের কিতাবুস সালাত দেখুন) আর কাফিরদের আলামত হবে বর্ণিত লক্ষণসমূহের উলটোটাই। সে সব লোকদেরকে ফিরিশতা কর্তৃক বাধা প্রদানই হবে। তাদের ধর্মত্যাগী হওয়ার বিশেষ আলামত, যেটির বিবরণ আজ (হাদীছ বর্ণনার দিন) দেওয়া হচ্ছে। এর পরেও কি কারণ থাকতে পারে যে, এতগুলো আলামত থাকা সত্ত্বেও হুযুর আলাইহিস সালাম তাদেরকে চিনবেন না? আর এখানেতো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জান্নাত ও দোযখবাসী লোকদের কথা বলে দিচ্ছেন, আশারায়ে মুবাশশারার জান্নাতবাসী হওয়ার শুভ সংবাদ দিচ্ছেন এবং দু'টো কিতাব সাহাবা কিরামকে দেখাচ্ছেন, যেখানে বেহেশতী ও দোযখীদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাহলে সেখানে না চেনার কি অর্থ হতে পারে? হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকুলের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী। ফিরিশতারা যখন জানেন যে ওরা ধর্মত্যাগী, তাহলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সে বিষয়ে অনবিহিত থাকবেন কি করে? এ প্রসঙ্গে মহা প্রতিপালক কি বলছেন দেখুনঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ

(পাপীষ্ঠদেরকে তাদের লক্ষণসমূহ দ্বারা চিনা যাবে।) আরও বলেনঃ–

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ –

অর্থাৎ তাঁদের (মুসলমানগণের) চেহারায় বিদ্যমান থাকবে সিজ্‌দার ফলে উদ্ভুত চিহ্নসমূহ। এখন বোঝা গেল যে, কিয়ামতের দিন নেক ও বদকার লোকদের আলামত সমূহ তাদের চেহারায় ভেসে উঠবে।

মিশকাত শরীফ এর الخوص والشفاعة অধ্যায়ে আরও আছেঃ-বেহেশতী মুসলমানগণ জাহান্নামী মুসলমানদেরকে বের করার জন্য জাহান্নামের দিকে যাবেন এবং জাহান্নামীদের কপালে সিজদার চিহ্নসমূহ দেখে (জ্বলে পুড়ে যথোপযুক্ত শাস্তি লাভের পর) বের করে নিয়ে আসবেন। ওদেরকে (বেহেশতী মুসলমান) আরও বলা হবেঃ

فَمَنْ وَجَدْ تُمْ فِىْ قَلْبِه مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوْهُ

(যার অন্তরে পরমাণুসম ঈমান দেখবে; ওকেও বের করে নিয়ে যাও।)

এখন দেখুন! বেহেশতী মুসলমানগণ দোযখী মুসলমানদের অন্তর্নিহিত ঈমানের পরিচয় পাচ্ছেন। বরং তাঁরা এও জানেন যে, কার অন্তরে কোন্ স্তরের ঈমান রয়েছে-দীনার সমপরিমাণ, নাকি বালিকণা সমতুল্য। আর হুযুর আলাইহিস সালামের চেহারা দেখে বা অন্যান্য আলামত দেখেও জানবেন না। (?) যে, এ মুসলমান, না কাফির। আল্লাহ, তাদেরকে উপলব্ধি করার শক্তি দান করুন।

৬নং আপত্তিঃ বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের 'কিতাবুল জানায়েযে' হযরত উম্মুল

আলা (রাদিআল্লাহু আনহা) এর বর্ণিত রিওয়ায়েত আছেঃ وَاللّٰهُ مَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ (খোদার কসম, আমি আল্লাহর রসুল হয়েও জানি না আমার সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করা হবে।

এতে বুঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম নিজের এ খবরও জানেন না যে, কিয়ামতের দিন তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে।)

উত্তরঃ এখানে তাঁর জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়নি। বরং দিরায়াত বা ধারণা ও অনুমান ভিত্তিক জ্ঞানের অস্বীকৃতিই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হচ্ছে আমি ধারণা বা অনুমান করে বলতে পারি না যে, আমার সাথে কি ধরনের আচরণ করা হবে, কেননা, এর সম্পর্ক হচ্ছে ওহীর সাথে। তাই, হে উম্মুল 'আলা, তুমি যে উছমান ইবন মযউন সম্পর্কে নিছক অনুমান করে তাঁর বেহেশ্‌তী হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছ,তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়ের ব্যাপারে নবীগণও অনুমান বা আন্দাযের ভিত্তিতে কোন কথা বলেন না। এরূপ ভাষ্যগ্রহণ না করলে মিশকাত শরীফের فضائل سيد المرسلين অধ্যায়ে যে উল্লেখিত আছে 'আমি আদম সন্তানদের সরদার, সেদিন প্রশংসার ঝাণ্ডা (لواء الحمد) আমার হাতেই থাকবে। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও সকল আদম সন্তান আমার পতাকাতলে অবস্থান করবেন" এ হাদীছটির সহিত আলোচ্য হাদীছের সমন্বয় সাধন হবে কি রূপে?

৭নং আপত্তিঃ বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে 'কিতাবুল মগাযি' এর হাদীছে ইফক' অধ্যায়ে আছেঃ হযরত সিদ্দিকা (রাদিআল্লাহু আনহু) কে অপবাদ দেয়া হয়েছিল। এ জন্য তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) খুবই চিন্তিত হলেন বটে। কিন্তু ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত রটানো ঘটনাা সত্যাসত্য সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞানের অধিকারী হতেন, তাহলে এত বিষণ্ণতা কেন? এতদিন যাবৎ নীরবতা অবলম্বন করলেনই বা কেন?

উত্তরঃ এখানেও না বলাটাই প্রতীয়মান হচ্ছে, না জানাটাই নয়। না বলার দ্বারা না জানাটাই প্রমাণিত হয় না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও অনেকদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর নিষ্কলুষতা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেননি। তাহলে কি আল্লাহরও খবর ছিল না? অধিকন্তু, বুখারী শরীফের উক্ত হাদীছেই আছেঃ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا (আমি আমার সহধর্মিনীকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিনী হিসেবে জানি)।

এতে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটি তাঁর জ্ঞাত ছিল, তবে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে

তা প্রকাশ করেননি। আর এতো হতেই পারে না যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহু) সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে বলেছেনঃ

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ-

অর্থাৎ মুসলমান নর-নারীগণ এ ঘটনা শোনার পর অন্তরে কেন ভাল ধারণা পোষণ করলো না, এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন বলে দিল না যে, এটা সুস্পষ্ট দুরভিসন্ধিমূলক অপবাদ।

জানা গেল যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর কলুষতামুক্তি বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে থেকেই মুসলমানদের জন্য তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব ও খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম ছিল। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিষ্পাপ বিধায় হারামের ছোয়া থেকে পবিত্র ছিলেন। তাই খারাপ ধারণা আদৌ পোষণ করতে পারেন না তিনি। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে – هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ (এটা স্পষ্ট রটানো অপবাদ) কথাটি বলে দেওয়া তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলআইহি ওয়াসালাল্লাম) উপর ওয়াজিব ছিল না। যেহেতু এটা ছিল তাঁর নিজস্ব পরিবারের ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হলো, বিষন্নতা ও দীর্ঘকাল নীরবতা অবলম্বনের হেতু কি? চিন্তিত হওয়ার কারণ মা'আযাল্লাহ', অজ্ঞানতা নয়। যদি কোন সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হয়, আর অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই জানেন যে, সে অভিযোগ ভিত্তিহীন, তথাপি তিনি নিজের মানহানির আশংকায় চিন্তিত, উদ্বিগ্ন থাকেন। জনগণের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ায় ছিল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিষণ্ণতার মূল কারণ। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সংশ্লিষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা না করে সাথে তাঁর (হযরত আয়েশা (রাদিআল্লাহু আনহু) নিষ্কলংক হওয়ার কথা ঘোষণা করতেন, তখন মুনাফিকগণ স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের আর এক অপবাদ রটাতো; অপবাদের মাসআলা সমূহ মুসলমানদের অজানা থেকেই যেতো; অজানা থাকতো মামলা মুকাদ্দমা তদন্ত করার প্রক্রিয়া ও রীতিনীতি। অধিকন্তু, ধৈর্যধারণের জন্য হযরত সিদ্দীকাতুল কুবরা (রাদিআল্লাহু আনহু) যে ছওয়াব লাভ করেছেন, তা থেকে বঞ্চিত হতেন। সুতরাং, এ দীর্ঘ নীরবতার পেছনে অনেক রহস্য রয়েছে, আর এতো আকাইদের একটি অনস্বীকার্য মাসআলা যে, নবীর স্ত্রী ব্যভিচারিনী হতে

পারেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ-

اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ

(দুঃশ্চরিত্র নারীগণ দুঃশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য, আর দুঃশ্চরিত্র পুরুষগণ দুঃশ্চরিত্র নারীদের জন্য।)

এ খবীছ দুঃশ্চরিত্র শব্দটি প্রয়োগ করে যেনার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ নবীর স্ত্রী যেনাকারিনী হতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, কাফির হতে পারেন। কুফর একটি জঘন্য অপরাধ বটে, কিন্তু ঘৃণ্য ও লজ্জাকর বিষয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি এটিকে লজ্জাকর ব্যাপার মনে করে না। কিন্তু যেনাকে প্রত্যেকেই লজ্জাকর ও ঘৃণ্য আচরণ বলে ধরে নেয়। এ জন্য নবীগণের স্ত্রীদের কখনো স্বপ্নদোষ হয় না। মিশকাত শরীফের 'গোসল' শীর্ষক আলোচনা দেখুন, যেখানে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহু আনহু) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, যখন তিনি শুনলেন যে নারীর স্বপ্নদোষ হয়। এ সম্পর্কে আমার রচিত কিতাব 'শানে হাবিবুর রহমানে' ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখন বলুন, হুযুর আলাইহিস সালামের আকীদা সম্পর্কিত এ মাসআলাটিও কি জানা ছিল না যে সায়্যিদুল আম্বিয়ার স্ত্রী হযরত সিদ্দীকা (রাদিআল্লাহু আনহু) পবিত্র বিধায় তাঁর দ্বারা এ অপরাধ কিছুতেই সংঘটিত হতে পারে না? অধিকন্তু খোদার মর্জি ছিল যে, মাহবুব আলাইহিস সালামের প্রিয়তমার পবিত্রতার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সরাসরি দিবেন এবং কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করে কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মুসলমানের মুখেই তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করাতে থাকবেন। যেমন প্রত্যেক নামাযীই নামাযসমূহে তাঁর পবিত্রতার জয়গান গেয়ে থাকে। হুযুর আলাইহিস সালাম নিজেই যদি তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করতেন" তাহলে এতগুলো তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়াবলী প্রকাশ পেতো না। আসল কথা হলো, সে সম্পর্কে অবহিত নিশ্চয়ই ছিলেন তিনি, কিন্তু প্রকাশ করেননি।

এখানে মজার ব্যাপার যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ব্যাপারেও যুলেখা অপবাদ রটিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন নি, বরং একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাধ্যমে নিষ্কলুষ হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। হযরত মরিয়াম (আঃ) কেও অপবাদ দেয়া হয়েছিল। তখন দুগ্ধপোষ্য 'রূহুল্লাহর' মাধ্যমে তাঁর সতীত্বের বিষয়টি উদঘাটন করেছেন। কিন্তু মাহবুব আলাইহিস সালামের প্রিয়তমা স্ত্রীর যখন বদনাম রটলো, তখন কোন শিশু বা ফিরিশতার মাধ্যমে তার কলুষমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করাননি, বরং এর সাক্ষ্য দিয়েছেন

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং এ সাক্ষ্যকে কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিণত করে দিলেন, যাতে তা ঈমানের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং হুযুর আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট কতটুকু প্রিয়, সে বিষয়টি সৃষ্টিকূলের নিকট প্রকাশ পায়।

বিঃ দ্রঃ অজ্ঞতা جهل ভুলে যাওয়া, نسيان তৎক্ষণাৎ মনে না'আসা, ذهول এ তিনটি প্রায় সামার্থক শব্দের অর্থে কিছুটা পার্থক্য আছে। অজ্ঞতার অর্থ না জানা, ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো কোন বিষয় সম্পর্কে জানার পর তা স্মৃতিতে না থাকা। আর ৩য় শব্দটির অর্থ হলো কোন বিষয় স্মরণে আছে কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নেই। ধরুন এক ব্যক্তি কুরআন পড়েনি, দ্বিতীয় ব্যক্তি তা হিফজ করে পরে ভুলে গেছে, তৃতীয় ব্যক্তি পূর্ণরূপে হাফিজে কুরআন। কিন্তু কোন এক সময় তাকে কোন আয়াত জিজ্ঞাসা করা হলো কিন্তু তিনি তা বলতে পারলেন না, কেননা সেদিকে তার মনোযোগ ছিল না। এখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে 'অজ্ঞ' جاهل দ্বিতীয় ব্যক্তি 'স্মরণ শক্তিহীন' ناسى আর তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি অন্যদিকে নিবিষ্ট হওয়ার কারণে তৎক্ষণাৎ আলোচ্য বিষয়টি স্মরণ করতে অপারগ (ذاهل) আম্বিয়া কিরামগণ কোন কোন সময় বিশেষ কোন বিষয় ভুলে যেতে কিংবা তাদের স্মরণ না থাকতে পারে। কিন্তু এ ভুলে যাবার ঘটনাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়না। কুরআন করীমে সয়্যিদুনা হযরত আদম (আঃ) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (তিনি ভুলে গিয়েছিলেন,কিন্তু আমি তার মধ্যে কৃত কর্মের অটল প্রত্যয় পাইনি।) লওহে মাহফুজের প্রতি হযরত আদম (আঃ) এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাঁর যাবতীয় অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী তাঁর দৃষ্টির পরিধির মধ্যে ছিল। কিন্তু খোদার ইচ্ছায়, কিছুক্ষণের জন্য ওই সব ভুলে গিয়েছিলেন (স্মৃতিপটে জাগরুক ছিল না।)

কিয়ামতের দিন হাদীছবেত্তা, তাফসীরকারক ও ফিকহশাস্ত্রবিদ সহ সমস্ত মুসলমানগণ সুপারিশকারীর সন্ধানে নবীগণের (আঃ) কাছে গিয়ে বলবেনঃ 'আপনি আমাদের সুপারিশ করুন'। কিন্তু কেউ না সুপারিশ করবেন, না শফীউলুযনিবীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সঠিক ঠিকানা বাতলে দেবেন। স্মৃতিচারণ করে বলবেন, হযরত নুহ (আঃ) এর কাছে যাও, ওখানে যাও, সম্ভবতঃ তিনিই তোমাদের সুপারিশ করবেন। অথচ দুনিয়াতে থাকাকালীন সবই এ আকীদাই পোষণ করতেন এবং এখনও করেন যে শফীউল মুযনিবীন হচ্ছেন– প্রিয় নবী হুজুর

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালাল্লাম)। এটাই হলো অন্যমনস্কতা।

ذهول অর্থাৎ ওই আসল কথাটি স্মৃতি পটে না থাকা। অদ্রূপ যদি হুযুর আল-ইহিস সালাম কোন সময় কোন বিষয় কিছু না বলেন, তাহলে তার কারণ হতে পারে সে বিষয়টির খেয়াল না থাকা। এতে তাঁর অজ্ঞানতা প্রতীয়মান হয় না। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেখুন আল্লাহ তা' আলা ইরশাদ করেন وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ (যদিওবা এর আগে আপনি হযরত ইউছুফ (আঃ) এর ঘটনার ব্যাপারে গাফিল তথা অমনোযোগী ছিলেন। এ আয়াতে দেখুন, 'গাফিল' (অমনোযোগী) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। রব তা'আলা এখানে জাহিল' (অজ্ঞ) শব্দ বলেননি। 'গাফিল' ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে অবহিত, কিন্তু জ্ঞাত বিষয়ের দিকে মনোযোগী নয়।

প্রসিদ্ধ ফার্সী কাব্যগ্রন্থ 'গুলিস্তাঁ'য় উল্লেখিত আছেঃ কেউ হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی

چرادر چاہ کنعانش ندیدی ،

আপনি সুদূর মিসর থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জামার খুশবু পেলেন,কিন্তু 'কানআনের ' (বর্তমান লেবানন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) কূপে থাকতে তাঁকে (হযরত ইউসুফ (আঃ)) দেখলেন না কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ–

بگفت احوال مابرق جہاں است

دمے پیدا و دیگردم نہاں است،

گہے بر طارم اعلی نشینیم،

گہے برپشت پائے خود نہ بینیم

(তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকানোর মত– চমক দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর মুহূর্তেই দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কোন সময় সর্বোচ্চ আসনে আসীন হই, আবার কখনো নিজের পায়ের উপরিভাগও দেখতে পাই না) কুরআনী আয়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর জানা ছিল যে, কানআনের চাঁদ মিসরেই আলো বিতরণ করছেন। তিনি বলছেনঃ

وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ(খোদার পক্ষ থেকে আমি ওইসব বিষয়ে জ্ঞাত, যা তোমাদের জানা নেই।)

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' দ্বাদশ পারার আয়াত وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর প্রিয়জনদের কান্নাকাটি খুবই পছন্দনীয়। হযরত নূহ (আঃ) এত অধিক কান্নাকাটি করেছেন, যার জন্য 'নূহ' নামকরণ করা হয়েছে-অর্থাৎ ক্রন্দনকারী। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর কান্নাকাটির বাহ্যিক উপলক্ষ ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বিচ্ছেদ। আসলে এ কান্নাকাটিই ছিল সম্মান ও মরতবার সুউচ্চ আসনে আসীন হওয়ার কারণ। সুতরাং, সে কান্না হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণে ছিল না, বরং আসল কথাই হচ্ছে- اَلْمَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيْقَةِ

('মাজায' হচ্ছে 'হাকীকতের' সেতু সদৃশ।) অর্থাৎ-বাহ্যিক অপ্রকৃত অবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। সুবিখ্যাত 'মছনবী' শরীফে আছেঃ-

عشق لیلی نیست ایں کار نست،

حسن لیلی عکس رخسار نست،

خوش بیاید نالئہ شب ہائے تو،

ذوقہادرام بیار بہائے تو

অর্থাৎ লায়লার প্রতি ইশক মহব্বতই আসল ব্যাপার নয়, লায়লার সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত প্রেমাষ্পদের চেহারার প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত। মজনুনের হাহুতাশ, কান্নাকাটি থেকে আসল প্রেমাষ্পদই আনন্দানুভূতি লাভ করে, শ্বাশ্বত প্রেমের রসাস্বাদন করে।)

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিন ইয়ামীনকে বাহানা করে মিসরে আটকে রেখেছেন। তাঁর ভায়েরা ফিরে এসে শপথ করে বললেন এবং তাদের বক্তব্যের সমর্থনে মিসরগামী কাফেলাভুক্ত লোকদের সাক্ষ্যও পেশ করলেন যে, বিন ইয়ামীনকে মিসরে রাজবন্দী হিসেবে আটক করা হয়েছে। কিন্তু তিনি (হযরত ইয়াকুব আঃ) বললেন-

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا–

(তোমরা বরং এক মনগড়া বাহানা উপস্থাপন করছ।) অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন-ইউসুফ (আঃ)-কে আমার ছেলেরাই আমার থেকে পৃথক করেছে এবং বিন ইয়ামীনকেও আমার সন্তান তথা হযরত ইউসুফ (আঃ) বায়ানা করেই আটকে রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আসল ঘটনাটা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। পক্ষান্তরে বাহ্যিকভাবে একথাই বোঝা যায় যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দু'সন্তান

বিন ইয়ামীন ও য়াহুদা মিশরে রয়ে গেছেন। কিন্তু, তিনি (হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) ফরমাচ্ছেন

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا

(অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা সে তিনজনের সাথে আমার মিলন ঘটাবেন। এ তৃতীয়জন ছিল কে? এ তৃতীয়জন হযরত ইউসুফ (আঃ) ই তো ছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, যখন যুলেখা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর নিকট ঘরের দরজা বন্ধ করে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন ঐ বন্ধ ঘরে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কাছে হযরত ইয়াকুব (আঃ) উপস্থিত হয়ে দাঁতের মাঝে আঙ্গুলী দাবিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করলেন 'কখনই না, হে বৎস! এ ঘৃণ্য কাজ তোমাকে শোভা পায় না। তুমি 'একজন নবীর সন্তান।' এ বিস্ময়কর ঘটনাকে কুরআন শরীফ এভাবে ব্যক্ত করেছে

وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

তিনিও যুলেখার প্রতি আকৃষ্ট হতেন, যদি না তিনি খোদার এ দলিল দেখতেন।)

আরও স্মর্তব্য যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা খবর দিলেন যে, তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু পুত্রের সার্ট দেখে ও বাঘের খবরের ভিত্তিতে ওদের মিথ্যা বলার বিষয়টি তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। বাঘ আরয করছিল 'আমাদের জন্য নবীগণের মাংস ভক্ষণ হারাম।' (তাফসীরে খাযেন ও 'রূহুল বয়ানে' সুরা ইউসুফের তফসীর দেখুন।) পুত্রদের এ লোমহর্ষক খবরের পরেও প্রিয় সন্তানের সন্ধানে তিনি জঙ্গলে গেলেন না কেন? বোঝা যায় যে তিনি উক্ত বিষয়ে অবহিত ছিলেন, কিন্তু রহস্য উদঘাটন করেননি। তিনি জানতেন, তাঁর প্রিয় সন্তানের সাথে সাক্ষাত হবে। অনুরূপ, হযরত ইউসুফ (আঃ)ও অনেক সুযোগ পেয়েও নিজের বাপকে নিজের খবর দেননি। বোঝা যায়, হুকুমের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। এখন ভেবে দেখুন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজের সন্তানদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড অবলোকন করলেন, আর হুযুর আলাইহিস সালাম হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর পূত পবিত্র কন্যা হযরত সিদ্দীকার (রাঃ) অবস্থা সম্পর্কে বুঝি অনবহিতই ছিলেন! যাঁকে আল্লাহ তাআলা এত কিছু দিয়েছেন, তাঁকে এমন সংযম ও ধৈর্য শক্তিও দিয়েছেন, যাতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দেখেও খোদার ইচ্ছা ব্যতিরেকে গোপন তথ্য ফাঁস না করেন। اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ (আল্লাহ এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত যে তার রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় বা কাকে অর্পণ করা হবে।) আমার এ বক্তব্যটুকু স্মরণ রাখলে ইনশা আল্লাহ অনেক কাজে আস্‌বে।

৮নং আপত্তিঃ হাদীছ শরীফে আছে-হুযুর আলাইহিস সালাম তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে মধু পান করেছেন। এতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরয করলেন, হে

আল্লাহর হাবীব, আপনার পবিত্র মুখ থেকে মুগফুরের (এক ধরনের গাছ নিঃসৃত আঠাযুক্ত পানীয়) গন্ধ আস্‌ছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমান 'আমিতো মুগফুর ব্যবহার করিনি, মধুই পান করেছি'। এর পর হুযুর নিজের জন্য মধুকে হারাম করে ফেললেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলো لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (আল্লাহ যা' আপনার জন্য হালাল করেছেন, তা কেন হারাম হিসেবে গণ্য করছেন?) বোঝা গেল যে, তাঁর নিজের মুখ থেকে কোন গন্ধ বেরুচ্ছে কিনা সে খবরও তাঁর ছিল না।

উত্তরঃ এর উত্তর সেই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ (হে হাবীব, আপনার এ হারাম করাটা আপনার অজান্তে সম্পন্ন হয়নি, বরং হারাম করছেন আপত্তি উত্থাপন কারিনী স্ত্রীগণের সন্তুষ্টির জন্যে।) অধিকন্তু, নিজের মুখের গন্ধ অদৃশ্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত নয়। তা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যা যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করে থাকে। দেওবন্দীগণ নবীগণের ইন্দ্রিয়কেও অপরিপূর্ণ ও খুতযুক্ত বলে ধরে নিয়েছেন নাকি? তাঁদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি সম্পর্কে মওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন-

نطق آب ونطق خاك ونطق گل
ہست محسوس از حواس اہل دل ،
فلسفی گو منکر حنّانه است
ازحواس اولیا بیگانه است

(মাটি, কাদা ও পানির ভাষা রূহানী শক্তি সম্পন্ন লোকেই বুঝতে পারেন। দার্শনিকগণ 'উসতুনে হান্নানার' বিলাপকে অস্বীকার করেন বটে, তবে ওলীগণের ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।)

৯নং আপত্তিঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যদি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতেন তাহলে খায়বরে বিষ মিশানো মাংস খেলেন কেন? আর যদি জেনে শুনেই খেয়ে থাকেন, তাহলে এটা আত্মহত্যার অপচেষ্টা, যা নবীর ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না।

উত্তরঃ সে সময় হুজুর আলাইহিস সালামের একথা জানা ছিল যে, মাংসে বিষ মিশ্রিত আছে, আর এও জানা ছিল যে, খোদার হুকুমে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উপর সে বিষ কার্যকরী হবে না। একথাও জানা ছিল যে, মহামহিম প্রভুর ইচ্ছা যে তিনি বিষ খান, যাতে ওফাতের সময় বিষের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, ফলস্বরূপ শাহাদত জনিত ওফাতের ভাগী হন। তাই প্রতিপালকের ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকাই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য।

১০নং আপত্তিঃ হুযুর আলাইহিস সালাম যদি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতেন,

তাহলে তাঁর চোখে ধুলা দিয়ে সত্তরজন সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে গিয়ে 'মাউনা' নামক স্থানে কূপবাসী মুনাফিকগণ নির্মমভাবে শহীদ করলো কিরূপে? তাঁদেরকে কেন তিনি এ বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন?

উত্তরঃ হুযুর আলাইহিস সালামের এ খবর ছিল যে 'বেরে-মাউনা' বাসীগণ মুনাফিক ছিল এবং এও তাঁর জানা ছিল যে, এরা ঐ সত্তরজন সাহাবাকে শহীদ করবে। কিন্তু একই সাথে এ খবরও তাঁর জানা ছিল যে, খোদার ইচ্ছাও ছিল তাই; এবং সে সত্তরজনের শাহাদতের সুনির্দিষ্ট সময়ও এসেছে। তিনি জানতেন যে, খোদার ইচ্ছায় রাজী থাকাটাই হলো বান্দার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খোদার মর্জি মাফিক স্বীয় আদরের নন্দনকে যবেহ করার উদ্দেশ্যেই ছুরি নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এটা কি নিরীহ সন্তানের প্রতি জুলুম ছিল? কখনই না, বরং খোদার ইচ্ছাতেই নিজের ইচ্ছাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, এখন বলুন, আল্লাহ্‌র নিশ্চয় এ খবর ছিল যে মাংসের মধ্যে বিষ মিশ্রিত আছে, বেরে মাউনা'বাসী মুনাফিকগণ সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করবে। তিনি তৎক্ষণাৎ ওহী নাযিল করে কেন সে অনভিপ্রেত দুর্ঘটনাদ্বয় প্রতিরোধ করলেন না? আল্লাহ ও কি বেখবর ছিলেন? আল্লাহ সকলকে বোধ শক্তি দান করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ইল্‌ম গায়বের বিপক্ষে ফকীহগণের বিবিধ উদ্ধৃতির বিবরণ)

১নং আপত্তিঃ 'ফাত্ওয়ায়ে কাযী খাঁ, এর মধ্যে আছে-

رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْءَةُ خدا اور رسول راگواه كرديم قَالُوْا يَكُوْنُ كُفْرًا لِاَنَّهٗ اِعْتَقَدَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ مَاكَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِيْنَ كَانَ فِى الْحَيٰوةِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ

কোন এক ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়াই বিবাহ করলো-বর ও কনে উভয়ে বললো, 'আমরা আল্লাহ ও রসুলকে সাক্ষী করেছি' লোকে বলে এ উক্তি কুফ্‌র। কেননা তারা (বর-কনে) এ আকীদা পোষণ করেছে যে রসুলুল্লাহ আলাইহিস সালাম অদৃশ্য বিষয়াদিতে জ্ঞাত; অথচ তাঁর জীবিতাবস্থায়ও এ জ্ঞান ছিল না, মৃত্যুর পরে এ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

২নং আপত্তিঃ-শরহে ফিক্‌হে আকবরে' মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ-

وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيْحًا بِالتَّكْفِيْرِ بِاِعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى قُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

(হানাফীগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম অদৃশ্য বিষয়াদিতে জ্ঞাত-এ বিশ্বাস্ পোষণ করাটা কুফ্‌র। কেননা এ ধরনের বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলার ফরমানঃ- قُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْ ضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

(বলে দিন যে আসমান সমূহ ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়াদি খোদা ছাড়া অন্য কেউ জানে না) এর পরিপন্থী।

উল্লেখিত দু'টো ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে, হুজুর আলাইহিস সালামকে ইলম গায়বের অধিকারী বলে মনে করাটা কুফ্‌র।

উত্তরঃ-উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ের মোটামুটি ও অভিযোগ খণ্ডনোপযোগী উত্তর হচ্ছে, ভিন্ন মতাবলম্বীগণও হুযুর আলাইহিস সালামের আংশিক অদৃশ্য জ্ঞানে বিশ্বাসী। সুতরাং, তারাও কাফির বলে গণ্য হলেন। কেননা, উক্ত উদ্ধৃতিসমূহকে সার্বিক ও আংশিক কথাটির উল্লেখ নেই। শুধু এ কথাই উক্ত হয়েছে যে, যে কেউ হুযুরের ইলমে গায়ব স্বীকার করে, সে কাফির। তাই একটি বিষয়ে হোক কিংবা একাধিক বিষয়ে হোক সর্বাবস্থায় সে কাফির। যাক সে কথা নাইবা বল্‌লাম, কিন্তু মওলবী আশরাফ আলী থানবী যে তাঁর রচিত 'হিফজুল ঈমান' কিতাবে ছেলেপিলে, পাগল ও জন্তুদের সম্বন্ধেও আংশিক অদৃশ্য জ্ঞান স্বীকার করেছেন; মওলবী খলীল আহমদ সাহেব তাঁর রচিত 'বরাহীনুল কাতিআ' কিতাবে শয়তান ও মৃত্যুর ফিরিশতার (মলাকুল মউত) ব্যাপক ইলমে গায়েবের কথা স্বীকার করেছেন। মওলবী কাসেম সাহেব 'তাহযীরুন নাস' কিতাবে এ ব্যাপারে আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন-সৃষ্টিকূলের জ্ঞানরাশির তুলনায় হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান অধিক বলে স্বীকার করেছেন। এখন এ তিন স্বনামধন্য মহাবিদ্বানদের ব্যাপারে কি ফাত্ওয়া দেওয়া যাবে? এটি হলো সংক্ষিপ্ত উত্তর। এখন বিস্তারিতভাবে উত্তর শুনুন।

'কাযীখাঁর' উল্লেখিত ইবারতে। قَالُوْا (জনগণ বলছে) শব্দটি উল্লেখিত আছে। কাযী খাঁ ও অন্যান্য ফকীহগণের একটা নিয়ম হচ্ছে, তাঁরা। قَالُوْا শব্দটা সে সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন, যেখানে বর্ণিত উক্তিটা তাঁরেদ মনঃপুত নয়।

'ফাতওয়ায়ে শামীর' পঞ্চম খণ্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছেঃ-

لَفْظَةُ قَالُوْاتُذْكَرُ فِيْمَا فِيْهِ خِلَافٌ অর্থাৎ। قَالُوْا শব্দ সে ক্ষেত্রেই

ব্যবহৃত হয়, যেখানে মতানৈক্য থাকে।

'গুনিয়াতুল মুসতামলী শরহে মুনয়াতুল মুসাল্লী' কিতাবে قنوت (কুনুত) এর বর্ণনায় উল্লেখিত আছেঃ-

كَلَامُ قاضى خان يُشِيْرُ اِلَي عَدمِ اِخْتِيَارِه لَهُ حَيْثُ قَالَ قَالُوْا لا يُصَلِّىْ عَلَيْهِ فِى الْقَعْدَةِ الاَخِيْرَةِ فَفِىْ قَوْلِهِ قَالُوْا اِشَارَةٌ اِلَى عَدمِ اِسْتِحْسَانِهِ لَهُ وَاِلَى اَنَّهُ غَيْرُ مَرْوِىّ عَنِ الاَئِمَّةِ كَمَا قُلْنَاهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ مُتَعَارَفٌ فِىْ عِبَارَاتِهِمْ لِمَنْ اسْتَقْرَءَهَا

(কাযীখাঁর বর্ণিত উক্তিটাই তাঁর নাপছন্দ হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। কেননা, তিনি বলেছেনঃ- قَالُوْ لَايُصَلِّىْ তাঁর قَالُوْا বলার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, বর্ণিত উক্তিটা তাঁর পছন্দনীয় নয় এবং তা বিদগ্ধ ধর্মীয় ইমামগণ থেকেও বর্ণিত নয়। যেমন আমি প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। কেননা এ রীতি ফকীহগণের বিভিন্ন ইবারাতে প্রচলিত। যিনি অনুসন্ধান করেছেন, তিনিই জানেন।)

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দুররুল মুখতারের 'কিতাবুন নিকাহ' এ উল্লেখিত আছেঃ-

تَزَوَّجَ رَجُلَ بِشَهَادَةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَمْ يَجُزْ بَلْ قِيْلَ يُكْفَرُ

(কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলকে সাক্ষী করে বিবাহ করলো, এটা না জায়েয, বরং বলা হয়েছে যে সে কাফির হয়ে যাবে)

এ ইবাদতের প্রেক্ষাপটে আল্লামা শামী 'তা'তারখানিয়া' গ্রন্থ থেকে নিম্নবর্ণিত অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেনঃ

وَفِى الْحُجَّةِ ذُكِرَ فِى الْمُلْتَقَطِ لا يُكْفَرُ لِاَنَّ الاَشْيَاءَ تُعْرَضُ عَلَى رُوْحِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَنَّ الرَّسُوْلَ يَعْرِفُوْنَ بَعْضَ الْغَيْبِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُوْلٍ قُلْتُ بَلْ ذُكِرَ وَافِىْ كُتُبِ الْعَقَائِدِ اَنَّ مِنْ جُمْلَةِ كَرَامَاتِ الاَوْلِيَاءِ الْاِطِّلَاعُ عَلَى بَعْضِ الْمُغَيَّبَاتِ

('মুলতাকাত' গ্রন্থে আছে যে, সে ব্যক্তি কাফির হবে না। কেননা সমস্ত বস্তু বা বিষয় হুযুর আলাইহিস সালামের রূহ পাকের কাছে পেশ করা হয়। আর রসুলগণ আংশিকভাবে অদৃশ্য বিষয়াদিতে জ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "পছন্দনীয় রসুল ছাড়া কারো নিকট তাঁর নিজের অদৃশ্য বিষয়াদি প্রকাশ করেন না"। আমি বলছি, আকাইদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছে যে, কোন কোন অদৃশ্য বিষয়ে অবগতি হওয়াও আল্লাহর ওলীগণের অন্যতম কারামত হিসেবে গণ্য।

আল্লামা শামী (রহঃ) আল মুরতাদ্দিন' المرتدين শীর্ষক অধ্যায়ে মাসআলায়ে বরযাযিয়া' এর উল্লেখ করার পর বলছেন-

حَاصِلُهُ اَنَّ دَعْوَى الْغَيْبِ مُعَارِضَةٌ لِنَصِّ الْقُرْاٰنِ يُكْفَرُ بِهَا اِلَّا اِذَا اُسْنِدَ ذٰلِكَ صَرِيْحًا اَوْ دَلَالَةً اِلَى سَبَبٍ كَوَحْىٍ اَوْ اِلْهَامٍ

(সার কথা হলো-ইলমে গায়বের দাবী করাটা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী এবং এর ফলে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এটাকে সুস্পষ্টভাবে বা রূপকভাবে ইলমে গায়ব অর্জনের উৎস যেমন ওহী কিংবা ইলহাম প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত করা হয়, তাহলে কুরআনের আয়াতের বরখেলাফ হবে না)

'মাআদেনুল হাকায়েক' শরহে কনযুদ দকায়েক ও 'খযানাতুর রিওয়ায়াত' কিতাবে উল্লেখ আছে

وَفِى الْمُضْمَرَاتِ وَالصَّحِيْحِ اَنَّهُ لَايُكْفَرُ لِاَنَّ الاَنْبِيَاءَ يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمُ الاَشْيَاءُ فَلَايَكُوْنُ كُفْرًا

('মুযমারাত' গ্রন্থে আছে-সঠিক মত হলো সে ব্যক্তি কাফির হবে না। কেননা নবীগণ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত। তাঁদের কাছে বস্তু বা বিষয়সমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং, তা কুফ্র হিসেবে গণ্য হবে না।)

উল্লেখিত ইবারত সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, অদৃশ্য জ্ঞানের আকীদা পোষণ করার উপর কুফরের ফাত্ওয়া দেয়াটা ভুল। বরং ফকীহগণও এ আকীদা পোষণ করেন যে, হুযুর আলাইহিস সালামকে ইলমে গায়ব দেয়া হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে, (অত্র পরিচ্ছেদের ২নং আপত্তির বর্ণনায় উদ্ধৃত বক্তব্যে) মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এর পুরো ইবারতটুকু আপত্তি উত্থাপনকারীরা উদ্ধৃত করেননি। আসল ইবারত নিম্নে দেয়া গেল, যা মূলভাবকে প্রকাশ করছে-

ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ الاَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُوْا الْمُغَيَّبَاتِ مِنَ الاَشْيَاءِ اِلَّا مَا اَعْلَمَهُمُ اللّٰهُ وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيْحًا بِالتَّكْفِيْرِ الخ

(জেনে রাখুন যে, নবীগণ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক জ্ঞাত করানো ব্যতিরেকে অদৃশ্য বিষয়াদিতে জ্ঞাত হন না। হানাফীগণ সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি নবী (আলাইহিস সালাম) কে ইলমে গায়বের অধিকারী রূপে বিশ্বাস করে-।)

এখন পূর্ণ বক্তব্যটা বোঝা গেল যে, মোল্লা আলী কারী (রহঃ) নবী আলাইহিস সালামকে সত্ত্বাগতভাবে ইলমে গায়বের অধিকারীরূপে মেনে নেওয়াটাই 'কুফর' বল্ছেন, যা প্রদত্ত জ্ঞানের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কেননা, খোদার প্রদত্ত জ্ঞানের কথাতো তিনিও স্বীকার করেছেন। তাঁর যে সমস্ত ইবারত আমি ইলমে গায়বের সমর্থনে পেশ করেছি, সেখানে তিনি হুযুর আলাইহিস সালামকে পূর্বাপর যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারীরূপে স্বীকার করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইল্‌মে গায়ব সম্পর্কে উত্থাপিত যুক্তি নির্ভর (আকলী)

আপত্তি সমূহের বিবরণ

১নং আপত্তিঃ ইল্‌মে গায়ব হচ্ছে খোদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এতে কাউকে অংশীদার গণ্য করা খোদার গুণাবলীতে শিরক করার নামান্তর। সুতরাং, হুযুর আলাইহিস সালামের জন্য ইল্‌মে গায়ব বিশ্বাস করাটা 'শিরক'।

উত্তরঃ অদৃশ্য বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে জানাটা যেমন খোদার বৈশিষ্ট্য; তেমনি দৃশ্যমান যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানও খোদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা গুণ (তিনি দৃশ্যমান, عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (তিনি দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।) অনুরূপ, শোনা, দেখা, জীবিত হওয়া ইত্যাদিও খোদার গুণাবলী। সুতরাং, কাউকে কোন দৃশ্যমান বস্তু বা বিষয়ে জ্ঞাত বলে স্বীকার করা বা কাউকে শ্রোতা, দ্রষ্টা অথবা জীবিত বলে মেনে নেওয়া প্রত্যেকটি কাজই শিরকরূপে গণ্য হবে। কিন্তু তা' কখনও হতে পারে না। কেননা, শুধু এতটুকু পার্থক্য নির্ণয় করা হয় যে, আমাদের শ্রবণ, দর্শন, জীবিত থাকা প্রভৃতি গুণাবলী খোদাপ্রদত্ত ও অচিরন্তন। পক্ষান্তরে খোদার এ সমস্ত গুণাবলী হচ্ছে সত্বাগত, সহজাত ও চিরন্তন। তাই শিরক কিরূপে হলো? তদ্রুপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ইল্‌মে গায়বও খোদা প্রদত্ত, অচিরন্তন এবং সসীম। পক্ষান্তরে, খোদার এ বৈশিষ্ট্য সত্বাগত, চিরন্তন এবং তার সম্পূর্ণ জ্ঞাত বিষয়াদিও অসীম। অধিকন্তু, এ শিরকের ব্যাপারটি আপনাদের বেলায়ও প্রযোজ্য, কেননা আপনারাও তো হুযুর আলাইহিস সালামের অদৃশ্য জ্ঞানের কথা আংশিকভাবে হলেও স্বীকার করেন। খোদার কোন গুণে সার্বিকভাবে হোক কিংবা আংশিকরূপে, যে কোন অবস্থায় অংশীদার স্বীকার করাটা শিরক। আরও উল্লেখ্য যে মওলবী হোসাইন আলী সাহেব, যিনি মওলবী রশীদ আহমদ সাহেবের খাস শাগরিদ, স্বীয় কিতাব 'বলগাতুল হয়রান'-এ আয়াতে করীমা —

يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন-"আল্লাহ তা'আলাও সব সময় সৃষ্টিকুলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত হন না।" বরং বান্দাগণ যখনই তাদের কার্যাবলী সমাধা করে, তখনই অবগত হন। এখনতো ইল্‌মে গায়বও খোদার গুণ হিসেবে গণ্য হলোনা। তাহলে

কারো জন্য ইল্‌মে গায়ব স্বীকার করলে শিরক হবেই বা কেন?

২নং আপত্তিঃ হুযুর আলাইহিস সালাম কখন ইল্‌মে গায়বের অধিকারী হলেন? আপনারা কখনো বলে থাকেন যে মিরাজের রাতে তাঁর মুখে এক ফোঁটা পানি পতিত হয়েছিল, ফলে তিনি ইল্‌মে গায়বের অধিকারী হয়েছেন। আবার কখনো বলেন যে স্বপ্নে খোদার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছিলেন। মহাপ্রভূ তার কুদরতের হাতখানা হুযুর আলাইহিস সালামের স্কন্ধ মুবারকের উপর রেখেছিলেন। যার ফলে তিনি যাবতীয় জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কোন সময় এ রকমও বলেন যে কুরআনের মাঝে সমস্ত কিছুর বর্ণনা রয়েছে, এর অবতরণের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ায় ইল্‌মে গায়ব সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে। এসব বক্তব্যসমূহের কোন্‌টি সঠিক? যদি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই এ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন, তবে কুরআন থেকেই বা কি পেলেন; অর্জিত বস্তুর অর্জন তো অসম্ভব।

উত্তরঃ- আসল ইল্‌মে গায়বতো হুযুর আলাইহিস সালামকে তাঁর জন্মের আগেই দান করা হয়েছিল। কেননা তিনি জন্মের আগে আত্মিক জগতে নবী ছিলেন- كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ (আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়নি।) আর নবী তো তাঁকেই বলা হয়, যিনি অদৃশ্য বিষয়ের খবর দেন। তবে, مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ পূর্বাপর যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান ছিল প্রত্যক্ষ দর্শন জনিত। অর্থাৎ সমস্ত কিছু নিজ চোখে দেখেই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এ জন্যেই কুরআনে উল্লেখিত আছেঃ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

(কুরআন প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা সম্বলিত।) আর মিরাজে যা কিছু ঘটেছে তা হলো فَتَجَلَّي لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ (প্রত্যেক কিছুই আমার নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে ও আমি সব কিছুই জানতে, চিনতে পেরেছি। দেখা এক কথা, আর বর্ণনা আর এক কথা। যেমন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করে মহাপ্রভূ সমস্ত কিছুই দেখিয়ে দিয়েছেন। তার পরেই সে সমস্ত কিছুর নাম বলে দিয়েছেন। আগেরটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শন আর পরেরটা হচ্ছে বর্ণনা। যদি বস্তুসমূহ দেখানো না হতো, তাহলে ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلٰئِكَةِ (অতঃপর সে সমস্ত বস্তু ফিরিশ্‌তাগণের সামনে উপস্থাপন করলেন আল্লাহ) এর কি তাৎপর্য হতে পারে? সুতরাং, উভয়বিধ উক্তিই সঠিক। অর্থাৎ মেরাজেও জ্ঞান লাভ করেছেন এবং কুরআন থেকেও। যদি বলা হয়, তাহলে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? সমস্ত বিষয়তো হুযুরের আগে থেকেই জানা ছিল; জ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞান লাভের

কি অর্থ হবে? কারণ অজ্ঞাত বিষয়ই তো জ্ঞাত করা হয়। এর উত্তর হলো- কুরআনের অবতরণ কেবল হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান লাভের জন্য নয়, বরং এর নানাবিধ উদ্দেশ্য ছিল। যেমন কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে সে আয়াত এর সাথে সংশ্লিষ্ট আহকাম বা বিধিবিধান জারী হবে না; তার তিলাওয়াত ইত্যাদিও হবে না। আর কুরআনের অবতরণ যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞান লাভের জন্য হতো, তাহলে কোন কোন সুরা দু'বার অবতীর্ণ হলো কেন?

যেমন 'তাফসীরে মাদারেকে' আছেঃ-

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مَكِّيَّةٌ وَّقِيْلَ مَدَنِيَّةٌ وَالْاَصَحُّ اَنَّهَا مَكِّيَّةٌ وَمَدَنِيَّةٌ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ ثُمَّ نَزَلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ

(সুরা ফাতিহা হচ্ছে মক্কী সুরা, আবার কেউ কেউ বলেন যে তা মাদানী সুরা। তবে সর্বাধিক সঠিক মত হলো তা মক্কী সুরা, আবার মদনী সুরাও। প্রথমে এ সুরা মক্কায়, পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়।)

মিশকাত শরীফে মিরাজের বর্ণনা সম্বলিত একটি হাদীছে আছে যে, মিরাজের রাত্রে হুযুর আলাইহিস সালামকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং সুরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহ দান করা হয়েছিল। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহঃ) প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, মিরাজতো মক্কা শরীফে হয়েছিল আর সুরা 'বাকারা' হলো মাদানী সুরা। তাহলে এর শেষ আয়াত সমূহ মিরাজে কিভাবে দান করা হলো? তিনি নিজেই এর উত্তর দিচ্ছেন-

حَاصِلُهٗ اَنَّهٗ ﷺ وَقَعَ تَكْرَارُ الْوَحْيِ فِيْهِ تَعْظِيْمًا لَّهٗ وَاهْتِمَامًا لِشَانِهٖ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِلَاوَاسِطَةِ جِبْرِيْلَ

(সার কথা হলো, এ সম্পর্কে-ওহী দু'বার নাযিল হয়েছিল হুযুর (আঃ) এর সম্মান ও মাহাত্মের প্রতি গুরুত্বারোপের জন্যই। আর মিরাজের সময়েও সে আয়াতগুলো হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর মাধ্যম ছাড়াই প্রত্যক্ষভাবে ওহী করা হয়েছিল।)

এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'লুমআত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

نَزَلَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ بِلَا وَاسِطَةٍ ثُمَّ نَزَلَ بِهَاجِبْرِيْلُ فَاُثْبِتَ فِي الْمَصَاحِفِ

মিরাজের রাতে এ আয়াত সমূহ মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছিল। পুনরায় সে এগুলোকে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়, এর ফলে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখন বলুন, দু'বার অবতীর্ণ হলো কেন? হুযুর আলাইহিস সালামেরতো প্রথমবার অবতীর্ণ হওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল। অধিকন্তু, প্রতি বছর রমযান মাসে জিব্রাইল আমীন হুযুর আলাইহিস সালামকে সম্পূর্ণ কুরআন পড়ে শুনাতেন। 'নুরুল আনোয়ার' গ্রন্থে ভূমিকায় 'কিতাব' (কুরআনের) এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ-

لِاَنَّهٗ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفْعَةً وَّاحِدَةً فِيْ كُلِّ شَهْرِ رَمْضَانَ جُمْلَةً

(প্রতি রমযান মাসে সমগ্র কুরআন একবার হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি অবতীর্ণ হতো) এখন বলুন এ অবতরণ কি জন্যে? বরং কুরআন থেকে জানা যায় যে, সমস্ত আসমানী কিতাবের পূর্ণ জ্ঞান হুযুর (আঃ) এর ছিল। আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ-

يَااَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

অর্থাৎ হে কিতাবীগণ, তোমাদের কাছে আমার সেই রসুল আগমন করেছেন, যিনি তোমোদের কিতাবের অনেক গোপনকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করছেন এবং অনেক বিষয়ে তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন।

যদি সমস্ত ঐশীগ্রন্থ হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের আওতাভুক্ত না হয়, তাহলে সে সমস্ত গ্রন্থ থেকে তাঁর তথ্য উদ্‌ঘাটন করা বা না করার কি অর্থ হতে পারে? আসল কথা হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালাম প্রথম থেকে কুরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু কুরআনী অনুশাসন সমূহ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে জারী করেননি। এ জন্য বুখারী শরীফের প্রথম হাদীছে উল্লেখিত আছে যে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হেরা গুহায় প্রথমবার আগমন করে আরয করেছিলেন- اِقْرَءْ (আপনি পাঠ করুন) এ কথা বলেননি যে, অমুক আয়াতটি পাঠ করুন। আর 'পড়'

কথাটি তাকেই তো বলা হয়, যিনি জানেন। হুযুর আলাইহিস সালাম বলেন مَا اَنَا بِقَارٍ (আমি পাঠক নই) আমি বরং পড়াবার লোক। পাঠ তো আগেই করেছি। কারণ, লওহে মাহফুজে কুরআন বিধৃত আছে, আর সেই লওহে মাহফুজতো প্রথম থেকেই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তিনি জন্মের আগে থেকেই কুরআনধারী নবী। ওহি প্রাপ্তি ছাড়া নবুয়াত ঘোষিত হয় কিভাবে?স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জন্মের আগে থেকেই কুরআন সম্পর্কে অবগত।

অনেক শিশু হাফিয হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। হযরত ঈসা (আঃ) ভুমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই বলেছেনঃ اٰتَانِىَ الْكِتَابَ (আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন।) বোঝা গেল যে, তখন থেকেই তিনি কিতাব সম্পর্কে জ্ঞাত। কোন কোন নবী সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছেঃ اٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (আমি তাঁকে শৈশবে জ্ঞান ও দর্শনদান করেছি)। হুযুর আলাইহিস সালাম জন্মের সাথে সাথেই সিজদায় গিয়ে উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছেন, অথচ সিজদা ও শাফাআত হলো কুরআনী বিধি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। গাউছে পাক (রাঃ) রমযান মাসে মায়ের দুধ পান করেননি। এটাও (রমযান মাসে দুধ পানে বিরত থাকা) কুরআনী বিধানের অন্তর্ভুক্ত। 'নুরুল আনোয়ার' গ্রন্থের ভূমিকায় চারিত্রিক গুণাবলীর আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

اِنَّ الْعَمَلَ بِالْقُرْاٰنِ كَانَ جِبِلَّةً لَّهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ

(কুরআন অনুযায়ী তাঁর চালচলন তাঁরই স্বভাবজাত, কষ্টার্জিত আচরণ নয়।) বোঝা গেল যে, কুরআন অনুযায়ী আমল করাটা ছিল হুযুর আলাইহিস সালামের জন্মগত অভ্যাস বা স্বভাবসুলভ আচরণ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব সময়ই ধাত্রী মাতা হযরত হালীমার ডানস্তন থেকেই দুধ পান করেছেন এবং অপর স্তনটি ভাইয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারও কুরআনী হুকুম প্রসূত। যদি কুরআন সম্পর্কে প্রথম থেকেই অবহিত না হতেন, তাহলে এ ধরনের বিধান সম্মত আমল কিভাবে করছেন তিনি?

দেওবন্দীদের আরও একটি বহুল আলোচিত আপত্তি হলো-আপনাদের উপস্থাপিত আয়াত সমূহের ব্যাপকতা থেকে এটা অপরিহার্যরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হুযুরের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের সমতুল্য। কিন্তু আপনারা সে সব আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সীমারেখা অংকন করেন। مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (যা আপনি জানতেন না) এ আয়াতাংশে নাতো কিয়ামত অবধি সময়ের সীমারেখা আছে, না مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ পূর্বাপর সবকিছুর উল্লেখ আছে।

নিয়ম হচ্ছে একবার 'খাস' বা সীমিত করলে পরবর্তীতেও বিশেষত্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ একবার কোন ব্যাপক বিষয়ের পরিধিকে সংকোচন করা হলে, আরও অধিক সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। (উসুলের কিতাবসমূহে দেখুন) সুতরাং, আমরা ওইসব আয়াতে শরীয়তের অনুশাসন সমূহকে লক্ষ্যার্থরূপে গ্রহণ করে আয়াতের অর্থকে সংকুচিত করি। অর্থাৎ আমরা বলি যে ওই সমস্ত আয়াতে শুধু শরীয়তের অনুশাসন সমূহের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে; পূর্বাপর সব কিছুর জ্ঞানকে বোঝানো হয়নি।

এর উত্তর হলো ঃ- সংশ্লিষ্ট আয়াতে বিশেষত্ব জ্ঞাপক কোন শর্তের উল্লেখ নেই, বরং যুক্তি নির্ভর ব্যতিক্রমের কথাই বিধৃত হয়েছে। কেননা আল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে অসীম আর সৃষ্টিকূলের মস্তিষ্ক অসীম জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। কেননা, শৃঙ্খল পরম্পরার 'অসীমতা' বাতিল বলে স্বীকৃত। সুতরাং, যুক্তিসঙ্গত কারণে সৃষ্টিকূলের জ্ঞান অসীম হবে। হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণ মিলে যে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের অনেক কিছুর খবর দিয়েছেন হুযুর (আলাইহিস সালাম)। এ জন্য এ দাবী করা হয়েছে। 'ব্যতিক্রম' ও 'বিশেষত্বের' বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। দেখুন اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (নামায কায়েম কর) দ্বারা যে বিধান নির্দেশিত হয়, সে বিধানের আওতায় শিশু, পাগল, ঋতুবর্তী মহিলা আসে না। তাই এটি বিশেষত্ব জ্ঞাপক নির্দেশ নয়, বরং ব্যতিক্রম ধর্মী নির্দেশ।

এ অসহায় ব্যক্তি (গ্রন্থকার) ইলমে গায়ব সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেছে। এ সম্পর্কে যদি আরও অধিক জানতে চান, তাহলে বরকত মণ্ডিত পুস্তিকা-"আল কলিমাতুল উলয়া" অধ্যয়ন করুন। আমি যা কিছু বলেছি, তা সে অগণিত তরঙ্গ সমৃদ্ধ সমুদ্রের যেন একটি মাত্র তরঙ্গ। যেহেতু আমাকে অনান্য আরও মাসায়েল সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে, সেজন্য এতটুকু লিখেই বক্ষ্যমান আলোচনা সমাপ্ত করলাম।

وصلى الله تعلى على خير خلقه سيد نا محمد واله واصحابه
اجمعين برحمته وهوارحم الراحمين

'হাযির'-'নাযির' এর আলোচনা

এ আলোচনাকে একটি ভূমিকা ও দু'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে

ভূমিকা

'হাযির' এর আভিধানিক অর্থ হলো যা বর্তমান থাকে, অর্থাৎ যা অদৃশ্য বা অনুপস্থিত নয়। 'আল-মিসবাহুল মুনীর' নামক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছেঃ-

حَضِرَ الْمَجْلِسَ اى شهده وَحَضَرَ الغَائِبُ حُضُوْرًا قَدِمَ مِنْ غَيْبَتِهِ

অর্থাৎ-সে মজলিসে উপস্থিত হয়েছে; অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে তথা সে অদৃশ্যাবস্থা থেকে দৃশ্যমান হয়েছে।

منتهى الارب নামক গ্রন্থে আছেঃ حاضر حاضر شونده

'হাযির' এর অর্থ হলো-সে উপস্থিত হয়েছে।

'নাযির' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন-দর্শক, চোখের মনি, দৃষ্টি, নাকের শিরা ও অশ্রু। 'আল-মিসবাহুল মুনীরে' আছেঃ

وَالنَّاظِرُ السَّوَادُ الْاَصْغَرُ مِنَ الْعَيْنِ الَّذِى يَبْصُرُبِهِ الْاِنْسَانُ شَخْصَهُ

অর্থাৎ-'নাযির' শব্দের অর্থ হলো চোখের কালবর্ণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম অংশ, যদ্দ্বারা মানুষ ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখতে পায়। ''কামুসুল লুগাত' নামক অভিধানে আছে-

وَالنَّاظِرُ السَّوَادُ فِي الْعَيْنِ اَوِالْبَصَرُ بِنَفْسِهِ وَعِرْقٌ فِى الْاَنْفِ وَفِيْهِ مَاءُ الْبَصَرِ

অর্থাৎ-'নাযির' শব্দের অর্থ হলো-চোখের কালো বর্ণের অংশ বা সম্পূর্ণ চোখ বা নাকের শিরা-যার মধ্যে অশ্রু থাকে।

'মুখতারুসসিহাহ' নামক গ্রন্থে ইব্ন আবু বকর রাযী বলেন-

اَلنَّاظِرُ فِى الْمُقْلَةِ السَّوَادُ الْاَصْغَرُ الَّذِى فِيْهِ الْمَاءُ الْعَيْنِ

অর্থাৎ 'নাযির শব্দের অর্থ হচ্ছে চোখের ক্ষুদ্রতম কালো অংশ, যেখানে চোখের পুতলী রয়েছে। যতদূর আমাদের দৃষ্টি কার্যকরী হয়, ততদূর পর্যন্ত আমরা

হলাম 'নাযির''। আর যে স্থান পর্যন্ত আমরা সক্রিয়রূপে তৎপর হতে পারি সে পর্যন্ত আমরা হাযির'। আসমান পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি কার্যকরী হয়ে থাকে, তাই সে পর্যন্ত আমরা 'নাযির' অর্থাৎ দর্শনকারী; কিন্তু সে স্থান পর্যন্ত আমরা 'হাযির' নই, কেননা ততদূর আমরা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারি না। যে কক্ষে বা ঘরের মধ্যে আমরা বিদ্যমান আছি, সেখানে আমরা 'হাযির'। কেননা সে স্থানে সক্রিয় হতে পারি। যদি কারো সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি 'হাযির-নাযির' এ কথাটির শরয়ী পারিভাষিক অর্থ হলো-তিনি পূতপবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পুণ্যাত্মা, যিনি এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র পৃথিবীকে স্বীয় হাতের তালু দেখার মত স্পষ্টই দেখতে পান, নিকট ও দূরের আওয়াজ শুনতে পান; কিংবা এক মুহূর্তে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন, এবং হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানকারী সাহায্য প্রার্থীদের সাহায্য করেন। এ পরিভ্রমণ কেবল রূহানীও হতে পারে, বা 'জিসমে-মিছালী' সহকারেও হতে পারে; অথবা কবরস্থ বা অন্য কোন জায়গায় বিদ্যমান শরীরের সাহায্যেও সংঘটিত হতে পারে। বুযুর্গানে দ্বীনের উপরোক্ত অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদনের প্রমাণ পাওয়া যায় কুরআনে, হাদীছসমূহে ও উলামায়ে কেরামের উক্তিসমূহে।

প্রথম অধ্যায়

('হাযির-নাযির' সম্পর্কিত বিষয়ের প্রামাণ্য বিবরণ)

এ অধ্যায়টি পাঁচটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(কুরআনের আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণ)

(১) يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

[আল্লাহতা'আলা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, "ওহে অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদদাতা! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'হাযির-নাযির', সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী, আল্লার নির্দেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।"]

আয়াতে উল্লেখিত شاهد (শাহিদ) শব্দের অর্থ সাক্ষীও হতে পারে এবং 'হাযির-নাযির' ও হতে পারে। সাক্ষী অর্থে 'শাহিদ' শব্দটি এজন্য ব্যবহৃত হয় যে, সে ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল। হুযুর আলাইহিস সালামকে 'শাহিদ' হয়তো এ জন্যই বলা হয়েছে যে,তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে এসে অদৃশ্য জগতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শীরূপে। প্রত্যক্ষদর্শী যদি না হন, তাহলে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে সাক্ষীরূপে প্রেরণের কোন অর্থই হয় না, কেননা সমস্ত নবীগণ (আলাইহিস সালাম) তো সাক্ষী ছিলেন। অথবা, তাঁকে এ জন্যই 'শাহিদ' বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সমস্ত নবীগণের অনুকূলে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। এ সাক্ষ্য না দেখে প্রদান করা যায় না। তাঁর শুভ সংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী হওয়ার বিষয়টিও তথৈবচ। অন্যান্য নবীগণও এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু শুধু শুনেই; আর হুযুর আলাইহিস সালাম করেছেন স্বচক্ষে দেখেই। এ জন্যই মিরাজ একমাত্র হুযুর আলাইহিস সালামেরই হয়েছিল। উপরোক্ত আয়াতে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে 'سِرَاجًا مُّنِيْرًا। সিরাজাম-মুনীরা' ও বলা হয়েছে। 'সিরাজাম-মুনীরা' সূর্যকেই বলা হয়। সূর্য যেমন পৃথিবীর সর্বত্র, ঘরে ঘরে বিদ্যমান, তিনিও (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক জায়গায় বিরাজমান। এ আয়াতের প্রতিটি শব্দ থেকে হুযুর আলাইহিস সালামের 'হাযির-নাযির' হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

(২) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

[এবং কথা হলো এই যে আমি (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদেরকে (উম্মতে মুহাম্মদী) সমস্ত উম্মতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করতে পার এবং এ রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের জন্য পর্যবেক্ষণকারী ও সাক্ষীরূপে প্রতিভাত হন।]

(৩) فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

[তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি (আল্লাহ তা'আলা) প্রত্যেক উম্মত থেকে

একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব, এবং হে মাহবুব! আপনাকে সে সমস্ত সাক্ষীদের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে আনয়ন করবো]

এ আয়াতসমূহে নিম্নোক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীগণের উম্মতগণ আরজ করবে; 'আপনার নবীগণ আপনার নির্ধারিত বিধি-বিধান আমাদের নিকট পৌছাননি। পক্ষান্তরে নবীগণ আরজ করবেন; 'আমরা অনুশাসনসমূহ পৌছিয়েছি'। নবীগণ নিজেদের দাবীর সমর্থনে সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুস্তাফা আলাইহিস সালামকে পেশ করবেন। উনাদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করে বলা হবেঃ আপনারা সে সব নবীদের যুগে ছিলেন না। আপনারা না দেখে কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন? তাঁরা তখন বলবেন; আমাদেরকে হুযুর আলাইহিস সালাম এ ব্যাপারে বলেছিলেন। তখন হুযুর আলাইহিস সালামের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুটো বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেনঃ এক, নবীগণ (আঃ) শরীয়তের বিধানাবলী প্রচার করেছেন দুই, আমার উম্মতগণ সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত। সুতরাং, মুকদ্দমা এখানেই শেষ। সম্মানিত নবীগণের পক্ষে রায় দেওয়া হবে। লক্ষ্যণীয় যে, যদি হুযুর আলাইহিস সালাম পূর্ববর্তী নবীগণের তবলীগ ও স্বীয় উম্মতগণের ভবিষ্যতের অবস্থা সচক্ষে অবলোকন না করতেন, তা'হলে তাঁর সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন আপত্তি উত্থাপিত হল না কেন; যেমনিভাবে তাঁর উম্মতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপিত হল? বোঝা গেল, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সাক্ষ্য হবে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আর আগেরটা হবে শ্রুত বিষয়ে সাক্ষ্য। এ থেকে তাঁর 'হাযির-নাযির' হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলো। এ আয়াতের তাৎপর্য ইতিপূর্বে ইলমে গায়ব এর আলোচনায়ও বিশ্লেষণ করেছি।

(৪) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

[নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে সে রসুলই এসেছেন, যাঁর কাছে তোমাদের কষ্টে নিপতিত হওয়ার ব্যাপারটি বেদনাদায়ক।]

এ আয়াত থেকে তিন রকমে হুযুর আলাইহিস সালাম এর 'হাযির-নাযর' হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ جَاءَكُمْ আয়াতাংশে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, বলা হয়েছে, তোমাদের সকলের কাছে হুযুর আলাইহিস সালাম তশরীফ এনেছেন। এতে বোঝা যায় যে নবী করীম

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই আছেন। মুসলমানতো পৃথিবীর সব জায়গায় আছে; তাই হুযুর আলাইহিস সালামও প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান আছেন। **দ্বিতীয়তঃ** আয়াতে বলা হয়েছে- مِنْ اَنْفُسِكُمْ (তোমাদের আত্মাসমূহের মধ্য থেকে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আগমন যেন শরীরের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হওয়া যা শরীরের শিরা-উপশিরায়, এমনকি প্রতিটি কেশাগ্রেও বিদ্যমান; যা প্রত্যেক কিছুর ব্যাপারে সজাগ ও সংবেদনশীল। তদ্রূপ হুযুর আলাইহিস সালাম প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিটি কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں
ہیں مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے

অর্থাৎ চোখ সমূহের মধ্যে তিনি বিরাজমান, তবে দৃষ্টির মত অদৃশ্য। দিলের মধ্যে এমনভাবেই বিদ্যমান আছেন, যেমনিভাবে শরীরের মধ্যে প্রাণ বিচরণ করে। তিনি অপূর্ব এক শানে বিকশিত। আমার মধ্যে রয়েছেন অথচ আমার দৃষ্টির আড়ালে।

যদি আয়াতের অর্থ কেবল এটাই হতো-তিনি তোমাদের মধ্যেকার একজন মানুষ, তা'হলে مِنْكُمْ বলাই যথেষ্ট ছিল, مِنْ اَنْفُسِكُمْ কেন বলা হল? **তৃতীয়তঃ** আয়াতে আরও বলা হয়েছে عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ অর্থাৎ – যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, তা তাঁর কাছে পীড়াদায়ক। এতে বোঝা গেল যে, আমাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কেও হুযুর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি নিয়ত অবগত। এ জন্যই তো আমাদের দুঃখ-কষ্টের ফলশ্রুতিতে তাঁর পবিত্র হৃদয়ে কষ্ট অনুভব হয়। যদি আমাদের খবরও না থাকে, তবে তার কষ্ট অনুভব হয় কিভাবে? শেষের এ আয়াতাংশটিও আসলে পূর্বোল্লিখিত مِنْ اَنْفُسِكُمْ এরই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে। শরীরের কোন অঙ্গে ব্যথা বেদনা হলে রূহই কষ্ট অনুভব করে। তদ্রূপ তোমরা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে, তা' আকা মওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে পীড়াদায়ক ঠেকে।

(৫) ٣٩ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

[এবং যখন ওরা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করে, তখন তারা যদি আপনার সমীপে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আপনিও তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তা'হলে নিশ্চয়ই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, করুণাময় হিসেবে পাবে।]

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, পাপীদের মাগফিরাত বা ক্ষমাপ্রাপ্তির একমাত্র পথ হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালামের মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর শাফা'আত প্রার্থনা করা এবং হুযুর মেহেরবাণী করে তাদের জন্য শাফা'আত করা। এর অর্থ এ নয় যে, আমাদেরকে মাগফিরাতের জন্য পবিত্র মদীনাতে উপস্থিত হতে হবে; কেননা তাহলে আমাদের মত দরিদ্র বিদেশী পাপীদের ক্ষমাপ্রাপ্তির কি উপায় হবে? ধনাঢ্য ব্যক্তিগণও তো জীবনে একবার কি দু'বার সে মহান দরবারে যাবার সামর্থ রাখেন; অথচ দিনরাত পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত রয়েছেন। তাই,এতে মানুষের সাধ্যাতীত কষ্ট হবে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে-তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কাছেই বিদ্যমান আছেন। তোমরাই বরং তাঁর নিকট থেকে দূরে অবস্থান করছো। তোমরা হাযির হয়ে যাও, তিনি তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন।

یار نزدیک تر از من بمن است ، وایں عجب ہیں کہ من از وے دورم

অর্থাৎ পরম বন্ধু আমার নিজের চেয়েও কাছে বিদ্যমান। এটাই বিস্ময়কর যে আমি তার নিকট থেকে দূরে রয়েছি।

এতে বোঝা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম সর্বত্র বিদ্যমান।

(৬) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

[আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।]

অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ

অর্থাৎ আমার রহমত প্রত্যেক কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। বোঝা গেল যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিশ্ব চরাচরের জন্য রহমত স্বরূপ এবং

'রহমত' সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং, সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন হুযুর আলাইহিস সালাম। স্মরণ রাখা দরকার যে, মহা প্রভু আল্লাহর শান হচ্ছে-তিনি 'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক), আর প্রিয় হাবীবের শান হচ্ছে-তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি রহমত স্বরূপ)। স্পষ্টই প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ যা'র প্রতিপালক, হুযুর আলাইহিস সালাম হচ্ছেন তার প্রতি রহমত স্বরূপ।

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّ بَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ (৭)

[হে মাহবুব! এটা আল্লাহর অভিপ্রেত নয় যে আপনি তাদের মধ্যে থাকাকালে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।]

অর্থাৎ খোদার মর্মন্তুদ শাস্তি তারা পাচ্ছে না-যে, আপনি তাদের মধ্যে রয়েছেন। আর, সাধারণ ও সর্বব্যাপী আযাব তো কিয়ামত পর্যন্ত কোন জায়গায় হবে না।

এ থেকে জানা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান থাকবেন। এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' বলা হয়েছে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রত্যেক পুণ্যাত্মা ও প্রত্যেক পাপীর সাথে বিদ্যমান আছেন। এর বিশদ বিবরণ এ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَاعْلَمُوْااَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

[তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরাজমান)। এখানে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতেন। সুতরাং, স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম সে সব জায়গায়ও তাঁদের কাছে আছেন।

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (৮)

[এবং এভাবেই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে সমস্ত আসমান ও যমীনে পরিব্যাপ্ত আমার বাদশাহী অবলোকন করাই।]

এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে

তাঁর চর্মচক্ষে সমগ্র জগত দেখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। হুযুর আলাইহিস সালামের মরতবা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম থেকেও অনেক উর্ধে। অতএব, একথা স্বীকার করতেই হয় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)ও সমগ্র জগত অবলোকন করেছেন। এ আয়াতের তাৎপর্য 'ইলমে গায়ব' শীর্ষক আলোচনায় পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ (৯)

[হে মাহবুব, আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রভু হস্তী বাহিনীদের কি অবস্থা করেছেন?]

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (১০)

[হে মাহবুব, আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক 'আদ' নামক জাতির সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন?]

'আদ' জাতি ও হস্তীবাহিনীর ঘটনাবলী হুযুর আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আগেই সংঘটিত হয়েছিল, অথচ বলা হচ্ছে- اَلَمْ تَرَ (আপনি কি দেখেননি?) অর্থাৎ আপনি দেখেছেন। এতে কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারে যে, কুরআন করীমে কাফিরদের প্রসঙ্গেও তো বলা হয়েছে اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ (তারা কি দেখেনি, আমি তাদের আগে কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি), এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কাফিরগণ তাদের আগেকার কাফিরদের ধ্বংস হতে দেখেনি; তবু আয়াতে বলা হয়েছে-'তারা কি দেখেনি'? সুতরাং, আপনি কি দেখেন নি?" এ উক্তি থেকে সচক্ষে দেখার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় না। এর উত্তর হচ্ছে-এখানে আয়াতে আগেকার কাফিরদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ, বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ী ও ধ্বংসাবশেষ দেখার কথাই বলা হয়েছে। মক্কার কাফিরগণ যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার সময় সে সব স্থান সমূহের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করতো, সেজন্য বলা হয়েছে, 'এসব লোক ওসব ধ্বংসাবশেষ দেখে কেন শিক্ষা গ্রহণ করে না?' হুযুর আলাইহিস সালাম তো দৃশ্যতঃ না পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন, না 'আদ' জাতি ও অন্যান্যদের বিধ্বস্ত দেশ সমূহ বাহ্যিকভাবে দেখেছেন। তাই, তাঁর ক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে তাঁর নূরে নবুয়াতের মাধ্যমে দেখার কথাই বলা হয়েছে।

(১১) কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় اِذْ উক্ত হয়েছে, যেমন

وَاِذْقَالَ رَبُّكَ اِذَا لِلْمَلٰئِكَةِ -

(যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন وَاِذْقَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ (যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতির উদ্দেশ্যে বললেন,.......) ইত্যাদি। তাফসীরকারকগণ এসব জায়গায় اُذْكُرْ (ঐ ঘটনাটি স্মরণ করুন।) শব্দটি উহ্য আছে বলে মত পোষণ করেন। লক্ষ্যণীয় যে "স্মরণ করুন"-এ কথা দ্বারা সে সব বিষয় বা ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যা' সংঘটিত হতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু কালক্রমে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ নেই। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওই সমস্ত বিগত ঘটনাবলী হুযুর আলাইহিস সালাম অবলোকন করেছেন। 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' উল্লেখিত আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের সমস্ত ঘটনাবলী হুযুর আলাইহিস সালাম প্রত্যক্ষ করেছেন। সামনে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কেউ আরও একটি আপত্তি উত্থাপন পূর্বক বলতে পারে যে, কুরআন করীমে বনী ইসরাইলকেও তো وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ (সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে ফিরাউনের বংশধরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছিলাম)। আয়াতের মধ্যে সম্বোধন করা হয়েছে। হুযুর আলাইহিস সালামের যুগের ইহুদীগণ কি উক্ত আয়াতে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল? কিন্তু তাফসীরকারকগণ এখানেও اُذْكُرْ (স্মরণ কর) শব্দ উহ্য আছে বলে স্বীকার করেন। এর উত্তর হবে যে, সমস্ত বনী ইসরাইলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানা ছিল, তারা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছিল। সেজন্য তাদের জানা ঘটনাবলীর দিকেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হুযুর আলাইহিস সালাম না কারো কাছ থেকে লেখাপড়া শিখেছেন, না ইতিহাসের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছেন, না কোন ইতিহাসবেত্তার সান্নিধ্যে ছিলেন, না শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত কোন গোত্রের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে একমাত্র নূরে নবুওয়াতের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনভাবে জ্ঞানার্জনের কোন উপায় ছিল কি?

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (১২)

[নবী মুসলমানদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও নিকটতর।] দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলবী কাসেম সাহেব তাঁর রচিত 'তাহযীরুন নাস গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ এ আয়াতের اَوْلٰى শব্দের অর্থ হচ্ছে 'নিকটতর'।

তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়-'নবী মুসলমানদের কাছে তাঁদের প্রাণের চেয়েও 'নিকটতর'। আমাদের নিকটতম হচ্ছে আমাদের প্রাণ; এ প্রাণ থেকেও নিকটতর হচ্ছেন নবী আলাইহিস সালাম। বলা বাহুল্য যে, অতি নিকটে অবস্থিত বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। অত্যধিক নৈকট্যের কারণে আমরা তাঁকে (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চোখে দেখতে পাই না।

বিঃ দ্রঃ এখানে কিছু সংখ্যক লোক এ আপত্তিটা উত্থাপন করে থাকেন যে, আপনারা যেহেতু মুক্কাল্লিদ, আপনারদের জন্য কুরআনের আয়াত ও হাদীছ সমূহ থেকে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করাতো জায়েয নয়। একজন মুকাল্লিদের উচিত তার বক্তব্যের সমর্থনে স্বীয় ইমাম (মুজতাহিদ ইমাম) এর উক্তি পেশ করা। সুতরাং, আপনারা কেবল আবু হানীফা (রহঃ) এর উক্তিই পেশ করতে পারেন।

এর উত্তর কয়েকভাবে দেয়া যায়। (ক) আপনারা নিজেরাই যেহেতু 'হাযির-নাযির' না হওয়ার আকীদা পোষণ করেন, সেহেতু আপনাদেরই উচিত ছিল আপন আকীদা-এর সমর্থনে ইমাম সাহেব (রহঃ) এর উক্তি উপস্থাপন করা। (খ) আমি তকলীদের' আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আকীদা সম্পর্কিত কোন মাসআলায় তাকলীদ হয় না; কেবলমাত্র ফকীহগণের গবেষণালব্ধ মাসায়েলের ক্ষেত্রেই 'তকলীদ' প্রযোজ্য হয়। আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে 'আকীদা' এর একটি মাসআলা। (গ) মুকাল্লিদ সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীছ সমূহ থেকে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে। তবে হ্যাঁ এসব দলীলের ভিত্তিতে নিজে মাসায়েল বের করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে 'তাহাবী' শরীফে উল্লেখিত আছেঃ-

وَمَا فَهِمَ الاَحْكَامُ مِنْ نَحْوِالظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وَالْمُفَسَّرِ فَلَيْسَ مُخْتَصًا بِهٖ (اَىْ بِالْمُجْتَهِدِ) بَلْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ الاَعَمُّ

[যে সমস্ত আহকাম বা শরীয়ত বিধি কুরআনের 'যাহির' 'নাস' ও 'মুফাসসার' ইত্যাদি প্রকৃতির আয়াত থেকে সরাসরি সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় সে সকল মাসায়েলও মুজতাহিদের গবেষণা প্রসূত হতে হবে, এমন কথা বলা যায় না। এসব মাসায়েল বরং সাধারণ আলিমগণও বের করার সামর্থ রাখেন।

সুবিখ্যাত 'মুসাল্লামুছ ছবুত' নামক 'উসুলে ফিক্‌হ' এর গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

وَاَيْضًا شَاعَ وَذَاعَ احْتِجَاجُهُمْ سَلَفًا وَّخَلَفًا بِالْعُمُوْمَاتِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ

অর্থাৎ-অধিকন্তু, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করার রীতি

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্মীয় মনীষীদের মধ্যে কোনরূপ ওজর আপত্তি ছাড়াই প্রচলিত হয়ে আসছে। কুরআন করীমও ইরশাদ করছেঃ-

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যদি তোমরা না জান, তবে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করো। ইজতিহাদী মাসায়েল যেহেতু আমরা জানি না, সে জন্য আমরা ইমামদের অনুসরণ করি। আর সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতসমূহের অর্থ আমরা বুঝি, সেজন্য এসব ব্যাপারে তকলীদ নিষ্প্রয়োজন। (ঘ) 'হাযির-নাযির' এর মাসআলা সম্পর্কে সুবিখ্যাত ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও তাফসীরকারকদের উক্তিসমূহের বিশদ বর্ণনা পরবর্তী পরিচ্ছেদ সমূহেও করা হবে। গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন যে, 'হাযির-নাযির' এর এ আকীদা সমস্ত মুসলমানই পোষণ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

('হাযির-নাযির' বিষয়ক হাদীছ সমূহের বর্ণনা)

এখানে সে সমস্ত হাদীছের উল্লেখ করা হবে, যেগুলি 'ইল্‌মে-গায়ব' এর মাসআলায় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সে সব হাদীছের মধ্যে হাদীছ নং ৬, ৭, ৮ ও ৯ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেগুলোর মূল কথা হলো সমস্ত জগতকে আমি হাতের তালুর মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' 'আমার উম্মতকে তাদের নিজ নিজ আকৃতিতে আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়েছিল, আমি তদের নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম, এমন কি, তাদের ঘোড়াসমূহের বর্ণ সম্পর্কেও জ্ঞাত' ইত্যাদি...। এভাবে ওসব হাদীছের ব্যাখ্যায় হাদীছবেত্তাগণের যে সব উক্তি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো বিশেষ করে, 'মিরকাত', 'যুরকানী' ইত্যাদি গ্রন্থের ইবারতসমূহও এখানে বর্ণিত হবে। এ ছাড়া নিম্নে বর্ণিত হাদীছ সমূহও এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সুবিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ 'মিশকাত' শরীফের 'ইছবাতু আযাবিল কবর' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ

(১) فَيَقُوْلَانِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ

[মুনকার-নকীর ফিরিশতাদ্বয় কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, ওনার (মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কি ধারণা

পোষণ করতে?

হাদীছের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আশআতুল লমআত'-এ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ يعنى هذا الرجل كه فى گويند انحضرت رامى خواهند

অর্থাৎ هٰذَا الرَّجُل দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র গুণাবলী সত্ত্বার প্রতিই নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছেঃ-

یاباحضارذات شریف وی در عیانے به ایںطریق که در قبر مثالے وی علیه السلام حاضر ساخته باشند ودریں جابشارتے است عظیم مرمشتاقان غمزده راکه اگر برامیدایںشادی جان دهندوزنده در گوروند جائے دارد

[কিংবা কবরের মধ্যে হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র সত্ত্বাকে দৃশ্যতঃ উদ্ভাসিত করা হয়। এটা এভাবেই হয় যে, কবরে তাঁর জিসমে মিছালীকে উপস্থাপন করা হয়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর দীদারের প্রত্যাশী চিন্তিত ব্যক্তিবর্গের জন্য এটাই শুভ সংবাদ যে, তাঁরা যদি এ প্রত্যাশিত সাক্ষাতের আশায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কবরে চলে যান, তাহলে তাঁদেরও এ সুযোগ রয়েছে।]

'মিশকাত' শরীফের হাশিয়ায় সে একই হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ-

قِيْلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتّٰى يَرَى النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِىَ بُشْرٰى عَظِيْمَةٌ

অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি থেকে আবরণ উঠিয়ে নেয়া হয়, যার ফলে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায়। এটা তার জন্য বড়ই শুভ সংবাদ।

সুপ্রসিদ্ধ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'কুসতলানী'র ৩য় খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় 'কিতাবুল জানায়েযে' বর্ণিত আছেঃ

فَقِيْلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتّٰى يَرَى النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِىَ بُشْرٰى عَظِيْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ صَحَّ

অর্থাৎ-এও বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির দৃষ্টির আবরণ অপসারণ করা হয়, যার দরুণ সে নবী আলাইহিস সালামকে দেখতে পায়। এটি মুসলমানদের জন্য বড়

সুখের বিষয়, যদি সে সঠিক পথে থাকে।

কেউ কেউ উক্ত হাদীছে উল্লেখিতঃ هٰذَا الرَّجُلِ (এ ব্যক্তি) বলে হৃদয় ফলকে অংকিত হুযুর আলাইহিস সালাম এর মানসিক প্রতিচ্ছবির প্রতি ইঙ্গিত করা হয় বলে মত পোষণ করেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার অন্তরে যে মহান সত্ত্বার প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে?' কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে মৃত কাফির ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন করার যৌক্তিকতা থাকেনা। কারণ, কাফিরের অন্তরে হুযুর আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা থাকার কথা নয়। অধিকন্তু, তা যদি হত, মৃত কাফির সে প্রশ্নের উত্তরে বলত না-'আমি জানি না', বরং বলত 'আপনারা কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন'? উত্তরে তার لَا اَدْرِىْ (আমি জানি না) বলার ব্যাপার থেকে জানা যায় যে, সেও হুযুর আলাইহিস সালামকে স্বচক্ষে দেখে, তবে চিনতে বা পরিচয় করতে পারে না। সুতরাং, উক্ত প্রশ্নে মানসিক কোন প্রতিচ্ছবির কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না, বরং প্রকাশ্যে বিরাজমান সেই মহান সত্ত্বার প্রতি ইঙ্গিত করেই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

এ হাদীছ ও সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিসমূহ থেকে জানা যায় যে, কবরের মধ্যে হুযুর আলাইহিস সালামের দীদার লাভের সুবন্দোবস্ত করেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এ শামসুদ্দোহা বদরুদ্দুজা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি তোমার সামনেই দৃশ্যমান আছেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার কি মত?' هٰذَا (এই) সর্বনাম দ্বারা নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। এতে বোঝা যায়, হুযুর আলাইহিস সালামকে দেখিয়ে ও নিকটে উপস্থাপন করেই উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এজন্য সুফীয়ানে কিরাম ও আশেকগণ মৃত্যুর প্রত্যাশা করে থাকেন ও কবরের প্রথম রজনীকে বরের সঙ্গে প্রত্যাশিত সাক্ষাতের রাত রূপে গণ্য করেন। যেমন আ'লা হযরত (রহঃ) বলেনঃ

جان توجاتے ہی جائیگی قیامت یہ ہے -کہ یہاں مرنے پہ ٹھراھے نظارہ تیرا۔

অর্থাৎ প্রাণতো চলে যাবেই। এ প্রাণ যাবার ব্যাপারটি হচ্ছে 'কিয়ামত।' তবুও সুখের বিষয় যে, এর পর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাক্ষাত লাভের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। মৌলানা আসী বলেনঃ

آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی
جس کے جویاں تھے ھے اس گل کی ملاقات کی رات

অর্থাৎ কবরে গমনের প্রথম রাতে কাফন পরিহিত অবস্থায় এজন্য গর্ববোধ করব যে, যে ফুলের (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্নিধ্য লাভের সারাজীবন প্রত্যাশী হয়ে আসছি, আজ রাতই হচ্ছে সে ফুলের সংস্পর্শে আসার প্রকৃষ্ট সময়।

আমি আমার রচিত 'দীওয়ানে সালেক' কাব্য গ্রন্থে লিখেছিঃ-

مرقد کی پہلی شب ہے دو لہا کی شب
اس شب کے عیدصد قے اسکا جواب کیا۔

অর্থাৎ কবরের প্রথম রাত হচ্ছে সে মহান বরের (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লান) দর্শন লাভের সৌভাগ্য রজনী। একজন আশেক এর জন্য ঈদের আনন্দও এ রাত্রির অপূর্ব আনন্দের কাছে মূল্যহীন। এ রাতেই প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভের অনাস্বাদিত সুখানুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

এ জন্যই বুযুর্গানে দ্বীনের পরলোক গমনের দিনকে বলা হয় 'উরসের দিন'। 'উরস' শব্দের অর্থ হলো শাদী বা আনন্দ। ঐ দিনই হচ্ছে দু'-জাহানের 'দুলহা' عروس হুযুর আলাইহিস সালামের দর্শন লাভের দিন।

লক্ষ্যণীয় যে, একই সময় হাজার হাজার মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করা হয়ে থাকে। হুযুর আলাইহিস সালাম যদি 'হাযির-নাযির' না হন, তাহলে প্রতিটি কবরে তিনি উপস্থিত থাকেন কি রূপে? অতএব, প্রমাণিত হল যে, আমাদের দৃষ্টির উপরই আবরণ বা পর্দা রয়েছে, ফিরিশতাগণ এ পর্দা অপসারণ করে দেন। যেমন, কেউ দিনে তাবুর মধ্যে অবস্থান করছে বিধায় সূর্য তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, এমন সময় কেউ এসে উপর থেকে তাবু হটিয়ে তাকে সূর্য দেখিয়ে দিল।

(২) মিশকমাত শরীফের التحريص على قيام الليل শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ

اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَا ذَا اُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ

[এক রাতে হুযুর আলাইহিস সালাম ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জাগরিত হলেন, বিস্ময়াবিভূত হয়ে বলতে লাগলেন-'সুবহানাল্লা! আজ রাত কতই না ঐশ্বর্য সম্ভার ও ফিতনা (বালা, মুসীবত ইত্যাদি) অবতীর্ণ করা হলো!]

এ থেকে জানা যায় যে, ভবিষ্যতে যে সব 'ফিতনা' আত্মপ্রকাশ করবে, সেগুলো তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করছিলেন।

(৩) মিশকাত শরীফের المعجزات শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আনাস (রঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ

نَعَى النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَيْدًاوَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَّاتِيَهُمْ خَبْرُ هُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ (اِلَى) حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ يَعْنِى خَالِدَابْنَ الْوَلِيْدِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

[হযরত যায়েদ, জা'ফর ও ইবন রওয়াহা (রিদওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমায়ীন) প্রমুখ সাহাবীগণের শাহাদত বরণের সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসার আগেই হুযুর আলাইহিস সালাম মদীনার লোকদেরকে উক্ত সাহাবীগণের শহীদ হওয়ার কথা জানিয়ে দেন। তিনি বলেনঃ পতাকা এখন হযরত যায়দের (রাঃ) হাতে, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহর তলোয়ার' উপাধিতে ভূষিত সাহাবী হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জয় যুক্ত করলেন।]

. এতে বোঝা গেল, মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত যুদ্ধ ক্ষেত্র 'বে'রে মউনা'য় যা কিছু হচ্ছিল, হুযুর আলাইহিস সালাম তা' সুদূর মদীনা থেকে অবলোকন করছিলেন।

(৪) মিশকাত শরীফের ২য় খণ্ডের الكرامات অধ্যায়ের পরে وفاة النبى عليه السلام শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছেঃ-

وَاِنَّ مَوْاعِدَ كُمُ الْحَوْضُ وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَنَا فِىْ مَقَامِىْ

[তোমাদের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাতকারের জায়গা হল 'হাউজে কাউছার', যা আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।]

(৫) মিশকাত শরীফের تسوية الصف শিরোনামের অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ

اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَائِىْ

[নামাযে তোমাদের কাতার সোজা রাখ; জেনে রাখ, আমি তোমাদেরকে পেছনের দিক থেকেও দেখতে পাই।]

(৬) সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ 'তিরমিযী শরীফ' ২য় খণ্ডের 'বাবুল ইলম' এর অন্তর্ভুক্ত مَاجَاءَ فِىْ ذَهَابِ الْعِلْمِ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَشَخَصَ بِبَصَرِه اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا اَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لَا يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَيْئٍ

[একদা আমরা হুযুর আলাইহিস সালামের সাথেই ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি করে বললেনঃ ইহাই সে সময়, যখন জনগণ থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা এ জ্ঞানের কিছুই ধারণ করতে পারবে না।]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় হাদীছের সুবিখ্যাত ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তাঁর বিরচিত "মিরকাত" এর 'কিতাবুল ইলম' এ বলেছেনঃ-

فَكَاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ كُوْشِفَ بِاِقْتِرَابِ اَجَلِهِ فَاَخْبَرَ بِذَالِكَ

[অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম যখন আসমানের দিকে তাকালেন, তখন তাঁর নিকট প্রকাশ পায় যে তাঁর পরলোক গমনের সময় ঘনিয়ে আসছে। তখনই তিনি সে সংবাদ দিয়েদিলেন।

(৭) মিশকাত শরীফের 'বাবুল ফিতান' এর প্রারম্ভে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছেঃ হুযুর আলাইহিস সালাম একদা মদীনা মুনাওয়ারার এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, তা তোমরাও কি দেখছ?' আরয করলেনঃ 'জি, না। তখন তিনি ইরশাদ করেন;

فَاِنِّيْ اَرَي الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ

[অর্থাৎ আমি তোমাদের বাড়ীতে ফিতনাসমূহ একটির পর একটি বৃষ্টির মত পতিত হতে দেখতে পাচ্ছি।]

বোঝা গেল যে, কুখ্যাত ইয়াযীদ ও হাজ্জাজের শাসনামলে তথা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনতিকালের পরে যে সব ফিতনা-ফ্যাসাদ সংঘটিত হবার ছিল, সেগুলো তিনি অবলোকন করছিলেন। এগুলিই একটির পর একটি

আত্মপ্রকাশ করতে দেখতে পাচ্ছিলেন।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহের আলোকে একথাই জানা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম তাঁর সত্যদর্শী দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, দূরের ও নিকটের যাবতীয় অবস্থা, হাউজে কাউছার,বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি অবলোকন করেন। তাঁরই বদৌলতে তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত খাদিমগণকেও আল্লাহ তা'আলা এ শক্তি ও জ্ঞান দান করে থাকেন।

(৮) মিশকাত, শরীফের ২য় খণ্ডের باب الكرامات শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ হযরত উমর (রাঃ) হযরত সারিয়া (রাঃ) কে এক সেনা বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে 'নেহাওয়ান্দ' নামক স্থানে পাঠিয়েছিলেন। এর পর একদিন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় খুতবা পাঠের সময় চিৎকার করে উঠলেন। হাদীছের শব্দগুলো হলঃ

فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْحُ يَا سَارِيَةُ الْجَبَل

অর্থাৎ হযরত উমর (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় খুতবা পড়ার সময় চীৎকার করে বলে উঠলেন-'ওহে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে পিঠ দাও।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত সেনাবাহিনী থেকে বার্তা বাহক এসে জানানঃ আমাদিগকে শত্রুরা প্রায় পরাস্ত করে ফেলেছিল, এমন সময় কোন এক আহ্বানকারীর ডাক শুনতে পেলাম। উক্ত অদৃশ্য আহবানকারী বলছিলেনঃ 'সারিয়া! পাহাড়ের শরণাপন্ন হও।' তখন আমরা পাহাড়কে পিঠের পেছনে রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। এরপর আল্লাহ আমাদের সহায় হলেন, ওদেরকে পর্যুদস্ত করে দিলেন।

(৯) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর রচিত 'ফিকহে আকবর' গ্রন্থে ও আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ুতী (রহঃ) 'জামেউল কবীর' গ্রন্থে হযরত হারিছ ইবনে নুমান ও হারিছ ইবনে নুমান (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার আমি (হারিছ) হুযুর আলাইহিস সালামের খিদমতে উপস্থিত হই। সরকারে দু'জাহান আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে হারিছ, তুমি কোন অবস্থায় আজকের এ দিনটিকে পেয়েছ?" আরয করলামঃ খাটি মুমিন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার ঈমানের স্বরূপ কি? আরয করলামঃ-

وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُاِلٰى عَرْشِ رَبِّىْ بَارِزًا وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُاِلٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْهَا وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيْهَا

অর্থাৎ-আমি যেন খোদার আরশকে প্রকাশ্যে দেখছিলাম। জান্নাতবাসীদেরকে

পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং দোযখবাসীদেরকে অসহনীয় যন্ত্রণায় হট্টগোল করতে দেখতে পাচ্ছিলাম।

এ কাহিনীটি প্রসিদ্ধ 'মছনবী শরীফে'ও সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছেঃ-

ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من،
ہست پیدا ہمچوں بت ایں پیش ہهن
یك بیك دامی شناسم خلق را،
ہمچوگندم من زجودر آسیا.
که بهشتی که دزیگانه کی است
پیش من پیدا چو مورد ماهی است
من بگو یم یا فرو بندم نفس،
لب گزید ش مصطفے یعنی کہ بس،

ভাবার্থঃ হযরত হারিছ (রাঃ) বলছিলেন-আমার দৃষ্টির সামনে আটটি বেহেশত ও সাতটি দোযখ এমনভাবে উদ্ভাসিত, যেমন হিন্দুদের সামনে তাদের প্রতিমা বিদ্যমান রয়েছে। সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেকটি বস্তুকে এমনভাবে চিনতে পারছিলাম, যেমন গম চুর্ণ করার সনাতন চাক্কীর মধ্যে গম ও যবকে স্পষ্টরূপে চিনা যায়। জান্নাতবাসী দোযখবাসী মাছ ও পিঁপড়ার মত স্পষ্টরূপে আমার সামনে উদ্ভাসিত ছিল ইয়া রসুলুল্লাহ! এখানেই ক্ষান্ত হব, না আরো কিছু বলব? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, আর কিছু বলার দরকার নেই।

এখন লক্ষ্যণীয় যে, সূর্যের পরমাণু সদৃশ সাহাবীগণের দৃষ্টিশক্তির এ অবস্থা যে, বেহেশত-দোযখ, আরশ-পাতালপুরী,জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে দু'জাহানের সূর্য সদৃশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়ালাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলার অবকাশ আছে কি?

তৃতীয় অধ্যায়

(ফকীহ ও উলামায়ে উম্মতের উক্তিসমূহ থেকে 'হাযির-নাযির'-এর প্রমাণ)

(১) সুবিখ্যাত 'দুররুল মুখতার'-৩য় খণ্ডের – المرتد। অধ্যায়ের 'কারামাতে,

আওলিয়া' শীর্ষক আলোনায় উল্লেখিত আছেঃ

يَا حَاضِرُ يَا نَاظِرُ لَيْسَ بِكُفْرٍ অর্থাৎ হে হাযির, হে নাযির', বলে সম্বোধন করা 'কুফর' হিসেবে গণ্য নয়। উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যায় 'ফতোয়ায়ে শামী'তে উল্লেখিত আছেঃ-

فَاِنَّ الْحُضُوْرَ بِمَعْنَي الْعِلْمِ شَائِعٌ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَالنَّاظِرُ بِمَعْنَى الرُّوْيَةِ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى فَالْمَعْنَي يَاعَالِمُ مَنْ يَّرٰى

অর্থাৎ এর কারণ হলো "হুযুর" (حضور) শব্দটি জ্ঞান অর্থে বহুল প্রচলিত। কুরআন শরীফে আছেঃ "তিন জনের মধ্যে গোপনীয়ভাবে যা' কিছু পরামর্শ হয়ে থাকে, আল্লাহ তা'আলা ওদেরই 'চতুর্থজন' হিসেবে বিদ্যমান থাকেন।" আর, نظر 'নযর' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দেখা'। যেমন আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন, কেন, সে জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?" সুতরাং, 'ইয়া হাযিরু! ইয়া নাযিরু'! শব্দ দুইটির অর্থ হলো হে জ্ঞানী! হে দ্রষ্টা! অতএব, এ উক্তি 'কুফর' হতে পারে না।

'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে, প্রথম খণ্ডের كيفية الصلوة শীর্ষক অধ্যায়ে আছেঃ

وَيَقْصِدُ بِاَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْاِنْشَاءَ كَاَنَّهُ يُحَيِّ عَلَى اللّٰهِ وَيُسَلِّمُ عَلٰى نَبِيِّهٖ نَفْسِهٖ

অর্থাৎ নামাযে আততাহিয়াত' বা তাশাহুদ' এর শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময় নামাযীর এ নিয়ত থাকা চাই যে, কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন, তিনি নিজেই যেন আপন প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন ও স্বয়ং নবী আলাইহিস সালামের প্রতি সালাম আরয করছেন।

এ ইবারতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'ফত্ওয়ায়ে শামী'তে বলা হয়েছেঃ-

اَىْ لَايَقْصِدُ الْاَخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِى الْمِعْرَاجِ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ رَّبِّهٖ وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ

অর্থাৎ তাশাহুদ পাঠের সময় নামাযীর যেন এ নিয়ত না হয় যে, তিনি শুধু মাত্র মিরাজের অলৌকিক ঘটনাটি স্মরণ করে, সে সময় মহাপ্রভু আল্লাহ, হুযুর

আলাইহিস সালাম ও ফিরিশতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন এর বাক্যগুলোই আওড়িয়ে যাচ্ছেন। বরং তার নিয়ত হবে কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন।

স্বনামখ্যাত ফকীহগণের উপরোল্লিখিত ইবারতসমূহ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'হাযির নাযির' জ্ঞান করা বা বলা 'কুফর' নয়, আর তাশাহহুদ' পাঠের সময় হুযুর আলাইহিস সালামকে 'হাযির-নাযির জেনেই সালাম আরয করা চাই। এ তাশাহহুদ প্রসঙ্গে ফকীহগণের আরও অনেক বক্তব্য পেশ করা হবে।

সুপ্রসিদ্ধ 'মজমাউন বরকাত' গ্রন্থে শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেছেনঃ

وی علیہ السلام براحوال واعمال امت مطلع است بر مقر بان وخاصان درگاہ خود مفیض وحاضر وناظر است

অর্থাৎ হুযুর আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের যাবতীয় অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত এবং তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত সকলেই ফয়েয প্রদানকারী ও 'হাযির-নাযির'।

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) سلوك اقرب السبل بالتوجہ الى سيد الرسل নামক পুস্তিকায় বলেনঃ

باچندیں اختلاف وکثرت مذاہب کہ درعلماء امت ہست یك کس رادریں مسئلہ خلافی نیست کہ آں حضرت علیہ السلام بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتوہم تاویل دائم وباقی است وبر اعمال امت حاضر وناظر است ومر طالبان بحقیقت راومتوجہان انحضرت رامفیض ومربی (ادخال اسان)

অর্থাৎ উলামায়ে উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রকৃত জীবনেই (কোনরূপ রূপক ও ব্যবহারিক অর্থে যে জীবন, তা নয়) স্থায়ীভাবে বিরাজমান ও বহাল তবীয়তে আছেন। তিনি উম্মতের বিশিষ্ট কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত ও সেগুলোর প্রত্যক্ষদর্শীরূপে বিদ্যমান তথা 'হাযির'নাযির'। তিনি হাকীকত অন্বেষণকারী ও মহান দরবারে নবুয়াতের শরণাপন্নদের ফয়েযদাতা ও মুরুব্বীরূপে বিদ্যমান আছেন।

শাইখ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) 'শরহে ফুতুহুল গায়ব' গ্রন্থের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

اما انبياء عليهم السلام بحيات حقيقي دنيا وى حى وباقى ومتصرف اندرين جاسخن نيست -

অর্থাৎ নবীগণ (আলাইহিস সালাম) পার্থিব প্রকৃত জীবনেই জীবিত, শাশ্বত জীবন সহকারে বিদ্যমান ও কর্মতৎপর আছেন। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই।

'মিশকাত শরীফের' ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাত' এর بَاب مَايُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَتْ الْمَوْتُ শীর্ষক অধ্যায়ের শেষে উল্লেখিত আছেঃ

وَلَاتُبَاعِدُ عَنِ الْاَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِيَتُ لَهُمُ الْاَرْضُ وَحَصَلَ لَهُمْ اَبْدَ- انٌ مُكْتَسِبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَجَدُوْ هَا فِى اَمَا كِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِى اٰنٍ وَاحِدٍ

অর্থাৎ ওলীগণ একই মুহূর্তে কয়েক জায়গায় বিচরণ করতে পারে। একই সময়ে তাঁরা একাধিক শরীরের অধিকারীও হতে পারেন।

'শিফা' শরীফে আছেঃ-

اِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ اَحَدٌ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

যে ঘরে কেউ থাকে না, সে ঘরে (প্রবেশ করার সময়) বলবেন 'হে নবী! আপনার প্রতি সালাম; আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!

এ উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বনামখ্যাত মোল্লা 'আলী কারী (রহঃ) 'শরহে শিফা' গ্রন্থে বলেছেনঃ-

لِاَنَّ رُوْحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِي بُيُوْتِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ

কেননা, নবী আলাইহিস সালাম এর পবিত্র রূহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছেন।

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) স্বরচিত 'মদারেজুন নবুয়াত' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ-

ذکر کن اوراودرود بفرست بروے علیہ السلام وباش در حال ذکر گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات ومی بینی تو اورا متادب باجلال وتعظیم وهیبت وحیاو بدانکه وے علیه السلام می بیند وحی شنود کلام ترازیراکه وے علیه السلام متصف است بصفات اله ویکے از صفت الهی انست که انا جلیس من ذکرنی

হুযুর আলাইহিস সালামকে স্মরণ করুন, তাঁর প্রতি দরুদ পেশ করুন, তাঁর যিকর করার সময় 'এমনভাবে অবস্থান করুন, যেন তিনি আপনার সামনে জীবিতাবস্থায় উপস্থিত আছেন, আর আপনি তাঁকে দেখছেন। আদব, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন রেখে ভীত ও লজ্জিত থাকুন এবং এ ধারণা পোষণ করবেন যে, হুযুর পুর নুর আলাইহিস সালাম আপনাকে দেখছেন; আপনার কথাবার্তা শুনছেন। কেননা তিনি খোদার গুণাবলীতে গুণান্বিত। আল্লাহর একটি গুণ হচ্ছে-'আমি (আল্লাহ) আমার স্মরণকারীর সঙ্গে সহাবস্থান করি।'

ইমাম ইবনুল হাজ্জ مدخل গ্রন্থে ও ইমাম কুসতালানী (রঃ) مواهب গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ২য় পরিচ্ছেদে زيارة قبره شريف শীর্ষক বর্ণনায় লিখেছেনঃ-

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاءُ نَا لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيٰوتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَدَ بِهِ لِاُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِاَحْوَالِهِمْ وَنِيَا تِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِ هِمْ وَذٰلِكَ جَلِيٌّ عِنْدَهُ لَاخَفَاءَ بِهِ

আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন যে, হুযুর আলাইহিস সালামের জীবন ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি নিজ উম্মতকে দেখেন, তাদের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট, কোনরূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই এখানে।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাতে' মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ-

وَقَالَ الْغَزَالِي سَلِّمْ عَلَيْهِ اِذَا دَخَلْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْضُرُ فِي الْمَسْجِدِ

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেছেন, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন, তখন হুযুর আলাইহিস সালামকে সশ্রদ্ধ সালাম দিবেন। কারণ তিনি মসজিদসমূহে

বিদ্যমান আছেন।

কাযী আয়ায (রহঃ) প্রণীত শিফা শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নসীমুর রিয়ায' এর ৩য় খণ্ডের শেষে উল্লেখিত আছেঃ

اَلْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ جِهَةِ الْاَجْسَامِ وَالظَّوَاهِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَبَوَاطِنُهُمْ وَقُوَاهُمُ الرُّوْحَانِيَّةُ مَلَكِيَّةٌ وَلِذَا تَرَى مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تَسْمَعُ اَطِيْطَ السَّمَاءِ وَتَشُمُّ رَائِحَةَ جِبْرَائِيْلَ اِذَا اَرَادَ النُّزُوْلَ اِلَيْهِمْ

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিস সালাম) শারীরিক ও বাহ্যিক দিক থেকে মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, তবে আভ্যন্তরীণ ও রূহানী শক্তির দিক থেকে ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ কারণেই তাঁরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সমূহ দেখতে পান, আসমানের চিড়চিড় আওয়াজ শোনেন এবং হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) তাঁদের নিকট অবতরণের ইচ্ছা পোষণ করতেই তাঁর সুঘ্রাণ পেয়ে যান।

সুপ্রসিদ্ধ 'দালায়েলুল খায়রাত' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখিত আছেঃ

وَقِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ صَلٰوةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَّاْتِىْ بَعْدَكَ مَاحَالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ اَسْمَعُ صَلٰوةَ اَهْلِ مُحَبَّتِىْ وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَىَّ صَلٰوةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا-

হুযুর আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ আপনার থেকে দূরে অবস্থানকারী ও পরবর্তীকালে ধরাধামে আগমনকারীদের দরূদ পাঠ আপনার দৃষ্টিতে কি রকম হবে? ইরশাদ করেনঃ আন্তরিক, অকৃত্রিম ভালবাসা সহকারে দরূদ পাঠকারীদের দরূদ আমি নিজেই শুনি এবং তাদেরকেও চিনি। আর যাদের অন্তরে আমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা নেই, তাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

কাযী আয়ায (রহঃ) এর 'শিফা শরীফের' ২য় খণ্ডে আছেঃ-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ اَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

হযরত 'আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, "যখন আমি মসজিদে প্রবেশ করি, তখন বলি-'হে নবী। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রতি সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।" এ হাদীছটির সমর্থন পাওয়া যায় সুবিখ্যাত 'আবু দাউদ' ও 'ইবনে মাজা' হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ের باب الدعاء عند دخول المسجد শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ থেকেও।

'মদারেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থের ৪৫০ পৃষ্ঠায় ২য় খণ্ডের ৪র্থ ভাগের حيات انبياء শীর্ষক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছেঃ-

اگر بعد ازاں گویند که حق تعالي جسد شريف را حالتے وقدرتے بخشيده است كه درهر مكانے كه خواهد تشريف بخشد خواه بمثال خوه بعينيه خواه بر آسمان خواه برزمين خواه درقبر ياغيروے صورتے داردبا جو دثبوت نسبت- خاص بقبر درهمه حال

এরপর যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর আলাইহিস সালাম এর পবিত্র শরীরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন ও এমন এক শক্তি দান করেছেন যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে স্বশরীরে বা অনুরূপ কোন শরীর ধারণ করে অনায়াসে গমন করতে পারেন, কবরের মধ্যে হোক বা আসমানের উপর হোক, এ ধরনের কথা সঠিক ও বাস্তবসম্মত। তবে, সর্বাবস্থায় কবরের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় থাকে।

শাইখ শিহাবুদ্দিন সুহরওয়ার্দী (রহঃ) রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'আওয়ারিফুল মা আরিফ' গ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থ 'মিসবাহুল হিদায়েত' এর ১৬৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ-

بس بايد كه بندهمچناكه حق سبحانه راپيوسته بر جميع احوال خود ظاهرا وباطنا واقف ومطلع بيند رسول الله عليه السلام رانيز ظاهر وباطن حاضر داند تامطالعه صورت تعظيم ووقار اوهمواره به محافظت اداب حضرتش دليل بود وانه

مخالفت وى سراواعلاناشرم دارد و هيچ دقيقه ازدقائق اداب صحبت اوفرونه گزارد،

অতএব, বান্দা যেমন আল্লাহ তা'আলাকে সর্বাবস্থায় গুপ্ত ও ব্যক্ত, যাবতীয় বিষয়ে অবহিত জ্ঞান করে থাকে, হুযুর আলাইহিস সালামকেও তদ্রূপ জাহিরী ও 'বাতিনী' উভয় দিক থেকে 'হাযির' জ্ঞান করা বাঞ্ছনীয়; যাতে তাঁর আকৃতি বা 'সুরত' দেখার ধারণা, হার-হামিশা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাঁর দরবারের আদব রক্ষার দলীলরূপে পরিগণিত হয়, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লজ্জাবোধ হয় এবং তাঁর পবিত্র সহচর্যের আদব রক্ষা করার গৌরব লাভের সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ফিক্‌হ শাস্ত্র বিশারদ ও উলামায়ে উম্মত এর উপরোক্ত উক্তিসমূহ থেকে হুযুর আলাইহিস সালামের 'হাযির-নাযির' হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল। এখন আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, একজন নামাযীর নামায পড়ার সময় হুযুর আলাইহিস সালাম সম্পর্কে অন্তরে কি ধারণা পোষণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আমি অত্র পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দুররুল মুখতার' ও 'শামী' থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি। অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীনের আরও কিছু বক্তব্য শুনুন এবং নিজ নিজ ঈমানকে তাজা করুন।

'আশআতুল লম'আত' গ্রন্থের কিতাবুস সালাত' এর 'তাশাহুদ' অধ্যায়ে ও মদারেজুন নবুয়াত' গ্রন্থ ১ম খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় ৫ম অধ্যায়ে 'হুযুর আলাইহিস সালাম-এর ফযায়েল-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে শাইখ আবদুর হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেছেনঃ-

وبعضےعرفاگفته اند كه اين خطاب بجهت سريان حقيقت محمد يه است در ذرائر موجودات وافاد ممكنات پس انحضرت در ذات مصليان موجود وحاضر است پس مصلي رابايد كه ازين معنى اگاه باشد وازين شهودغافل نه بوتا انوارقرب واسرار معرفت منور وفائز گردد

কোন কোন 'আরিফ' ব্যক্তি বলেছেন-'তাশাহুদে' 'আসসালামু আলাইকুম আইয়ুহাননবী' বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করার রীতির এ জন্যই প্রচলন করা হয়েছে যে, 'হাকীকতে মুহাম্মদীয়া' (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহিস সালাম এর মৌল সত্ত্বা) সৃষ্টিকূলের অণুপরমাণুতে,এমনকি সম্ভবপর প্রত্যেক কিছুতেই ব্যাপৃত। সুতরাং, হুযুর আলাইহিস সালাম নামাযীগণের সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান ও 'হাযির' আছেন। নামাযীর এ বিষয়ে সচেতন হওয়া, বা এ বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাতে নামাযী নৈকট্যের নূর লাভে ও মা'রেফতের গুপ্ত রহস্যাবলী উন্মোচনে সফলকাম হতে পারে।

সুবিখ্যাত 'ইহয়াউল উলুম গ্রন্থ ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে নামাযের বাতেনী শর্তাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন

وَلَحْضِرْ فِىْ قَلْبِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

নবী আলাইহিস সালাম তথা তাঁর পবিত্র সত্ত্বাকে নিজ অন্তরে 'হাযির' জ্ঞান করবেন ও বলবেন 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহাননবীউ ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। (হে নবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকতের অমৃতধারা বর্ষিত হোক।) 'মিরকাত গ্রন্থের 'তাশাহুদ' শীর্ষক অধ্যায়েও এরকম উক্তি বর্ণিত আছে-

مسك الختام নামক গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায়ও ওহাবীমতাবলী নবাব সিদ্দিক হুসেন খান ভূপালী সে একই কথা লিখেছেন, যা' আমি ইতোপূর্বে 'আশআতুল লম 'আত' এর বরাত দিয়ে 'তাশাহুদ' প্রসঙ্গে লিখেছি যে, নামাযীর তাশাহুদ পাঠের সময় হুযুর আলাইহিস সালামকে 'হাযির-নাযির' জেনেই সালাম করা চাই। তিনি উক্ত গ্রন্থে নিম্নোল্লিখিত দু'টি পংক্তি সংযোজন করেছেনঃ-

درراه عشق مرحلئه قرب وبعد نيست
مي بينمت عيان ودعامي فرستمت

অর্থাৎ প্রেমের রাস্তায় দূরের বা কাছের কোন ঠিকানা নেই। আমি তোমাকে দেখি ও দুআ করি।

আল্লামা শাইখ মুজাদ্দিদ (রহঃ) বলেনঃ-

وَخُوْطِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَّهُ اشَارَةٌ اِلَي اَنَّهُ تَعَالَي يَكْشِفُ لَهُ عَنِ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ اُمَّتِه حَتّي يَكُوْنَ كَالْحَاضِرِ يَشْهَدُ لَهُمْ بِالْعَقْلِ اَعْمَالَهُمْ وَلِيَكُوْنَ تَذَكُّرُ حُضُوْرِه سَبَبًا لِمَزِيْدِ الْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ:-

নামাযে হুযুর আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা যেন এ কথারই ইঙ্গিত বহ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের উম্মতদের মধ্যে নামাযীদের

অবস্থা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে এমনভাবে উদ্ভাসিত করেছেন যেন তিনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থেকেই সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন, তাদের আমলসমূহ অনুধাবন করছেন। এ সম্বোধনের আরও একটি কারণ হচ্ছে তাঁর এ উপস্থিতির ধারণা অন্তরে অতিমাত্রায় বিনয় ও নম্রতার ভাব সৃষ্টি করে।

'হাযির-নাযির'এর এ মাসআলার সহিত ফিকাহ শাস্ত্রের কয়েকটি মাসায়েলের সমাধানও সম্পৃক্ত। যেমন ফকীহগণ বলেন, স্বামী যদি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে থাকে, আর স্ত্রী রয়েছে পশ্চিম প্রান্তে। এমতাবস্থায় স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করল এবং. স্বামী সেই শিশুটি তার বলে দাবী করল। তা'হলে শিশুটি তারই সাব্যস্ত হবে। কারণ স্বামী আল্লাহর ওলী হতে পারেন এবং কেরামতের বদৌলতে স্ত্রীর কাছে পৌছতে পারেন। 'ফত্ওয়ায়ে শামী' ২য় খণ্ডের ثبوت النسب অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ফত্ওয়ায়ে শামী, ৩য় খণ্ডের অধ্যায়ে 'কারামাতে আওলিয়া' বিষয়ক বর্ণনায় উল্লেখিত আছেঃ-

وَطَىُّ الْمَسَافَةِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوِيَتْ لِىَ الْاَرْضُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَاقَالُو افِيْمَنْ كَانَ فِي الْمَشْرِقِ وَتَزَوَّجَ اِمْرَاةً بِالْمَغْرِبِ فَاَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ وَفِى التَّتَارِ خَانِيَةِ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ تُؤَيِّدُ الْجَوَازَ

এ দূরত্ব অতিক্রম করাটা সে একই কেরামতের অন্তর্ভুক্ত। এটা এজন্য সম্ভবপর যে, হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, আমার জন্য পৃথিবীকে সঙ্কুচিত করে দেয়া হয়েছিল।" এতে ফকীহগণের নিম্নোক্ত মাসআলাটিরও সমাধান হয়ে যায়। মাসআলাটি হলঃ পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থানকারী কোন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং সে স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে শিশুটি উক্ত স্বামীর বলে গণ্য হবে। 'তাতারখানিয়া' নামক গ্রন্থে আছে যে, এ মাসআলাটি 'কেরামত' এর বৈধতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

সে একই জায়গায় 'শামী'তে আরও উল্লেখিত আছেঃ

وَالْاِنْصَافُ مَاذَكَرَهُ الْاِمَامُ النَّسَفِي حِيْنَ سُئِلَ عَمَّا يُحْكَى اَنَّ الْكَعْبَةَ كَانَتْ تَزُوْرُوَاحِدًامِنَ الْاَوْلِيَاءِ هَلْ يَجُوْزُ الْقَوْلُ بِهِ فَقَالَ نَقْضُ الْعَادَةِ عَلَى سَبِيْلِ الْكَرَامَةِ لِاَهْلِ الْوِلَايَةِ جَائِزٌ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ

সেটাই যা' ইমাম নাসাফী (রহঃ) একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। তাঁকে

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কথিত আছে যে কা'বা শরীফ কোন এক ওলীর সহিত সাক্ষাত করার জন্য গমনাগমন করে-এ কথা বলাটা 'জায়েয' হবে কিনা?' এর উত্তরে তিনি বলেছেন, আওলিয়া কিরামের দ্বারা 'কেরামত'হিসেবে অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী কার্যাবলী সম্পাদন আহলে সুন্নাতের' মতে জায়েয।

এ উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল যে, পবিত্র কা'বা মুয়াজ্জমাও আওলিয়া কিরামের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ঘুরাঘুরি করে থাকে।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' সুরা মুলক এর শেষে উল্লেখিত আছেঃ

قَالَ الْاِمَامُ الْغَزَالِىُّ وَالرَّسُوْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ الْخِيَارُ فِي طَوَافِ الْعَالَمِ مَعَ اَرْوَاحِ الصَّحَابَةِ لَقَدْرَاٰهُ كَثِيْرٌ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ

ইমাম গাযযালী বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের রূহসমেত হুযুর আলাইহিস সালামের জগতে পরিভ্রমণের ইখতিয়ার আছে বিধায় অনেক আওলিয়া কিরাম তাঁকে দেখেছেন।

انتباه الاذكياء فى حياة الاولياء নামক গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ুতী (রহঃ) বলেনঃ

اَلنَّظَرُ فِي اَعْمَالِ اُمَّتِهِ وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالدُّعَاءُ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ وَالتَّرَدُّدُ فِى اَقْطَارِ الْاَرْضِ وَالْبَرَكَةُ فِيْهَا وَحُضُوْرُ جَنَازَةِ مِنْ صَالِحِى اُمَّتِهِ فَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمُوْرَ مِنْ اَشْغَالِهِ كَمَاوَرَدَتْ بِذٰلِكَ الْحَدِيْثُ وَالْاٰثَارُ

উম্মতের বিবিধ কর্ম-কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশির ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদেরকে বালা মসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দু'আ করা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ উম্মতের কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তাঁর জানাযাতে অংশ গ্রহণ-এগুলোই হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালাম এর সখের কাজ। কোন কোন হাদীছ থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) المنقذمن الضلا ل নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ

ارباب قلوب مشاهده مى كنند دربيدارى انبياء وملائكه راوهمكلام مى شوند بايشا ن

ঐশী নূরে আলোকিত অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাগ্রত অবস্থায় নবী ও ফিরিশতাগণকে দেখতে পান, তাঁদের সাথে কথাবার্তাও বলেন। সয়ূতী (রহঃ) বলেন,

اِن اعتَقَدَالنَّاس اَنَّ رُوْحَهُ وَمِثَالَهُ فِىْ وَقْتِ قِرَاءَةِ الْمَوْلِدِ وَخَتْمِ رَمَضَانَ وَقِرَاءَةِ الْقَصَائِدِ يَحْضُرُجَازَ

যদি কেউ বিশ্বাস পোষণ করে যে, হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র রূহ ও তাঁর 'জিসমে মিছালী' মীলাদ পাঠের সময়, রমযানে খতমে কুরআনের সময় এবং না'ত পাঠ করার সময় উপস্থিত হন, তবে এ বিশ্বাস পোষণ করা 'জায়েয'।

মওলবী আবদুল হাই সাহেব তাঁর রচিত تراويح الجنان بتشر يح حكم شرب الدخان নামক রিসালায় লিখেছেনঃ জনৈক ব্যক্তি না'ত পাঠ করতো এবং হুক্কাও পান করতো। সে একদিন স্বপ্নে দেখল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম তাকে বলছেন-'যখন তুমি মীলাদ শরীফ পাঠ কর, তখন আমি মাহফিলে উপস্থিত হই। কিন্তু যখনই হুক্কা আনা হয়, তখন আমি কালবিলম্ব না করে মাহফিল থেকে ফিরে যাই।"

এসব উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হল যে, জগতের অণু-পরমাণুর প্রতিও হুযুর আলাইহিস সালাম-এর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। আর, নামায, তিলাওয়াতে কুরআন, মাহফিলে মীলাদ শরীফ ও না'ত পাঠের মাহফিলে বিশেষ করে পুণ্যাত্মাদের নামাযে জানাযায় স্বশরীরে তিনি তশরীফ আনয়ন করে থাকেন।

তাফসীরে রূহুল বয়ান ২৬ পারা 'সুরা ফত্হ' এর اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا আয়াত এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

فَاِنَّهُ لَمَّا كَانَ اَوَّلَ مَخْلُوْقٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ كَانَ شَاهِدًا بِوَحْدَانِيَّةِ الْحَقِّ وَشَاهِدًابِمَا اُخْرِجَ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ مِنَ الْاَرْوَاحِ وَالنُّفُوْسِ وَالْاَجْرَامِ وَالْاَرْكَانِ وَالْاَجْسَادِ وَالْمَعَادِنِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيْوَانِ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّ وَالشَّيْطٰنِ وَالْاِنْسَانِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِئَلَّا يَشُذَّ عَنْهُ مَايُمْكِنُ لِلْمَخْلُوْقِ مِنْ اَسْرَارِ اَفْعَالِهِ وَعَجَائِبِهِ –

যেহেতু হুযুর আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি, সেহেতু তিনিই আল্লাহর একত্বের সাক্ষী, সে সব বস্তুরও অবলোকনকারী, যেগুলি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে এসেছে। যেমন মানবাত্মা, জীবাত্মা শারীরিক

কাঠামো, খনিজ পদার্থ, বৃক্ষরাজি, পশু পক্ষী, ফিরিশতা, মানুষ ইত্যাদি। সুতরাং, খোদা-তা'আলার সেসব গুপ্ত ভেদ ও বিস্ময়কর ব্যাপারগুলোও যেগুলির রহস্য উন্মোচন অন্য কোন মাখলুকের জন্য সম্ভবপর নয়, তাঁর কাছে রহস্যাবৃত ও অনুদ্ঘাটিত থাকার কোন অবকাশ থাকে না। সে একই জায়গায় আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর বলা হয়েছেঃ

فَشَاهَدَ خَلْقَهُ وَمَاجَرَاىَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِكْرَامِ وَالْاِخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ وَمَاتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِلَى اٰخِرِ مَاجَرٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَشَاهَدَ خَلْقَ اِبْلِيْسَ وَمَاجَرٰى عَلَيْهِ

তিনি দেখেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টি, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভুলের কারণে বেহেশত থেকে তাঁর অপসারণ এবং পরে তাঁর তওবা গৃহীত হওয়ার যাবতীয় ঘটনাবলী। শেষ পর্যন্ত সেই আদম আলাইহিস সালামকে কেন্দ্র করে যা কিছু আবর্তিত হয়েছে, সবই তিনি (সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম) দেখেছেন। তিনি আরো দেখেছেন শয়তানের সৃষ্টি ও যা' কিছু তাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দৃশ্যমান জগতে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম) অভিব্যক্তির পূর্বেই প্রত্যক ব্যক্তি ও বস্তুর যাবতীয় অবস্থা তিনি অবলোকন করেছেন।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে উক্ত 'রূহুল বয়ানের' স্বনামধন্য লেখক সে একই বর্ণনায় আরও বলেছেনঃ

قَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ اِنَّ مَعَ كُلِّ سَعِيْدٍ رَفِيْقَةً مِنْ رُوْحِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِىَ الرَّقِيْبُ الْعَتِيْدُ عَلَيْهِ وَلَمَّا قُبِضَ الرُّوْحُ الْمُحَمَّدِىُّ مِنْ اٰدَمَ الَّذِىْ كَانَ بِهٖ دَائِمًا لَا يَضِلُّ وَلَا يَنْسٰى جَرٰى عليه مَاجَرٰى مِنَ النِّسْيَانِ وَمَا يَتْبَعُهُ

কোন কোন বুযুর্গানে দ্বীন বলেন-প্রত্যেক পুণ্যাত্মার সাথে হুযুর আলাইহি সালামের পবিত্র রূহ অবস্থান করে। رقيب عتيد শব্দদ্বয় দ্বারা ইহাই বোঝানো হয়েছে। যে সময় রূহে মুহাম্মদীর স্থায়ী তাওজ্জুহ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে অন্যত্র সরে গেল তখনই তিনি ভুল করে বসলেন এবং তার ফলশ্রুতিতে যা' হবার তা'ই হয়েছে। একটি হাদীছে উল্লেখিত আছে যে, যখন কোন ব্যভিচারকারী অবৈধ যৌন মিলন লিপ্ত হয়, তখন তার নিকট থেকে ঈমান বের হয়ে যায়।

উক্ত তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' এ জায়গায় বলা হয়েছে, এখানে ঈমান বলতে হুযুর পাকের দৃষ্টিকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে মুমিনবান্দা কোন ভাল কাজ করেন, তা হুযুর আলাইহিস সালাম এর কৃপা দৃষ্টির বরকতেই সম্পন্ন করেন। যে পাপ কাজ করে, হুযুরের দৃষ্টি অপসারণের ফলশ্রুতিতে সেই পাপ কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ থেকে হুযুর আলাইহিস সালামের 'হাযির-নাযির' হওয়ার বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রতিভাত হল।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) স্বরচিত 'কসিদায়ে নু'মান' নামক প্রশংসা মূলক কাব্যগ্রন্থে বলেছেনঃ

وَاِذَاسَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلاً طَيِّبًا :- وَاِذَانَظَرْتُ فَلَارَاى اِلَّاكَ

অর্থাৎ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সম্বোধন করে বলছেন, হে নবী! যখনই আমি কিছু শুনি, শুধু আপনার প্রশংসাই শুনি; আর যখন কোনদিকে তাকাই, তখন আপনি ছাড়া আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইমাম সাহেব (রহঃ) কুফাতে অবস্থান করে চারিদিকে হুযুর আলাইহিস সালামকে দেখতে পান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(ভিন্ন মতাবলম্বীদের রচিত পুস্তকসমূহ থেকে 'হাযির নাযির' এর প্রমাণ)

'তাহ্যিরুন্নাস' কিতাবের ১০ পৃষ্ঠায় দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলবী কাসেম সাহেব বলেন, আয়াত اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিশ্বাসী লোকদের কাছে তাঁদের প্রাণের চেয়ে নিকটতম] এর مِنْ اَنْفُسِهِمْ অংশটুকুর শব্দ বিন্যাস ও ব্যবহৃত অন্বিত অব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের সাথে রসুল আলাইহিস সালামের এমন নৈকট্যের সম্পর্ক আছে যে, তাঁদের প্রাণের সাথেও সেরূপ নৈকট্য নেই। কেননা, উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত اَوْلٰى শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিকটতর।' মওলবী ইসমাইল দেহলবী রচিত সিরাতে মুস্তাকীম গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠার তরজুমার 'চতুর্থ হিদায়েত' ইশকের বর্ণনায় আগুন ও কয়লার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে-এভাবে যখন খোদা অন্বেষী সাধকের পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মসত্ত্বাকে রহমানী আকর্ষণ ও ভাবাবেশের তরঙ্গমালা 'আহাদিয়াত' এর সমুদ্র সমূহের গভীরে টেনে নিয়ে যায়, তখন 'আনাল হক' ও 'আমার জুবানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নেই'

প্রভৃতি বাক্য সে সাধকের মুখ থেকে নির্গত হতে থাকে। সাধকের এ অবস্থার কথাই বর্ণিত হয়েছে 'হাদীছে কুদসীতে' যেখানে বলা হয়েছে-

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُبِهٖ....

(আমি সে প্রিয় বান্দার কান হয়ে যাই, যদ্দারা তিনি শুনেন, তাঁর চোখ হয়ে যাই, যদ্দারা তিনি দেখেন। এ ইবারতে একথা স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে যে মানুষ যখনই 'ফানা ফিল্লাহ' এর স্তরে উপনীত হয়, তখন সে খোদার শক্তিতেই দেখে, শুনে, ধরে ও কথা বলে। অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক কিছুই দেখে, দূরের ও নিকটের যাবতীয় কিছু স্পর্শ করে। এটিই হচ্ছে 'হাযির-নাযির' এর অর্থ। যখন সাধারণ মানুষ 'ফানাফিল্লাহ' এর স্তরে গিয়ে মর্যাদার এরূপ আসনে অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে জীন ও মানব জাতির সর্দার আলাইহিস সালাত ওয়াসাল্লাম, যাঁর 'ফানাফিল্লাহের স্তরে অন্য কেউ উপনীত হতে পারে না, সর্বোচ্চ স্তরের হাযির-নাযির হবেন বৈকি।

'ইমদাদুস সুলুক' নামক গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠায় মওলবী রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী লিখেছেনঃ-

هم مريد بيقين داند كه روح شيخ بيك مكان نيست پس
هرجاكه مريد باشد قريب يابعيد اگر چه از شيخ دوراست اما
روحانيت او دور نيست چوں ايں امر محكم داردهر وقت شيخ
زيباد داردوربط قلب پيدا ايد وهردم مستفيد بود مريد درحال
واقعه محتاج شيخ بود شيخ را بقلب حاضر آورده بلسان حال
سوال كند البته روح شيخ باذن الله تعالى القاء خواهد كرد مگر
ربط تام شرط است وبسبب ربط قلب شيخ را لسان قلب ناطق
مى شود وبسوئے حق تعالى راه مى كشايد وحق تعالى اورا
محدث مى كند،

অর্থাৎ মুরীদের এও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, পীরের রূহ এক জায়গায় আবদ্ধ নয়। মুরীদ দূরে বা নিকটে যেখানে হোক না কেন, এমনকি পীরের পবিত্র শরীর থেকে দূরে হলেও পীরের রূহানিয়ত কিন্তু দূরে নয়। যখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল, তখন পীরকে সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে হবে, যাতে তার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক প্রকট হয়ে উঠে এবং মুরীদ এর উপকারিতা লাভে ধন্য হতে থাকে। মুরীদ যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, সে অবস্থায় পীরের মুখাপেক্ষী থাকে। পীরকে আপন অন্তরে হাযির করে স্বীয় অবস্থার মাধ্যমে পীরের নিকট লক্ষ্য বস্তুর প্রার্থী হতে হবে,

আল্লাহর হুকুমে পীরের রূহ পার্থিব বিষয়টি মুরীদের অন্তরে অবশ্যই ইলকা করবেন। কিন্তু এর জন্য শর্ত হচ্ছে-পীরের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। পীরের সহিত সম্পর্কের কারণেই অন্তর বাক্যময় হয়ে উঠে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথ উদ্ঘাটিত হয়, আল্লাহ তাঁকে ইলহাম' প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন করে দেন।

এ ইবারতে নিম্নলিখিত কথা কয়টি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছেঃ (১) মুরীদের কাছে পীরের 'হাযির-নাযির' হওয়া, (২) পীরের ধ্যানে মুরীদের রত থাকা, (৩) পীরের হাজত পূরণের ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া, (৪) খোদাকে বাদ দিয়ে মুরীদের প্রার্থিত বিষয়ে পীরের কাছে প্রার্থী হওয়া (৫) মুরীদের অন্তরে প্রার্থিত বিষয়ে পীরের সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা ও (৬) পীর মুরীদের দিল জারী করে দেওয়া।

পীরের মধ্যে যখন এসব শক্তি নিহিত রয়েছে, তখন মানবজাতি ও ফিরিশতাদের মুর্শিদদেরও যিনি মুর্শিদ, তাঁর মধ্যে এসব গুণাবলী স্বীকার করা 'শিরক' হয় কি করে? উল্লেখিত ইবারতটুকু ভিন্নমতাবলম্বীদের সম্পূর্ণ মতাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে সম্পূর্ণ 'তকবীয়াতুল ঈমান' এখানেই খতম হয়ে গেল।

'হিফযুল ঈমান' নামক গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় মওলবী আশরাফ আলী সাহেব লিখেছেনঃ অতি অল্প সময়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ সম্পর্কে আবু ইয়াযীদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছেন, এটি কোন পূর্ণতা জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য নয়। দেখুন, ইবলীস পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত নিমেষেই অতিক্রম করে।

এ ইবাদতে এ কথাটুকুই স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হয়েছে যে, কোন কোন সময় পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তে পৌছে যাওয়া শুধুমাত্র আল্লাহওয়ালাদের জন্য সম্ভবপর নয়, বরং কাফির ও শয়তানদের পক্ষেও এরূপ দুরূহ কাজ সম্ভবপর এবং হতেই আছে। 'হাযির-নাযির' শব্দদ্বয় দ্বারা এ কথাটুকুই বোঝানো হয়। 'তকবীয়াতুল ঈমান' এর দৃষ্টিকোণ থেকে তা' শিরক' বটে।

নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ ভূপালী ওহাবী রচিত 'মিসকুল খেতাম' গ্রন্থের উদ্ধৃতি 'হাযির-নাযির' এর প্রমাণেও (অত্র অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ) পেশ করেছি। তিনি বলেছেন, তাশাহুদে 'আস্‌সালামু আলাইকা' বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জন্যই সম্বোধন করা হয় যে, তিনি জগতের কনায় কনায় বিদ্যমান। নামাযীর সত্ত্বার মাঝে 'হাযির' ও বিরাজমান।"

উপরোল্লিখিত ইবারতসমূহ থেকে হুযুর আলাইহিস সালাম এর 'হাযির-নাযির' হওয়ার বিষয়টি সুচারুরূপে প্রতিপন্ন হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(যুক্তি নির্ভর দলীলাদির সাহায্যে 'হাযির-নাযির' এর প্রমাণ)

ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণ এ বিষয়ে একমত যে, হুযুর সাইয়্যিদ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্ত্বা যাবতীয় গুণাবলীতে ভূষিত। অর্থাৎ যে সব গুণাবলী অন্যান্য সম্মানিত নবী কিংবা ভবিষ্যতে আগমনকারী উচ্চ পর্যায়ের ওলীগণ বা কোন সৃষ্টজীব লাভ করেছেন বা করবেন, সে সমস্ত গুণাবলী, বরং তার চেয়েও বেশী গুণাবলীতে হুযুর আলাইহিস সালামকে ভূষিত করা হয়েছে। বরং অন্যান্য সকলেই যা কিছু অর্জন করেছেন, তা সব হুযুর আলাইহিস সালামের বদৌলতে। কুরআন করীম ইরশাদ করেছেন فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (আপনি পূর্ববর্তী নবীগণের পথে চলুন)। তাফসীরে রূহুল বয়ানে এ কথার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে فَجَمَعَ اللّٰهُ كُلَّ خَصْلَةٍ فِىْ حَبِيْبِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ অর্থাৎ আল্লাহ হুযুর আলাইহিস সালামকে প্রত্যেক নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছেন। এ কথাটুকু মওলানা জামী (রহঃ) এর কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়েও বিধৃত হয়েছে।

حسن یوسف دم عیسی ید بیضاء داری
آنچه خوباں همه دارند تو تنهاداری،

[স্বনামধন্য কবি হুযুর আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নবী! আপনি হযরত ইউসুফ (আঃ) এর অপূর্ব সৌন্দর্য রাশিতে ভূষিত, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ফুঁক দিয়ে জীবন দানের ক্ষমতা সম্পন্ন ও হযরত মুসা (আঃ) এর 'য়াদে বায়যার' (একটি হাত বগলের নিচে এনে বের করলে উজ্জ্বলরূপে ভাস্বর হওয়ার মু'জিযা) অধিকারী। যে সব গুণাবলী পূর্ববর্তী নবীগণ পৃথক পৃথকভাবে লাভ করেছিলেন, সে সব গুণাবলী আপনার মধ্যে সামগ্রিকরূপে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।]

মওলভী কামেস সাহেব তাঁর রচিত 'তাহযীরুন্নাস' গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'অন্যান্য নবীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম থেকে গ্রহণ করেই তাঁদের নিজ নিজ উম্মতকে ফয়েয দান করেছেন। মোট কথা অন্যান্য নবীগণের মধ্যে যেসব গুণাবলী নিহিত আছে, সেগুলি হচ্ছে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর ছায়া বা প্রতিফলিত রূপ"। এ প্রসঙ্গে

কুরআন-হাদীছ ও সুপ্রসিদ্ধ আলেমগণের উক্তি থেকে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীগণও এ কথাটি স্বীকার করেন বিধায় সে কথার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ নিষ্প্রয়োজন। এখন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হলো, কেউ যদি পূর্ণতা জ্ঞাপক কোন গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে সে গুণে পূর্ণরূপে ভূষিত হয়েছেন হুযুর আলাইহিস সালাম। এ নিয়মানুযায়ী সব জায়গায় 'হাযির-নাযির' হওয়ার ক্ষমতা যেহেতু অনেক মাখলুককে দান করা হয়েছে, সেহেতু স্বীকার করতেই হয় যে, এ গুণও হুযুর আলাইহিস সালামকে দান করা হয়েছে।

'হাযির-নাযির' হওয়ার ক্ষমতা কোন্ কোন্ সৃষ্ট জীবকে দান করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে এখন আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি। আমি 'হাযির-নাযির' শীর্ষক আলোচনার ভূমিকায় বলেছি যে, 'হাযির-নাযির' হওয়ার তিনটি মানে আছেঃ এক জায়গায় থেকে সমস্ত জগতকে হাতের তালুর মত দেখতে পাওয়া, নিমেষেই সমগ্র জগত পরিভ্রমণ করা ও শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থানকারী কাউকে সাহায্য করা এবং পার্থিব শরীর কিংবা অনুরূপ শরীর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যমান হওয়া। এসব গুণাবলী অনেক সৃষ্টজীবের মধ্যেও নিহিত আছে।

(১) 'রূহুল বয়ান' খাযেন', 'তাফসীরে কবীর' ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ সমূহে ৭ম পারার সুরা 'আন্‌আম এর আয়াত حَتّٰى اِذَاجَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছেঃ

جُعِلَتِ الْاَرْضُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مِثْلَ الطَّشْتِ يَتَنَاوَلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ

অর্থাৎ মলকুল মওত এর জন্য সমগ্র ভূ-খণ্ডকে এমন একটি থালার মত করে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেই থালা থেকে তিনি নিতে পারেন। 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এ জায়গায় আরও বলা হয়েছে-

لَيْسَ عَلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ صَعُوْبَةٌ فِيْ قَبْضِ الْاَرْوَاحِ وَاِنْ كَثُرَتْ وَكَانَتْ فِيْ اَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ

অর্থাৎ মলকুল মওতের রূহসমূহ কব্‌জ করতে কোন বেগ পেতে হয় না, যদিও রূহ সংখ্যায় বেশী হয় ও বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। 'তাফসীরে খাযেনে' সে একই আয়াতের নিচে লিখা হয়েছে-

مَا مِنْ اَهْلِ بَيْتِ شَعْرٍ وَّلَا مَدَرٍ اِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ يَطِيْفُ بِهِمْ يَوْمًا مَرَّتَيْنِ

অর্থাৎ প্রতিটি তাঁবু বা ঘরে বসবাসকারী এমন কোন জীব নেই, যার কাছে মলকুল মওত দিনে দু'বার না যান।

মিশকাত শরীফের بَابُ فَضْلِ الاذان শীর্ষক অধ্যায়ে আছেঃ যখন আযান ও তকবীর বলা হয়, তখন শয়তান ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়; আবার যখন আযান-তকবীরের পালা শেষ হয়ে যায়, সে পুনরায় উপস্থিত হয়। আগুন হতে সৃষ্ট জীবের গতির এ অবস্থা!

আমরা যখন ঘুমাই, তখন আমাদের একটি রূহ শরীর থেকে বের হয়ে জগতের এদিক সেদিক বিচরণ করে। এ রূহকে বলা হয় 'রূহে সাইরানী' (বিচরণকারী রূহ), যার প্রমাণ কুরআন পাকেও রয়েছে وَيُمْسِكُ اُخْرٰى (আল্লাহ অপর রূহকে আবদ্ধ রাখেন।) যে মাত্র কেউ ঘুমন্ত ব্যক্তির শরীরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাকে ঘুম থেকে উঠাল, তখনই সে রূহ, যা মক্কায় কিংবা পবিত্র মদীনায় বিচরণ করছিল, তৎক্ষণাৎ শরীরে পুনঃ প্রবেশ করল, ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠল।

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ الخ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছেঃ

فَلَاِذَا انْتَبَهَ مِنَ النَّوْمِ عَادَتِ الرُّوْحُ اِلٰى جَسَدِهٖ بِاَسْرَعَ مِنْ لَحْظَةٍ

অর্থাৎ-মানুষ যখন ঘুম থেকে জেগে উঠে, এক মুহূর্তের চেয়েও কম সময়ে সে রূহ শরীরে ফিরে এসে যায়।

আমাদের দৃষ্টির নূর মুহূর্তেই আসমানের উপর গিয়ে আবার যমীনে ফিরে আসে। আমাদের ধ্যান নিমেষেই সমস্ত জগত পরিভ্রমণ করে। বিদ্যুৎ, তার, টেলিফোন ও লাউড স্পীকারের গতিশক্তির অবস্থা হচ্ছে, আধা সেকেন্ডে ভূ-খন্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অতিক্রম করে ফেলে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর গতির অবস্থা হলো, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন কূপের অর্ধেক অংশ থেকে নিচের দিকে পতিত হচ্ছিলেন, সে মুহূর্তেই হযরত জিব্রাইল (আঃ) 'সিদরাতুল মুনতাহা' থেকে যাত্রা করলেন, আর নিমেষেই হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কূপের তলায় পতিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর নিকট পৌঁছে গেলেন। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে রুহুল বয়ানে আয়াত- اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) হযরত ঈসমাইল (আঃ) এর গলায় ছুরি চালালেন, ছুরি চলার আগেই জিব্রাইল (আঃ) সিদরা হতে দুম্বা সমেত হযরত খলিলুল্লাহর (আঃ)

খিদমতে হাযির হয়ে গেলেন। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর উযীর আসিফ বিন বরখিয়া এক পলকেই রাণী বিলকিসের সিংহাসন ইয়ামন থেকে সিরিয়ায় হযরত সুলাইমান (আঃ) এর নিকট নিয়ে এলেন, যার প্রমাণ কুরআন করীমেই রয়েছে। বলা হয়েছেঃ-

اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ

অর্থাৎ আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই সেটি নিয়ে আসছি। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত আসিফের এ খবরও ছিল যে সিংহাসনটি কোথায় ছিল। লক্ষ্য করুন, নিমিষেই তিনি ইয়ামন গেলেন আর এত ভারী একটি সিংহাসন নিয়ে ফিরে এলেন। এখন প্রশ্ন হলো হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সিংহাসন আনার এ ক্ষমতা ছিল কিনা? এ প্রসঙ্গে অত্র আলোচনার ২য় অধ্যায়ে ইনশা আল্লাহ আলোকপাত করব।

মিরাজের সময় সমস্ত নবী (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে হুযুর আলাইহিস সালাম এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। নামাযের পর হুযুর আলাইহিস সালাম 'বুরাকে' আরোহণ পূর্বক অগ্রসর হচ্ছিলেন। বুরাকের গতির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। তার দৃষ্টি সীমার শেষ প্রান্তে তার এক পা পড়তো। অন্য দিকে নবীগণের দ্রুত গতির প্রতি লক্ষ্য করুন-এখনই বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁরা ছিলেন মুক্তাদী, এখনই তাঁরা বিভিন্ন আসমানে পৌছে গেলেন। হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আমি অমুক আসমানে অমুক পয়গাম্বরের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। এ থেকে জানা যায় যে, বিদ্যুতের গতি সম্পন্ন বুরাক অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতেই অগ্রসর হচ্ছিল। কারণ দুলহা বা বর ঘোড়ায় চড়ে একটু ধীর গতিতেই অগ্রসর হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, মিরাজ উপলক্ষে অন্যান্য নবীগণের করণীয় কাজের সময় সুনির্দিষ্ট ছিল বিদায় তাঁরা এখন ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসে, আবার মুহূর্তেই পৌছে গেলেন বিভিন্ন আসমানে।

প্রখ্যাত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) 'আশআতুল লম আত' গ্রন্থে 'যিয়ারাতুল কুবুর' শিরোনামের অধ্যায়ের শেষে লিখেছেন, প্রতি বৃহস্পতিবার মৃত ব্যক্তিবর্গের রূহ সমূহ নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে গিয়ে তাদের ইসালে ছওয়াব এর প্রত্যাশী হয়। তাহলে যদি কোন মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গ বা

আত্মীয়-স্বজন বিদেশে থাকে, সেখানেও তাঁর রূহ পৌছবে।

আমার এসব বক্তব্য থেকে দ্বিধাহীনভাবে জানা গেল যে, সমস্ত জগতের উপর নজর রাখা, মাঝে মাঝে প্রত্যেক জায়গায় পরিভ্রমণ করা, একই সময়ে কয়েক জায়গায় বিদ্যমান থাকা ইত্যাদি এমন কতগুলো গুণ বা শক্তি যা মহাপ্রভু নিজ বান্দাদেরকে দান করেছেন।

এ বক্তব্য থেকে নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হয়ঃ (ক) কোন বান্দাকে প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির-নাযির' জ্ঞান করা 'শিরক' নয়। 'শিরক' হচ্ছে খোদার সত্ত্বা ও গুণাবলীতে অন্য কাউকে অংশীদার জ্ঞান করা। এখানে তা' হচ্ছে না (খ) হুযুর আলাইহিস সালামের খাদিমগণের মধ্যে প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান থাকার শক্তি নিহিত আছে, তাই হুযুর আলাইহিস সালাম এর মধ্যে এ গুণটি যে সর্বাধিক পরিমাণে আছে, তা বলাই বাহুল্য।

(২) পৃথিবীতে প্রত্যেক জায়গায় দানাপানি নেই বরং বিশেষ বিশেষ স্থানে তা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো রয়েছে। পানিতো কূপ, পুকুর, নদী ইত্যাদিতে রয়েছে, আর খাদ্য শস্য আছে ক্ষেত খামারে বা ঘরবাড়ী ইত্যাদিতে। কিন্তু বায়ু ও রোদ জগতের প্রত্যেক জায়গায় রয়েছে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিকট বায়ু শূন্য স্থানের অস্তিত্বই অসম্ভব। তাই স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক জায়গায় বায়ু রয়েছে। কারণ প্রত্যেক বস্তুর জন্য সবসময় আলো বাতাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অনুরূপ, খোদার প্রত্যেক মাখলুকের জন্য সদা-সর্বদা হাবীবে খোদা আলাইহিস সালাম এর প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি, যা তাফসীরে রূহুল বয়ান ইত্যাদি গ্রন্থের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছি। সুতরাং, হুযুর আলাইহিস সালাম যে সব জায়গায় বিরাজমান, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হয়।

(৩) হুযুর আলাইহিস সালাম হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের মূল। তিনি ইরশাদ করেছেন- وَكُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُوْرِىْ (সমস্ত সৃষ্টি আমার নূর থেকে সৃষ্ট।) শাখা প্রশাখায় মূলের অস্তিত্ব, শব্দাবলীর বিবিধ রূপের মধ্যে শব্দ-মূলের অস্তিত্ব এবং সমস্ত সংখ্যার মধ্যে মৌলিক 'এক' সংখ্যার অস্তিত্ব একান্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি খুব সুন্দর কথাই বলেছেন।

هر يك ان سے هے وه هروه هريك ميں هيں ايك علم حساب كے
بنے دوجهاں كى وه هى بناء وه نهيں جواں سے بنا نهيں ،

অর্থাৎ সৃষ্টি মাত্রই তাঁর থেকে,তিনি প্রত্যেক কিছুতেই বিদ্যমান। তিনি যেন অংক শাস্ত্রের মৌল সংখ্যা '১' (এক)। তিনিই দু'জাহানের ভিত্তি মূল। এমন কিছু নেই, যা তাঁর থেকে সৃষ্ট হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

('হাযির-নাযির' সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের বিবরণ)

১নং আপত্তিঃ প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির-নাযির' হওয়া খোদার একটি গুণ।

কুরআনে উক্ত হয়েছেঃ – عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ (তিনিই প্রত্যেক কিছুর সাক্ষী।) অন্যত্র বলা হয়েছে بِكُلِّ شَيْئٍ مُحِيْطٌ (তিনিই প্রত্যেক কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন।) এমতাবস্থায় খোদা ছাড়া অন্য কারো মধ্যে এগুণ স্বীকার করা খোদার গুণে অপরকে শরীক করা হয় বৈকি।

উত্তরঃ প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির-নাযির' হওয়া আদৌ খোদা তা'আলার গুণ নয়। আল্লাহ তাআলা স্থানের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি থেকে মুক্ত। আকায়েদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছেঃ-

لَايَجْرِيْ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَّلَايَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَكَانٌ

অর্থাৎ আল্লাহর উপর কালের কোন প্রভাব নেই। কেননা, কালের প্রভাব পড়ে পৃথিবীতে, নিম্নজগতের শরীরী জীব ও বস্তুর উপর। এদেরই বয়স বা কাল নিরূপিত হয়। আর চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, হুর ও গিলমান, ফিরিশতা এমনকি, আসমানের উপর অবস্থানকারী হযরত ঈসা (আঃ) এবং মি'রাজের সময় হুযুর আলাইহিস সালাম কালের প্রভাব থেকে মুক্ত। অনুরূপ, কোন স্থানও খোদা তা'আলাকে পরিবেষ্টন করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা 'হাযির' কিন্তু স্থানের গণ্ডীর বাইরে। এজন্য কুরআনে উল্লেখিতঃ- ثُمَّ اسْتَوٰي عَلَى الْعَرْشِ (অতঃপর আল্লাহ

আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন) আয়াতটিকে 'আয়াতে মুতাশাবিহাত' বা অবোধগম্য আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর بِكُلِّ شَيْئٍ مُحِيْطٌ (তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন) ইত্যাদি আয়াতের তাফসীরে সর্বজনমান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন عِلْمًا وَّقُدْرَةً

অর্থাৎ খোদার জ্ঞান ও শক্তির দিক থেকেই সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। কবির ভাষায়-

وهي لامكان كے مكيں هوے سرعرش تخت نشيں هوے
وه نبى هيں جنكے هيں يه مكان وه خدا هے جس كامكان نهيں

[প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামই 'লামকানে' অবস্থান গ্রহণকারী ছিলেন, আরশের শীর্ষে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে প্রিয় নবীর নির্ধারিত স্থান বা 'মকান'। খোদা তো কোন স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নন।)

খোদাকে প্রত্যেক জায়গায় স্বীকার করা ধর্মহীনতা। প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান হওয়া খোদার রসুলেরই বৈশিষ্ট্য। আর প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির-নাযির' হওয়ার গুণকে খোদার জন্য স্বীকার করা হলেও হুযুর আলাইহিস সালাম এর ক্ষেত্রে এ গুণকে অস্বীকার করা যায় না। বরং বলা চলে, হুযুর আলাইহিস সালাম এর গুণ খোদা প্রদত্ত, অচিরন্তন, সৃষ্ট ও খোদা তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। আর, খোদার ক্ষেত্রে এ গুণটি সত্ত্বাগত, চিরন্তন, কারো দ্বারা সৃষ্ট বা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এত সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'শিরক' হয় কিরূপে? জীবন, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি গুণাবলী সমূহ নিজের জন্য স্বীকার করলে যেমন 'শিরক' হয় না, তেমনি 'হাযির-নাযির' হওয়ার গুণকেও হুযুর আলাইহিস সালাম এর জন্য স্বীকার করলে 'শিরক' হতে পারে না।

ফতওয়ায়ে রশীদিয়া' প্রথম খণ্ডের আল-বিদআত শীর্ষক আলোচনার ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছেঃ-

فخر دوعالم عليه السلام كو مولود ميں حاضر جاننا بهى غير
ثابت هےاگر باعلام الله تعالي جانتاهے تو شرك نهيں ورنه شرك هے

(সরকার দোআলম আলাইহিস সালামকে মওলুদ শরীফে 'হাযির' জানার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত নয় বটে, তবে খোদা প্রদত্ত শক্তির বদৌলতে তাঁকে হাযির জ্ঞান করলে 'শিরক' নয়, এর অন্যথা হলে 'শিরক।' এ কথাটুকু 'বরাহীনে কাতেয়া'

গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখিত আছে। মওলবী রশীদ আহমদ সাহেবতো এ কথাটুকু রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন যে, খোদা ছাড়া অপর কাউকে খোদা প্রদত্ত শক্তির বদৌলতে 'হাযির-নাযির' জানা 'শিরক' নয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, একথা থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হয় যে, 'ওয়াজিবুল ওযুদ' (যার অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয়) ও 'চিরন্তন' হওয়ার বিশেষ গুণাবলীও পয়গাম্বরদের জন্য খোদা প্রদত্ত গুণাবলীরূপে স্বীকার করা যাবে এবং সে দিক দিয়ে হুযুর আলাইহিস সালামকেও স্রষ্টা, 'ওয়াজিবুল ওযুদ' (যার অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয়) ও 'চিরন্তন' বলা যাবে। এ প্রশ্নের উত্তর উত্তর হচ্ছে, খোদা তা'আলার চারটি বিশেষ গুণ অন্য কাউকে দান করা হয় না। কারণ, সে গুলোর উপরই 'একমাত্র উপাস্য হওয়ার বিষয়টি নির্ভরশীল। এগুলো হল উযুব (অস্তিত্বের অত্যাবশ্যকীয়তা), চিরন্তন হওয়া, স্রষ্টা হওয়া ও মৃত্যুবরণ না করা। এগুলো ছাড়া খোদার অন্যান্য গুণাবলী সৃষ্টজীবের মধ্যে বিকশিত হতে পারে, যেমন-শ্রবণ, দর্শন, জীবন ইত্যাদি। তবে খোদার গুণাবলীর সাথে সৃষ্টজীবের এসব গুণের যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষ্যণীয়। মহা প্রভু আল্লাহ তা'আলার সে সব গুণ হবে সত্ত্বাগত, অত্যাবশ্যকীয় ও অবিনশ্বর; আর মাখলুকের ওসব গুণ হবে খোদা প্রদত্ত, সম্ভবপর ও নশ্বর। কবির ভাষায়ঃ

جوهوتی خدائ بهی دینےکی قابل
خداین کے آتاوه بنده خدا کا

[খোদা হওয়ার যোগ্যতা যদি কাউকে দান করা হতো, তাহলে খোদার বান্দাই খোদা হয়ে আবির্ভূত হত।]

২নং আপত্তিঃ কুরআন করীম ইরশাদ করছেঃ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْيُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ

[আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তাঁরা নিজেদের কলম পানিতে ফেলছিলেন। হযরত মরিয়ামকে পাওয়ার জন্য পানিতে কলম নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে-

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ

অর্থাৎ আপনি তাঁদের কাছে ছিলেন না, যখন তাঁরা তাদের নিজেদের ব্যাপারটি মীমাংসা করার ক্ষেত্রে মতৈক্যে পৌছেছিলেন। এ ধরনের আরো আয়াত রয়েছে। যেমনঃ

وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْقَضَيْنَا اِلَى مُوْسَى

[আপনি সে উন্মুক্ত প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি হযরত মুসা (আঃ) এর নিকট আমার নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম]

وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا [আপনি তুর পাহাড়ের পার্শ্বে ছিলেন না, যখন আমি হযরত মুসা (আঃ) কে সম্বোধন করছিলাম।

এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, বিগত যুগে উল্লেখিত ঘটনাবলী ঘটার সময় হুযুর আলাইহিস সালাম ঘটনাস্থলে বিদ্যমান ছিলেন না। তাই পরিষ্কাররূপে বোঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির-নাযির' নন।

উত্তরঃ 'হাযির-নাযির' এর মানে কি, সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এ আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে। আমি আগেই আরয করেছি যে, 'হাযির-নাযির এর তিন ধরনের অর্থ আছেঃ এক, এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র জগত দেখা; দুই, এক মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করা; তিন, একই সময়ে কয়েক জায়গায় দৃশ্যমান হওয়া। উল্লেখিত আয়াত সমূহে বলা হয়েছে, তিনি এ পার্থিব শরীর নিয়ে ঘটনাস্থলে বিদ্যমান ছিলেন না। একথা কোথায় বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অবলোকন করেননি? স্বশরীরে তথায় উপস্থিত না থাকা এক কথা এবং তাঁর সে সব ঘটনা অবলোকন করা ভিন্ন কথা। এবং উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, হে মাহবুব আলাইহিস সালাম, আপনি তথায় স্বশরীরে বিদ্যমান ছিলেন না। তবে সে সব ঘটনা সম্পর্কে আপনি অবহিত ও তা অবলোকনও করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সত্য নবী। উক্ত আয়াতগুলো বরং হুযুর আলাইহিস সালামের 'হাযির-নাযির' হওয়ার বিষয়টি সপ্রমাণ করছে।

সুপ্রসিদ্ধ 'তাফসীরে সা'বীতে وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ الاية তাফসীরে উল্লেখিত আছেঃ

وَهٰذَا بِالنَّظَرِ اِلَى الْعَالَمِ الْجِسْمَانِيِّ لِاِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَي الْخَصْمِ وَاَمَّا بِالنَّظَرِ اِلَى الْعَالَمِ الرُّوْحَانِيِّ فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُوْلٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ اِلَى اَنْ ظَهَرَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ (سوره قصص تفسير صادي)

অর্থাৎ-এখানে যে বলা হয়েছে, আপনি হযরত মুসা (আঃ) এর সে ঘটনাস্থলে ছিলেনা, তা শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। রূহানীভাবে তো হুযুর

(আলাইহিস সালাম) প্রত্যেক রসুলের রিসালাত ও হযরত আদম (আঃ) এর আদি সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁর স্বশরীরে আবির্ভূত হওয়ার সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত ব্যাপারে মওজুদ ছিলেন।

হিজরতের দিন হুযুর (আলাইহিস সালাম) সত্যের প্রতীক হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) কে নিয়ে ছওর নামক গুহায় অবস্থান করছিলেন। এদিকে মক্কার কাফিরগণ উক্ত গুহার মুখে এসেই উপস্থিত। হযরত সিদ্দীক (রাঃ) অবস্থা দৃষ্টে বিচলিত হয়ে পড়লেন। এসময় হুযুর (আলাইহিস সালাম) ইরশাদ করেন لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (চিন্তা কর না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।) এখানে কি এ আয়াতের লক্ষ্যার্থ এ যে, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন, কিন্তু কাফিরদের সাথে নেই? যদি তাই হয়, তাহলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রত্যেক জায়গায় মওজুদ নেই। কাফিরগণও তো এ জগতেই ছিল।

অনুরূপ উহুদ যুদ্ধের পর কাফিরদের উদ্দেশ্যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন- اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَامَوْلٰى لَكُمْ (আল্লাহ আমাদের মওলা, তোমাদের মওলা কেউ নেই।) একথা থেকে বোঝা গেল যে, খোদার রাজত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কেবল মাত্র মুসলমানদের উপরই আছে, কাফিরদের উপর নেই। 'মওলা' শব্দের অর্থ হচ্ছে কার্যনির্বাহক। উক্ত কালামের অন্তর্গত বাক্য দু'টির অর্থের সমন্বয় সাধন করলে প্রথমোক্ত বাক্যের ভাবার্থ দাঁড়ায়ঃ আল্লাহ তা'আলা দয়া ও রহমত সহকারে আমাদের সাথে আছেন, আর কহর ও গযব সহকারে আছেন কাফিরদের সাথে। দ্বিতীয় বাক্যটির সারমর্ম হলো, আমাদের মওলা আছেন সাহায্যকারীরূপে, হে কাফিরগণ, তোমাদেরও মওলা আছেন বটে, তবে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে নন। অনুরূপভাবে ওসব আয়াতের ক্ষেত্রেও বলা হবে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বাহ্যিকভাবে স্বশরীরে সে সময় তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না।

৩নং আপত্তিঃ কুরআন করীম ইরশাদ করছেঃ-

وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَي النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

(মদীনাবাসীদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, 'নিফাক' বা কপটতা যাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। আপনি তাদেরকে চিনেন না, আমি তাদেরকে চিনি।) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির' নন। তাই যদি হতেন, মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত গোপনীয় অবস্থা সম্পর্কে

সম্যকরূপে অবগত হতেন; অথচ তিনি ছিলেন তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একেবারে অনবহিত।

উত্তরঃ এর বিস্তারিত উত্তর 'ইলমে গায়ব' শীর্ষক আলোচনার সে একই আয়াতের প্রেক্ষাপটে প্রদান করেছি।

৪নং আপত্তিঃ সুপ্রসিদ্ধ বুখারী শরীফের 'কিতাবুত তাফসীরে' উল্লেখিত আছে, হযরত যায়েদ ইবন আরকাম (রাঃ) কুখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লা ইবন উবাই এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন যে, সে জনগণকে বলে যেঃ لَاتُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (অর্থাৎ-মুসলমানদেরকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য সহায়তা করবেন না। সে হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর মহান দরবারে এসে মিথ্যা শপথ করে বলেছিলো, 'আমি এরূপ উক্তি করিনি।' এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (আলাইহিস সালাম) তাঁকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করলেন, আর আমাকে গণ্য করলেন মিথ্যুকরূপে।) যদি হুযুর (আলাইহিস সালাম) প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির-নাযির' হয়ে থাকেন, তাহলে ইবনে উবাইকে সত্যবাদী ধরে নিলেন কিরূপে? যখন কুরআনের এ আয়াতটি (যা' হাদীছে উল্লেখিত আছে) অবতীর্ণ হল, তখনই হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রাঃ) সত্যবাদীরূপে গণ্য হলেন।

উত্তরঃ আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এ কথা প্রমাণিত হয় না যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত। কোন বিষয়ে ফয়সালা করার শরীয়ত নির্ধারিত রীতি হচ্ছে, বাদী তার দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী উপস্থাপন করবে। অন্যথায় বিবাদী শপথ করে মুকাদ্দমায় জিতে যাবে। বিচারক যে কোন মুকাদ্দমায় বাদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ বা বিবাদীর শপথের উপর ভিত্তি করেই বিচারের রায় ঘোষণা করেন, তাঁর ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞাত তথ্যের আলোকে নয়। এখানে হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) ছিলেন বাদী যার দাবী ছিল ইবনে উবাই অবমাননাকর উক্তি করেছে। আর ইবনে উবাই ছিল উক্ত অভিযোগ অস্বীকারকারী বিবাদী। যেহেতু হযরত যায়েদ (রাঃ) এর পক্ষে কোন সাক্ষী দিল না, সেহেতু আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর শপথের ভিত্তিতেই রায় ঘোষিত হয়েছিল। এরপর যখন কুরআন করীম যায়েদ (রাঃ) এর পক্ষে সাক্ষ্য দিল তখনই সেই সাক্ষ্যের ফলশ্রুতিতে তাঁকে সত্যবাদীরূপে গণ্য করা হল। কিয়ামতের মাঠেও পূর্ববর্তী যুগের কাফিরগণ তাদের নবীগণের ধর্মপ্রচারের কথা অস্বীকার করবে। আর নবীগণ নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করেছেন বলে দাবী করবেন। আল্লাহ

তা'আলা তাদের দাবীর ব্যাপারে উম্মতে মুস্তাফার সাক্ষ্য গ্রহণ করে তাঁদেরকে সত্যবাদীরূপে গণ্য করবেন। অনুরূপ, কাফিরগণ আরয করবেঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ-মহাপ্রভু আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না, তখন তাদের আমলনামা, ফিরিশতাগণের উক্তি এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্বক তাদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে। তা'হলে কি আল্লাহরও প্রকৃত অবস্থা জানা ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তবে, সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে নির্ধারিত নিয়মেরই অনুসরণ মাত্র। আর উপরোক্ত হাদীছে ব্যবহৃত শব্দ كَذَّبَنِيْ এর লক্ষ্যার্থ হচ্ছে, 'আমার বক্তব্য গ্রহণ করেননি।' এ অর্থ নয় যে, 'আমাকে মিথ্যুক গণ্য করেছেন।' কেননা, মিথ্যুক শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ফাসিক' বলে গণ্য হয়। আর সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন, 'আদেল' বা ন্যায়পরায়ণ এবং কোন মুসলমানকে বিনা প্রমাণে 'ফাসিক' বলা যায় না। দেওবন্দীগণ এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাহলে নবী (আলাইহিস সালাম) অপবিত্র স্থানসমূহেও ও নরকেও 'হাযির' এ ধারণা পোষণ আদবের বরখেলাপ নয় কি? এর উত্তর হচ্ছে, হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির' হওয়ার ব্যাপারটি হলো প্রত্যেক জায়গায় সূর্যের কিরণ, দৃষ্টির আলো বা ফিরিশতাগণের বিদ্যমানতার মত, স্থানের নোংরা পরিবেশ ও অপবিত্রতার প্রভাবমুক্ত। বলুন তো আপনারা ওসব জায়গায় মহাপ্রভু আল্লাহকে 'হাযির' জ্ঞান করেন কিনা, এরূপ জ্ঞান করা আদব এর খেলাফ কি না? সূর্যের আলো যদি অপবিত্র স্থান সমূহে পতিত হলে অপবিত্র না হয়, তাহলে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৌলসত্ত্বা, যাকে আল্লাহ তা'আলা 'নূর' বলে অভিহিত করেছেন, তাঁর উপর কেন অপবিত্রতার হুকুম বর্তাবে?

৫নং আপত্তিঃ তিরমিযী শরীফে ইবন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

لَايُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِيْ شَيْئًا فَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ

অর্থাৎ-কেউ যেন আমাকে আমার সাহাবীদের কারো সম্পর্কে আমার অন্তরে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে এরূপ খবর না দেয়। আমি চাই, কারো সম্পর্কে কোনরূপ বিরূপ ধারণা অন্তরে না নিয়েই স্বচ্ছ মন নিয়ে আপনাদের নিকট আসি।

যদি হুযুর (আলাইহিস সালাম) প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির' হতেন, তাহলে তাঁকে কোন কিছুর খবর দেয়ার প্রয়োজনীয়তাই বা রইল কোথায়? তিনিতো এমনিতেই

সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

উত্তরঃ আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তর দৃষ্টিলব্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডারে সমস্ত বিষয়ের খবর আছে। তবে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ইলমে গায়ব এর আলোচনায় হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের (রাঃ) উদ্ধৃতি পেশ করেছি। উক্ত হাদীছের ভাবার্থ একদম পরিষ্কার। হাদীছে বলা হয়েছে, লোকের কথার প্রতি আমার মনযোগ আকর্ষণপূর্বক কারো প্রতি আমাকে যেন অসন্তুষ্ট করে তোলা না হয়। এক জায়গায় ইরশাদ করেছেন- ذَرُوْنِىْ مَاتَرَكْتُمْ

অর্থাৎ যতক্ষণ আমি আপনাদেরকে ছেড়ে দিয়ে থাকি, ততক্ষণ আপনারাও আমাকে ছেড়ে দিবেন। যতক্ষণ আমি কারো সম্পর্কে কিছু না বলি, আপনারাও কারো সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন না।

৬নং আপত্তিঃ সুপ্রসিদ্ধ হাদীছগ্রন্থ 'বায়হাকী'তে আছেঃ

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰي عَلَىَّ نَائِبًا اُبْلِغْتُهٗ

অর্থাৎ-যে ব্যক্তি আমার কবর শরীফের পার্শ্বে দরূদ পাঠ করে, তার দরূদ আমি নিজেই শুনি। আর যে দূরে থেকেই দরূদ পাঠ করে, তার দরূদ আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, দূরের আওয়াজ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শুনতে পান না। অন্যথায় দরূদ পৌঁছিয়ে দেয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

উত্তরঃ এ হাদীছে এ কথা কোথায় আছে যে, 'আমি দূরের দরূদ শুনতে পাই না?' হাদীছের মর্মার্থ একেবারে সুস্পষ্ট-নিকটবর্তী লোকদের দরূদ শরীফ তিনি নিজেই শুনেন, আর দূরবর্তীদের দরূদও তিনি শুনেন, আবার তাঁর দরবারেও পৌঁছানো হয়। 'হাযির-নাযির' এর প্রমাণে দালায়েলুল খাইরাত গ্রন্থের যে রিওয়ায়াতটি পেশ করেছি, সেখানে বলা হয়েছে, যাদের অন্তরে আমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা রয়েছে, তাঁদের দরূদ আমি নিজেই শুনি। আর যাদের অন্তরে এরূপ ভালবাসা নেই, তাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তাহলে 'দূর ও 'নিকটের' শব্দটি দ্বারা হৃদয়ের দিক থেকে দূরত্ব বা নৈকট্যের কথাই বোঝানো হয়েছে; স্থানের দূরত্ব বা নৈকট্য নির্দেশ করা হয়নি। যেমন জনৈক কবি বলেছেন-

گربے مني وپيش منى دريمنى :- گر بامني دوريمنى پيش منى

অর্থাৎ-পরম প্রিয়জনের সাথে যদি আমার হৃদ্যিক সম্পর্ক না থাকে,তা'হলে তার আমার সামনে বিদ্যমান থাকা যে কথা, সুদূর ইয়ামন দেশে অবস্থান করাও একই কথা। পক্ষান্তরে তার সাথে যদি আমার হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক থাকে, তা'হলে সে ইয়ামন দেশে থাকলেও আমার সামনে আছে বলে মনে হয়।

দরূদ পৌছিয়ে দেয়া হয় বলে অবশ্যম্ভাবীরূপে একথা বোঝা যায় না যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তা শুনতেই পান না। ফিরিশতাগণওতো বান্দার 'আমল সমূহ খোদার দরবারে পেশ করেন' তাহলে কি আল্লাহও তা' জানেন না? দরূদ শরীফ পেশ করার মধ্যে বান্দাদের মান সম্মান নিহিত। অর্থাৎ দরূদ-পাকের বরকতে তারা এ স্তরে উপনীত হয় যে, তাদের মত দীন-হীন লোকদের নামও জগতের শাহানশাহ হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর মহান দরবারে উচ্চারিত হল।

ফকীহগণ বলেন, নবীর অবমাননাকারীদের তওবা কবুল হয় না। সুবিখ্যাত 'ফত্ওয়ায়ে শামী'র 'আল মুরতাদ' শীর্ষক অধ্যায় দেখুন। এ তওবা মকবুল না হওয়ার কারণ হলো, নবীর অবমাননা হচ্ছে 'হক্কুল ইবাদ' (যে সব ধর্মীয় কার্য বান্দাদের অধিকার হিসেবে শরীয়ত সমর্থিত ও পালনীয়) এর পর্যায়ভুক্ত, যা তওবা দ্বারা মাফ হবার নয়। এ অবমাননার খবর যদি হুযুরের (আলাইহিস সালাম) না থাকে, তা 'হক্কুল ইবাদ' এর পর্যায়ভুক্ত হল কিরূপে? পরনিন্দা ঐ সময়েই 'হক্কুল ইবাদের' পর্যায়ভুক্ত হয়, যখন তার খবর নিন্দিত ব্যক্তির কাছে পৌছে। অন্যথায় 'হক্কুলাহ' (যে সব ধর্মীয় বিধি নিষেধ একমাত্র আল্লাহর 'অধিকার' হিসেবে পালনীয়। যেমন রোযা নামায ইত্যাদি) হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) রচিত 'শরহে ফিকহে আকবর' দেখুন।

ইবনে তাইমিয়ার সুযোগ্য শাগরিদ ইবনে কাইয়ুম রচিত 'জিলাউল ইফহাম গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১০৮ নং হাদীছে আছেঃ-

لَيسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ اِلَّابَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِي

অর্থাৎ-যে কোন স্থানে কেউ দরূদ পাঠ করলে পাঠকের আওয়াজ আমার কানে পৌছে। এ রীতি আমার ওফাতের পরেও বলবৎ থাকবে। 'তবাআতুল মুনীরিয়াহ' নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছাপানো সেই 'জিলাউন ইফহাম' গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় ও

মৌলানা জালালুদ্দিন সয়ুতী (রহঃ) রচিত 'আনিসুল জলীস' গ্রন্থের ২২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছেঃ হুযুর (আলাইহিস সালাম) বলেছেনঃ-

اَصْحَابِيْ اِخْوَانِىْ صَلُّوْا عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْجُمُعَةِ، بَعْدَ وَفَاتِيْ فَاِنِّىْ اَسْمَعُ صَلٰوتَكُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ

অর্থাৎ-প্রতি সোমবার ও শুক্রবার আমার ওফাতের পর বেশী করে দরূদ পাঠ করবেন। আপনাদের দরূদ আমি সরাসরি শুনি।

৭নং আপত্তিঃ 'ফত্ওয়ায়ে বয্যাযিয়াহ'তে আছেঃ-

مَنْ قَالَ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ يَكْفُرُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলে যে, মাশায়েখের রূহসমূহ 'হাযির' ও সবকিছু জানে, সে ব্যক্তি 'কাফির'।

শাহ আবদুল আযীয সাহেব (রহঃ) 'তাফসীরে ফত্হুল আযীয' এর ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ-

انبياء ومرسلين را لوازم الوهيت ازعلم غيب وشنيدن فر يادهر كس درهر جاوقدرت بر جميع مقدورات ثابت كنند

অর্থাৎ-এরা নবী ও পয়গাম্বরদের জন্য 'মাবুদ' এর অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী, যেমন অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান, যে কোন স্থান থেকে যে কোন লোকের ফরিয়াদ শুনা এবং সম্ভবপর সবকিছু করার ক্ষমতা ইত্যাদি প্রমাণ করেন। এ থেকে জানা গেল যে, অদৃশ্য জ্ঞান, প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির-নাযির' হওয়া খোদারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অন্য কারো মধ্যে এ গুণ আছে বলে স্বীকার করা সুস্পষ্ট কুফর। 'বয্যাযিয়া' হচ্ছে ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যতম নির্ভরযোগ্য কিতাব। আর সে কিতাবই এ ব্যাপারে কুফরের ফত্ওয়া দিচ্ছে।

উত্তরঃ ফত্ওয়ায়ে বয্যাযিয়াহ এর উপরোল্লিখিত ইবারতের বাহ্যিক ভাব ধারার আওতায় ভিন্নমতাবলম্বীগণও এসে যাচ্ছেন। কেননা, প্রথমতঃ মওলবী রশীদ আহমদ সাহেব রচিত 'ইমদাদুস সুলুক' গ্রন্থের উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যেখানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় পীরের রূহকে মুরীদদের কাছে 'হাযির' জ্ঞান করার শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ বয্যাযিয়াহর উপরোক্ত ইবারতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি যে, কোন্ জায়গায় পীরের রূহকে হাযির জ্ঞান করা 'কুফর'-সব জায়গায়, না

কোন এক জায়গায়। বিশেষত কোন স্থানের উল্লেখ না থাকায় এ কথাই জানা যায়, যদি কেউ মাশায়েখের রূহকে এক জায়গায়ও হাযির মনে করে, কিংবা যে কোন একটি বিষয়েও জ্ঞাত বলে ধারণা করে, তাহলে সে 'কাফির' হয়ে যাবে। তাঁরাও মশায়েখের রূহসমূহকে তাঁদের কবরের মধ্যে কিংবা 'আলমে বরযখের' ইল্লীয়ীন' নামক স্থানে, যেখানে তাঁদের রূহ অবস্থান করেন', অবশ্যই হাযির বলে স্বীকার করবেন। অতএব, যে কোনখানে স্বীকার করা হোক না কেন, কুফরে গণ্য হলে। তৃতীয়তঃ এ 'হাযির-নাযির' এর আলোচনায় সুপ্রসিদ্ধ ফত্ওয়ায়ে শামী'র উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইয়া হাযির! ইয়া নাযির! বলা কুফর নয়। চতুর্থতঃ, 'আশআতুল লমআত, ইহয়াউল উলুম প্রভৃতি গ্রন্থ, এমনকি নওয়াব সিদ্দিক হোসেন খান ভুপালী ওহাবীর উদ্ধৃতি সমূহ উল্লেখ করে আগেই বলেছি যে, নামাযী ('আত্তাহিয়াত' পাঠের সময়) নিজ অন্তরে হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে হাযির মনে করেই اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِىُّ (হে নবী, আপনার প্রতি সালাম) কথাটুকু বলবেন। এখন প্রশ্ন হলো-এ ফকীহগণের বেলায় বয়যাযিয়াহর এ ফত্ওয়া প্রযোজ্য হবে কি না? যেহেতু তাঁদেরকে 'কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না'। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বয়যাযিযাহ যে হাযির-নাযির জ্ঞান করাকে কুফর আখ্যায়িত করেছে, তা ওই হাযির-নাযর এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা' খোদারই একমাত্র গুণ হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ যা সত্ত্বাগত চিরন্তন, অত্যাবশ্যকীয় ও স্থানের গণ্ডীমুক্ত। এ ধরনের হাযির-নাযির হওয়াটা খোদারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রত্যেক জায়গায় আছেন, কিন্তু কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন। ১নং আপত্তির উত্তরে 'ফত্ওয়ায়ে রশীদিয়াহ' ১ম খণ্ড, 'কিতাবুল বিদআত' এর ৯১ পৃষ্ঠা ও'বরাহীনে কাতেয়া' গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃতি আগেই পেশ করেছি, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মওলবী রশীদ আহমদ সাহেব ও মওলবী খলীল আহমদ সাহেব এ ফত্ওয়ার ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত।

আর, শাহ আবদুর আযীয সাহেবের (রহঃ) ভাষ্য একেবারে সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, আল্লাহর কুদরতের আওতাভুক্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর আল্লাহর মতই মশায়েখ ও নবীদেরকে ক্ষমতা সম্পন্ন স্বীকার করাটা কুফর, তা না হলে তিনি নিজেই وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا আয়াতের প্রেক্ষাপটে হুযুর (আলাইহিস সালাম)কে 'হাযির-নাযির' স্বীকার করেন কিরূপে? 'ইলমে গায়ব' শীর্ষক আলোচনায় উক্ত আয়াতের প্রেক্ষাপটে উনার উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছি।

৮নং আপত্তিঃ ভিন্ন মতাবলম্বীদের কেউ কেউ অন্য কোন পথ না পেয়ে একথা বলে ফেলেন যে, তারা ইবলীসকে প্রত্যেক জায়গায় পৌঁছার ক্ষমতা সম্পন্ন বলে স্বীকার করেন। অনুরূপ, আসিফ ইবন বরখিয়া,মলাকুল মউত ও অন্যান্য ফিরিশতাদেরও এ ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করেন। কিন্তু তারা একথা স্বীকার করেন না যে, অন্যান্য সৃষ্টজীবের পূর্ণতা জ্ঞাপন বৈশিষ্ট্য সমূহ নবীদের মধ্যে কিংবা হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর মধ্যে পুঞ্জীভূত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মওলবী কাসেম সাহেব 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবে লিখেছেনঃ 'আমলের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সাধারণ নবীকেও মাঝেমধ্যে ডিঙ্গিয়ে যায়। মওলবী হোসাইন আহমদ সাহেব 'রুজূমল মুযনেবীন' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'দেখুন! রাণী বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসার ক্ষমতা হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)এর ছিল না, কিন্তু আসিফের এ ক্ষমতা ছিল। তা না হলে তিনি নিজেই নিয়ে আসলেন না কেন? আরো দেখুন, হুদহুদ পাখী বলেছিল [হে সুলাইমান (আঃ)! আমি এমন একটি বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটন করেছি, যার খবর আপনি রাখেননি] অধিকন্তু হুদহুদের চোখ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত পানি দেখতে পায়। এ জন্যই সে পাখী হযরত সুলাইমান (আঃ) এর দরবারে থাকতো, বন-জঙ্গলের কোন্ স্থানে ভূ-গর্ভে পানি আছে, সে খবর পরিবেশন করত। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর এ খবর ছিল না। তাই জানা যায় যে, নবীগণের জ্ঞান ও অলৌকিক ক্ষমতার চেয়েও নবী নয় এমন ব্যক্তির, এমন কি জন্তুর জ্ঞান ও ক্ষমতা বেশী হতে পারে।"

উত্তরঃ নবী নয় এমন ব্যক্তির মধ্যে নবীর তুলনায় কিংবা কোন নবীর মধ্যে হুযুরের (আলাইহিস সালাম) তুলনায় পূর্ণতা জ্ঞাপক কোন বিশেষ গুণ বেশী আছে বলে স্বীকার করা সুস্পষ্ট কুরআনী আয়াত, বিশুদ্ধ হাদীছ ও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। স্বয়ং ভিন্নমতাবলম্বীগণও, যাদের উক্তিসমূহ আগে উল্লেখ করেছি, একথা স্বীকার করেন। এ অষ্টম আপত্তিটা তাদের নিজস্ব মতাদর্শ পরিহারের নামান্তর। 'শিফা' শরীফে আছে, কেউ যদি একথা বলে যে, ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান হুযুরের (আলাইহিস সালাম) তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী, তাহলে সে কাফির। যে কোন পূর্ণতা জ্ঞাপক গুণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর তুলনায় অন্য কারো মধ্যে বেশী বলে স্বীকার করা কুফর। জ্ঞান ও আমলের দিক থেকে কেউ নবীকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। যদি কারো বয়স আটশ' বছর হয় এবং সে সারা জীবনটাই ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে বলে যে, 'আমি ইবাদত করেছি আটশ' বছর,

আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ইবাদত হচ্ছে সর্বসাকুল্যে পঁচিশ বছরের। সুতরাং, ইবাদতের দিক থেকে আমি হুযুরকে ডিঙিয়ে গিয়েছি, তাহলে সে ধর্মদ্রোহী বলে গণ্য। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর একটি সিজদার ছওয়াব আমাদের লক্ষ বছরের ইবাদতের ছওয়াব থেকে ঢের বেশী। ঐ লোকটির কেবল কষ্ট বেশী হয়েছে। না হয় খোদার নৈকট্য, মর্তবা ও ছওয়াবের দিক দিয়ে নবীর সাথে তার কোন তুলনায় চলে না। নবীর মর্তবা তো অনেক উচ্চ, অনেক উর্ধে।

'মিশকাত' শরীফের 'ফযাইলুস সাহাবা' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছেঃ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "আমার সাহাবীর যৎসামান্য যবের দান খয়রাত তোমাদের পাহাড়সম স্বর্ণ দান করার চাইতেও উত্তম।" বনী ইসরাইলের সমউন এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাস এক নাগাড়ে ইবাদত করেছেন। তাঁর প্রতি মুসলমানদের ঈর্ষা হলো আমরা তাঁর সমতুল্য মর্যাদা কিরূপে পাব? তখনই নাযিল হল আয়াতে করীমাঃ-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ٭

অর্থাৎ-শবে কদরের পবিত্র রজনী হাজার মাসের চেয়েও শ্রেয়। অর্থাৎ 'হে মুসলমানগণ, আমি তোমাদের উপহার দিচ্ছি এক মহা মূল্যবান রজনী শবে কদর। এ রাতের ইবাদত বনী ইসরাইলের হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।' এরূপ হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর এক মুহূর্ত লক্ষ লক্ষ শবে কদরের চেয়েও উত্তম। যে পবিত্র মসজিদের এক কোণায় সাইয়িদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শায়িত আছেন, সেই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে এক রকআত নামায সাধারণ মসজিদের পঞ্চাশ হাজার রকআতের সমতুল্য (ছওয়াবের দিক থেকে)। যাঁর নিকট অবস্থান করে ইবাদত করলে আমাদের ইবাদতের ছওয়াব এত গুণ বেড়ে যায়, তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আর কীই বা বলার আছে?

অনুরূপ, আসিফ বিন বরখিয়ার সিংহাসন নিয়ে আসার ক্ষমতা ছিল, আর হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সেই ক্ষমতা ছিল না-এ রূপ উক্তি বাজে প্রলাপ মাত্র। কুরআন করীম ইরশাদ করছেঃ-

وَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

অর্থাৎ-সে মহা পুরুষ, যিনি ঐশী গ্রন্থের জ্ঞানে দীপ্ত ছিলেন, বলেছিলেন "আমি বিলকীসের সেই সিংহাসনটিকে আপনার চোখের পলক মারার আগেই আপনার দরবারে নিয়ে আসব।" বোঝা গেল যে, আসিফ এ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন ঐশী কিতাবের জ্ঞানের বদৌলতে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, তাঁর ইসমে 'আযম' জানা ছিল, যার ফলে তিনি সেই সিংহাসনটি আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এ জ্ঞান হযরত সুলাইমান (আঃ) এর বরকতে অর্জিত হয়েছিল। এটা কি করে সম্ভব যে, তার এরূপ ক্ষমতা আছে, অথচ তাঁর উস্তাদ হযরত সুলাইমান (আঃ) এর এ ক্ষমতা নেই? এখন অবশ্য স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, তা'হলে তিনি নিজেই আনলেন না কেন? এর কারণ সুস্পষ্ট। কাজ সম্পন্ন করা হয় খাদিম বা অধঃস্তন কর্মচারীদের দ্বারা, রাজা-বাদশাহরা তা করেন না। বাদশাহের মান সম্মান প্রতিপত্তির যথোপযুক্ত আচরণ হচ্ছে কর্মচারীদের দ্বারা কাজ সম্পাদন করানো। বাদশাহ নিজের কর্মচারীদের দ্বারা পানি আনয়ন করে পান করেন। 'তাই বলে কি, বাদশাহের পানি আনয়নের ক্ষমতা নেই' বলতে হবে? বিশ্বনিয়ন্তা দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড ফিরিশতাদের দ্বারাই সম্পাদন করান। যেমন-বৃষ্টি বর্ষণ, প্রাণহরণ, মাতৃগর্ভে শিশুর শরীর গঠন ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব ফিরিশতাদের হাতে অর্পিত হয়েছে। তাই বলে কি ধারণা করা যায় যে, বিধাতার এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই? ফিরিশতাগণ কি খোদার চেয়ে বেশী ক্ষমতা রাখেন?

তাফসীরে রূহুল বয়ানে কুরআনের পঞ্চম পারা 'সুরা নিসার' আয়াত-

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) আসিফকে বিলকীসের সিংহাসন আনার আদেশ দিয়েছিলেন এজন্য যে, তিনি তাঁর পদ মর্যাদার নিচে নামতে চাননি। অর্থাৎ সে কাজটি ছিল কর্মচারীদের। আর হুদহুদ পাখীর কথাটুকু কুরআন হুবহু বর্ণনা করেছে-হুদহুদ বলেছিল, 'আমি এমন একটি ব্যাপার দেখে এসেছি, যার খবর আপনিও রাখেন নি।' কুরআন কোথায় বলল যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সে খবর ছিল না? হুদহুদের ধারণা ছিল, সম্ভবত হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সে বিষয়ের খবর নাও থাকতে পারে, তাই সে এরূপ উক্তি করেছিল? তাই এ উক্তিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

এও হতে পারে যে, হুদহুদ আরয করেছিল اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ (আমি এমন একটি ব্যাপার দেখে এসেছি, যা আপনি দেখেন নি।) অর্থাৎ আপনি সে

দেশে স্বশরীরে দেখতে যাননি। এ কথা দ্বারা জ্ঞানের অস্বীকৃতি বোঝানো হয়নি। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর ও সব খবর ছিল, কিন্তু খোদার ইচ্ছা ছিল, এত বড় একটি কাজ হুদহুদ পাখীর দ্বারা সম্পন্ন করা হোক। যাতে একথা জানা যায় যে, নবীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য একটি পাখী এমন কাজও করতে পারে, যা অন্যান্য সাধারণ লোকের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। যদি হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সে ব্যাপারে খবর না থাকত, তাহলে আসিফ ইবন বরখিয়া কারো কাছে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা ব্যতিরেকে ইয়ামনের 'সবা' শহরে অবস্থিত বিলকীসের বাড়ীতে পৌছলেন কিভাবে? এবং নিমেষেই সিংহাসনটি নিয়ে এলেন কিরূপে? এ থেকে জানা গেল, সমগ্র ইয়ামন রাজ্য হযরত আসিফের সামনেই উন্মোচিত ছিল। তাহলে হযরত সুলাইমান (আঃ) এর দৃষ্টি এড়ায় কিভাবে?

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জানা ছিল তাঁর পিতার ঠিকানা। 'কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগে নিজের খবর জানাননি। কারণ, তাঁর জানা ছিল যে, এক সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তাঁর সুনাম সারা দুনিয়ার ছড়িয়ে পড়বে এবং তার পরই পিতার সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে।

আর যমীনের নিচে পানির অনুসন্ধান করা হুদহুদেরই দায়িত্ব ছিল। বাদশা ওসব কাজ নিজে করেন না।

মছনবী শরীফে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যে, একদা হুযুর (আলাইহিস সালাম) ওযু করছিলেন, পায়ের মোজা দু'টি খুলে নিকটেই রেখেছিলেন। এমন সময় একটি চিল ছোঁ মেরে একটি মোজা উঠিয়ে নিয়ে গেল এবং উপরে নিয়ে গিয়ে মোজাটিকে উল্‌টিয়ে নিচে ছুড়ে মারল। মোজার মধ্য হতে একটি সাপ বের হল। হুযুর (আলাইহিস সালাম) চিলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার মোজা কেন উঠালে? আরয করলো আমি যখন উড়তে উড়তে আপনার মাথা মুবারক বরাবর উপরে এসেছিলাম, তখন আপনার মাথা থেকে সুদূর আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত এমন এক নূর বিরাজমান ছিল, যার সংস্পর্শে আসার পর যমীনের সাতটি স্তরই আমার সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে উঠেছিল এবং সে আলোতে আপনার মোজার মধ্যে লুকায়িত সাপটি দেখতে পেয়েছিলাম। অন্যমনস্কতা বশতঃ আপনি মোজাটি পরিধান করলে সাপের দংশনের ফলে আপনার কষ্ট হবে এ কথা ভেবে মোজাটি উঠিয়ে নিয়েছিলাম। মাওলানা রুমী (রহঃ) হুযুর (আলাইহিস সালাম) ও উক্ত চিলের সংলাপের ঘটনাটি সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেনঃ-

مادر موزه به بينم از هوا - نيست از من عكس تست اے مصطفیؑ

অর্থাৎ চিলটি বলেছিল, শূন্যে থেকে মোজার ভিতর লুকায়িত সাপটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। হে নবী মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার নিজস্ব দৃষ্টির আলোতে তা সম্ভব হয়নি, বরং আপনার নূরের আলোক চটার ফলেই আমার দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর হয়েছিল। এর পর হুযুর (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেনঃ-

گرچه هر غيبے خدامارا نمود - دل دريں لخطه بحق مشغول بود

অর্থাৎ যদিও প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয় বা বস্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখিয়ে দেন, কিন্তু আমার অন্তর সে সময় আল্লাহর ধ্যানেই ব্যাপৃত ছিল।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একবার আরয করেছিলেন, হে আল্লাহর হাবীব, আপনি কবরস্থানে ছিলেন; এ দিকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। আপনার কাপড় ভিজে নাই কেন? উত্তরে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আয়েশা! তুমি কি কাপড় গায়ে দিয়েছ? আপনার তাহবন্দ শরীফ, বললেন আয়েশা (রাঃ)। এর পর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা বলছিলেন তা মছনবী শরীফের নিম্নোক্ত কবিতার চরণদ্বয়ে সুন্দররূপে বিধৃত হয়েছে।

گفت بهر اں نمودائے پاك جبيب :- چشم پاكت راخدا باران غيب

نيست ايں باران ازيں ابر شما :- هست باراں ديگر ويكر سما

অর্থাৎ-হে প্রিয়তমা, উক্ত তাহবন্দ শরীফের বরকতেই তোমার চোখের পর্দা উত্তোলিত হয়েছে, যার ফলস্বরূপ অদৃশ্য বিষয় তোমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। যে বৃষ্টি বর্ষিত হতে তুমি দেখেছ, তা জলবিন্দুর বৃষ্টি নয়, বরং তা ছিল নূরের প্রবাহ, এর মেঘ ও আকাশই ভিন্ন। হে আয়েশা (রাঃ),উহা কারো নজরে পড়ে না, তুমি আমার সে চাদরের বরকতেই তা দেখতে পেয়েছ।

হুদহুদ যমীনের গর্ভে কোথায় পানি আছে তা স্পষ্টরূপে দেখতে পায়। দৃষ্টির এ প্রখরতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অগ্নিকুণ্ডে পানি ঢালার বরকতে ও হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সাহচর্যের ফলেই সে লাভ করেছিল।

৯নং আপত্তিঃ হুযুর (আলাইহিস সালাম) যদি প্রত্যেক জায়গায় 'হাযির নাযির' হন, তা হলে আমাদের পবিত্র মদীনায় গমনের কি প্রয়োজন?

উত্তরঃ খোদা যখন প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান, তখন কাবা শরীফে যাবার কি প্রয়োজন? মিরাজের পবিত্র রজনীতে হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর আরশের উপর যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? মশাই! জেনে নিন, মদীনায়ে মুনাওয়ারা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের রাজধানীতুল্য, বিশেষ তজল্লী প্রতিফলিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট স্থান, যার ভূমিকা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য পাওয়ার হাউসের মত। বরং আল্লাহর ওলীদের কবরসমূহও বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন বাল্ব বিশেষ; সেগুলির যিয়ারতও একান্ত প্রয়োজন।

হুযুর আলাইহিস সালামকে মানুষ কিংবা ভাই বলে আখ্যায়িত করা সম্পর্কে আলোচনা

এ আলোচনাকে একটি ভূমিকা ও দুইটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা

নবীর সংজ্ঞা ও তাঁদের মর্যাদার স্তর সম্পর্কিত বর্ণনা

আক্বিদাহঃ নবী হচ্ছেন সে সব পুরুষ মানুষ, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা শরীয়তের বিধি নিষেধ প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন (শরহে আকায়েদ) অতএব, 'নবী' মানুষ ভিন্ন অন্য কেউ নন; আর মহিলাও নন। কুরআন ইরশাদ করছেঃ-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ

[হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার আগে যাঁদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা হচ্ছেন মানব জাতির সে সব মহা পুরুষ, যাঁদের প্রতি ওহী প্রেরণ করতাম।] একথা থেকে জানা যায় যে, জ্বীন, ফিরিশতা, মানবজাতির মহিলা বা অন্য কোন জীব নবী হতে পারে না।

আকীদাহঃ নবী সব সময়ই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করেন, উচ্চ বংশোদ্ভুত হয়ে থাকেন এবং অতি উত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী হন। নিচু বংশোদ্ভুত হওয়া ও অশোভনীয় চাল-চলন থেকে তাঁরা মুক্ত (বাহারে শরীয়ত)। বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের শুরুতে আছে যে, রোমের সম্রাট হিরাকলের নিকট হুযুর আলাইহিস সালামের সুমহান ফরমানঃ اَسْلِمْ تَسْلَمْ [ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন] পৌছার পর তিনি আবু সুফিয়ানকে ডেকে হুযুর (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল كَيْفَ نَسَبُهٗ فِيْكُمْ

অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে সে নবীর পারিবারিক ও বংশ মর্যাদা কিরূপ? হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বললেনঃ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ

অর্থাৎ তিনি আমাদের মধ্যে খুবই উচ্চ বংশ জাত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের লোক। তিনি হচ্ছেন কুরাইশী, হাশেমী ও সু-প্রসিদ্ধ আবদুল মোতালিবের পরিবারভুক্ত। এরপর হিরাকল বলেনঃ وَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِىْ قَوْمِهَا [আম্বিয়ায়ে কিরাম সব সময় উচ্চ বংশ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবার থেকেই হয়ে থাকেন।) এ থেকে জানা যায় যে, সম্মানিত নবীগণ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারেই আবির্ভূত হন।

বিঃ দ্রঃ- কেউ কেউ বলেন যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ খোদা মাফ করুন, মেথর, চামার, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও তাদেরই জাতি থেকে নবীদের আবির্ভাব হয়েছে। অতএব লাল গুরু, কৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ প্রমুখ যেহেতু নবী হতে পারে, সেহেতু তাদের সম্পর্কে খারাপ কোন ধারণা পোষণ করতে নেই। কুরআন ইরশাদ করছে- لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ [প্রত্যেক জাতির মধ্যে পথ প্রদর্শক আছেন] অধিকন্তু, অনেক মহিলাও নবী হয়েছে, কেননা, হযরত মুসা (আঃ) এর মা ও হযরত মারয়ামের (আঃ) এর নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং যার নিকট ওহী আসে, সেই-ই নবী। কুরআন ইরশাদ করছেঃ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسٰى

[আমি হযরত মুসা (আঃ) এর মায়ের নিকট প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি।

উপরোক্ত মত দুইটি ভ্রান্ত। প্রথমতঃ এজন্য যে, উল্লেখিত আয়াতটির সম্পূর্ণ অংশের উল্লেখ করা হয়নি সেখানে আর সে জন্য অনুবাদও সঠিক হয়নি। সম্পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে এ রকমঃ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

[হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), আপনি হচ্ছেন ভীতি প্রদর্শনকারী ও প্রত্যেক জাতির পথ প্রদর্শক। প্রত্যেক জাতির পথ প্রদর্শক হওয়াটাই হুযুর (আঃ) এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবীগণ পৃথক পৃথক জাতির নবী হিসেবেই আগমন করতেন। কিন্তু হে মাহবুব! আপনি হলেন প্রত্যেক জাতিরই নবী। আর যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয় যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই পথ প্রদর্শক আবির্ভূত হয়েছেন, তা হলেও এ কথা কোথায় আছে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই জাতির থেকেই পথ প্রদর্শক হয়েছেন? এও হতে পারে যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হয়েছিল, আর অন্যান্য জাতি তাঁরই হিদায়তের অধীন ছিল। হুযুর (আলাইহিস সালাম) হলেন কুরাইশী, কিন্তু পাঠান, শেখ, সৈয়দ মোটকথা সমস্ত জাতির,এমনটি সমস্ত মাখলুকের নবী হচ্ছেন তিনি। তাছাড়া উল্লেখিত هَادِىْ 'হাদী' শব্দটির ব্যাপক অর্থ রয়েছে-নবী ও

নবী নয় এমন পথ প্রদর্শক উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং, আয়াতাংশটির এ অর্থও হতে পারে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে কেউ কেউ জাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্যদের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। অধিকন্তু, মহাদেব কৃষ্ণ প্রমুখের অস্তিত্ব সম্পর্কে শরীয়ত সম্মত কোন প্রমাণ নেই। কুরআন হাদীছে তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কেবল মূর্তি পূজারীদের মাধ্যমে তাদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তাও এ রূপ যে, কারো চার হাত, কারো ছয় পা, কারো মুখে হাতীর মতই শুড় গজানো, কারো পিছনে কালো মুখ ও দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট বানরের মত লম্বা লেজ সংযোজিত। তাদের নাম যেমন মনগড়া, আকৃতি সমূহও মনগড়া। মহা প্রভু আল্লাহ তা'আলা আরবের মূর্তি পূজারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ

اِنْ هِىَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْا هَا اَنْتُمْ وَ اٰبَاءُ كُمْ

[সেগুলো হচ্ছে তোমাদের ও তোমাদের বাপ-দাদাদের মনগড়া কতগুলো নাম মাত্র] অতএব, যখন ওদের অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যাচ্ছে না, সেহেতু তাদেরকে নবী হিসেবে জ্ঞান করার কীই বা যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

আর ২য় মতটি এজন্য ভ্রান্ত যে, হযরত মুসা (আঃ) এর শ্রদ্ধেয়া মাতার অন্তরে একটি ভাবের অবতারণা করা হয়েছিল বা তাঁর অন্তরে বিশেষ একটি বিষয়ের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছিল, যার বর্ণনা কুরআন এভাবে দিয়েছেঃ اَوْحَيْنَا আমি তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি।] 'ওহী' শব্দটি 'ইলহাম' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআনে আছেঃ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ

[আপনার প্রভু মধু মক্ষিকার অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি করেছেন।] এখানে 'ওহী' শব্দটি অন্তরে অভ্যুদয় ঘটানো অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

আর হযরত মরিয়মের প্রতি যে ওহী পাঠানো হয়েছিল, তা' প্রচারধর্মী ছিল না। তাঁকে প্রচারধর্মী বিধি-নিষেধ সমূহ প্রচারের জন্য পাঠানো হয়নি। তাছাড়া ফিরিশতাদের প্রত্যেকটি কথা 'ওহী' নয়,আবার প্রত্যেক ওহীও প্রচারধর্মী নয়। কোন কোন সাহাবীও তাঁদের কথা শুনেছেন; আর মৃত্যুর সময় ও কবর ও হাশরে সবাইতো ফিরিশতাদের সাথে কথা বলবেন। তাই বলে তারা সবাইতো নবী নয়। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে হলে আমার রচিত 'শানে হাবীবুর রহমান' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন।

আক্বীদাহ ঃ কোন ব্যক্তি নিজের ইবাদত ও ধর্মীয় কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করার দ্বারা 'নবুওয়াত' লাভ করতে পারে না। নবুওয়াত হচ্ছে একমাত্র খোদার

দান।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

[কোথায় রিসালতের ভার অর্পিত হবে, তা আল্লাহ ভালরূপেই জানেন।]

আর, নবী নয় এমন ব্যক্তি গাউছ, কুতুব, আবদাল যা'ই হোন না কেন, না নবীর সমতুল্য হতে পারেন, না নবীকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। এ কথা কয়টি খেয়াল রাখা চাই।

প্রথম অধ্যায়

[নবী (আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম) কে মানুষ, ভাই ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা যে হারাম, সে সম্পর্কিত বিবরণ।]

নবী মানব জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, আর তিনি মানবই হন; জ্বিন কিংবা ফিরিশতা নন। এটি হচ্ছে পার্থিব বিধি-বিধান অনুযায়ী। কেননা মনুষ্য সৃষ্টির সূচনা হয় হযরত আদম (আঃ) থেকে-তিনিই হলেন মানুষের পিতা। আর, হুযুর (আলাইহিস সালাম) সে সময়েও নবী ছিলেন, যখন আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) মাটি ও পানির সাথে একাকার ছিলেন। স্বয়ং হুযুর (আলাইহিস সালাম) ইরশাদ করছেনঃ كُنْتُ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ [আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) পানি ও মাটির সাথে একীভূত ছিলেন।] সে সময় অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পূর্বে হুযুর আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন, 'মানব' ছিলেন না। এসব কিছুই সঠিক। তবে, নবীদেরকে 'বশর' বা 'ইনসান' বলে আহবান করা, কিংবা হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে 'হে মুহাম্মদ', 'হে ইব্রাহীমের পিতা', 'হে ভাই', 'হে দাদা', ইত্যাদি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নির্দেশক শব্দাবলী দ্বারা সম্বোধন করা 'হারাম' বা নিষিদ্ধ। যদি কেউ অবমাননার উদ্দেশ্যে এভাবে সম্বোধন করে, তা'হলে 'কাফির' বলে গণ্য হবে।

'আলমগীরী' ও অন্যান্য ফিকাহ এর কিতাবসমূহে আছে, যে ব্যক্তি হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে ' هٰذَا الرَّجُلُ এ লোকটি' বলে অভিহিত করে, সে 'কাফির'। তাঁকে বরং 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! 'ইয়া শফীয়াল

মুযনেবীন'" ইত্যাদি সম্মান সূচক শব্দাবলী দ্বারা স্মরণ করা জরুরী। কবিগণ তাদের কাব্যে 'ইয়া মুহাম্মদ' লিখে থাকেন বটে, তবে তা স্থানের সংকীর্ণতার কারণে লিখা হয়। অবশ্য কবিতা পাঠকারী যেন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পড়ে নেন। যেমনঃ এ পংক্তিতে বলা হয়েছে। واه كيا جود وكرم هے شه بطحاتيرا

(বাহ! হে সুপ্রশস্থ, বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড তথা মক্কার বাদশাহ! 'তোর' দান ও বদান্যতা কী অপূর্ব!) এ 'তোর' শব্দটি নিবিড় সম্পর্ক ও আবদার নির্দেশক শব্দ। যেমন-বলা হয়ে থাকে-'হে মওলা! আমি তোর জন্য উৎসর্গকৃত। ওহে মা! তুই কোথায়? 'হে আল্লাহ! তুই আমাদের প্রতি দয়া কর'। এ ধরনের 'তুই' ও 'তোর' প্রভৃতি শব্দাবলীর তাৎপর্য ভিন্ন।

১। কুরআন করীম ইরশাদ করেছেঃ-

لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًاوَ لَاتَجْهَرُ وْالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ ०

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মধ্যে রাসুলকে ডাকার এমন রীতির প্রচলন করিও না, যেমন করে তোমরা একে অপরকে ডেকে থাক। তাঁর সমীপে চেঁচিয়ে কথা বলিও না যেমন করে তোমরা পরস্পরের সাথে উচ্চস্বরে কথা বল; পাছে তোমাদের 'আমলসমূহ তোমাদের অজ্ঞাতসারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়।

আমলসমূহ কুফরের কারণে নস্যাৎ হয়ে থাকে। 'মদারেজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে وصل از جمله رعايت حقوق اوليست শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছেঃ-

مخوانيد ا ورابنام مبارك اوچنانكه مى خوانيد بعضے از شما بعض را بلكه بگويد يارسول الله يانبى الله يا توقير وتوضيع

অর্থাৎ-নবী (আলাইহিস সালাম) কে তাঁর পবিত্র নাম ধরে ডাকতে নেই, যেমন তোমরা পরস্পরকে ডেকে থাক। বরং তাঁকে আদব, সম্মান ও বিনয় সহকারে এভাবেই ডাকবে-'ইয়া রাসুলল্লাহ'। ইয়া নবীয়াল্লাহ'।

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' উক্ত আয়াত এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এরূপঃ

وَالْمَعْنٰى لَاتَجْعَلُوْا نِدَاءَ كُمْ اِيَّاهُ وَتَسْمِيَتَكُمْ لَهُ كَنِدَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًابِاِسْمِهٖ مِثْلَ يَامُحَمَّدُ وَيَاابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ بِلَقَبِهِ الْمُعَظَّمِ مِثْلَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ،
وَيَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَااَيُّهَاالنَّبِىُّ وَيَااَيُّهَا الرَّسُوْلُ

অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে ডাকার ও তাঁর নাম লওয়ার সময় এমনভাবে ডাকবে না, যেভাবে তোমরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকাডাকি কর। যেমন—হে মুহম্মদ! ওহে আবদুল্লাহর পুত্র! ইত্যাদি। তবে, তাঁকে মহিমান্বিত উপাধিসমূহের মাধ্যমে ডাকবে, যেমন-ওহে আল্লাহর নবী! ওহে আল্লাহর রাসুল! যেমন স্বয়ং মহা প্রভু আল্লাহ তাঁকে 'হে নবী।' হে রাসুল! বলে সম্বোধন করে থাকেন।

এসব কুরআনের আয়াত, তাফসীরকারক ও হাদীছবেত্তাগণের উক্তি সমূহ থেকে বোঝা যায় যে, যে কোন অবস্থায় হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর মান-মর্যাদার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, চাই ডাকার সময় হোক, বা কথা বলার সময় হোক কিংবা তাঁর সাথে যে কোন আচরণের সময় হোক।

২। পার্থিব মান-সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গকেও তাদের নাম ধরে ডাকা যায় না। মাকে 'আম্মা সাহেবানী', বাপকে 'শ্রদ্ধেয় পিতা' এবং ভাইকে 'ভাইজান' ইত্যাদি শব্দাবলীর দ্বারা অভিহিত করা হয়। কেউ যদি নিজের মাকে বাপের বউ, বাপকে মা'র স্বামী বলে অভিহিত করে, কিংবা তাদের নাম ধরে ডাকে, বা 'ভাই' ইত্যাদি বলে আহবান করে, তাকে বেআদব, অভদ্র বলা হবে, যদিও কথাগুলো সত্য। তার সম্পর্কে বলা হবে-সমতাসূচক শব্দাবলী দ্বারা কেন সে মুরুব্বীদের সম্বোধন করলো? আর হুযুর (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তাঁর নাম ধরে ডাকা, বা তাঁকে 'ভাই' ইত্যাদি বলে অভিহিত করা নিশ্চিতরূপে 'হারাম'। ঘরের মধ্যে বোন, মা, স্ত্রী ও কন্যা সবই মেয়ে লোক কিন্তু তাদের নাম, কাজকর্ম ও তাদের সাথে আচরণের রীতি-নীতি ভিন্ন। কেউ যদি 'মা' কে স্ত্রী বলে বা স্ত্রীকে মা ডাকে, সে বেঈমান; যে ব্যক্তি তাদের সবাইকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, সে 'মরদুদ'। অনুরূপ, যে নবীকে উম্মত ও উম্মতের কাউকে নবীর মত মনে করে, সে 'মলউন' (অভিশপ্ত)। দেওবন্দীগণ নবীকে উম্মতের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে বা তাদের পথের দিশারী/নেতা মওলী ইসমাঈল, সৈয়দ আহমদ বেরেলবীকে নবীর স্তরে নিয়ে গেছেন। খোদা মাফ করুন। ('সিরাতুল

মুস্তাকীম' গ্রন্থের সমাপ্তি পর্ব দ্রষ্টব্য)

৩। মহান আল্লাহ যাঁকে কোন বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, তাঁকে সাধারণের জন্য ব্যবহৃত উপাধি দ্বারা আহবান করা তাঁর উচ্চ পদ মর্যাদাকে অস্বীকার করার নামান্তর। পার্থিব সরকারের পক্ষ থেকে কেউ যদি 'নবাব' বা খান 'বাহাদুর' খেতাব পান, তাহলে তাঁকে 'মানুষ', মানব সন্তান'বা 'ভাই' ইত্যাদি বলে ডাকা তথা তাঁর প্রাপ্ত উপাধির মাধ্যমে না ডাকা অপরাধ হিসেবে গণ্য। কারণ এ ধরনের আচরণ দ্বারা সরকার প্রদত্ত উপাধিসমূহের প্রতি তার অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে। তাহলে যে মহান সত্ত্বাকে আল্লাহ তা'আলা 'নবী-রাসুল' ইত্যাদি উপাধিকে ভূষিত করেছেন, তাকে ওসব উপাধি বাদ দিয়ে 'ভাই' ইত্যাদি বলে অভিহিত করা মারাত্মক অপরাধ।

৪। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মহা প্রতিপালক হয়েও যেখানে কুরআন করীমের মধ্যে হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে 'হে মুহম্মদ' হে 'মুমিনদের ভাই' বলে সম্বোধন করেননি, বরং 'হে নবী' 'হে রাসুল' হে কম্বলাবৃত বন্ধু' 'হে চাদর পরিহিত বন্ধু প্রভৃতি প্রিয়-উপাধিসমূহ দ্বারা সম্বোধন করেছেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের মত গোলামদের তাঁকে মানুষ' বা 'ভাই' বলে আখ্যায়িত করার কি অধিকার আছে?

৫। কুরআন মক্কার কাফিরদের চিরাচরিত প্রথার বর্ণনা দিচ্ছে-

قَالُوْامَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا-لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

(তাঁরা বলত, আপনারা আমাদেরই মত মানুষ বৈ অন্য কিছু নন।)

(তোমরা যদি তোমাদের মত একজন মানুষের কথা মত চল, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য।) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ ধরনের আরও অনেক আয়াত আছে। এভাবে সমতা বিধান বা আম্বিয়ায়ে কিরামের মান-সম্মান খর্ব করা ইবলীসেরই রীতি। সে বলেছিল-

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

[হে খোদা! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে, আর তাঁকে (হযরত আদম আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি করেছে মাটি থেকে।] এ কথার তাৎপর্য হলো 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' এরূপ আমাদের ও পয়গাম্বরদের মধ্যে কি পার্থক্য' আমরা যেমন মানুষ তাঁরাও সেরূপ মানুষ; বরং আমরা জীবিত, তাঁরা মৃত-এসব

ইবলীসী কথা ও ধ্যান ধারণা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানব হওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিবরণ)

১। কুরআন ইরশাদ করছেঃ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

অর্থাৎঃ হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদের মত মানুষ।" কুরআনের এ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হুযুর (আলাইহিস সালাম) আমাদের মত মানুষ। তা' যদি না হয়, তা'হলে আল্লাহ মাফ করুন, এ আয়াতটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

উত্তরঃ এ আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য কয়েকভাবে এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ এখানে বলা হয়েছে قُلْ (হে মাহবুব! আপনি বলে দিন) সুতরাং, কথাটি বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে একমাত্র হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে আপনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশার্থে এরূপ বলবেন। কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি قُوْلُوْا اِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا (হে লোক সকল, তোমরা বল যে, হুযুর (আলাইহিস সালাম) আমাদের মত মানুষ।) বরং قُلْ (আপনি বলুন) শব্দটি বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, 'মানুষ' প্রভৃতি শব্দাবলী আপনি বলুন, আমি (আল্লাহ) বলব না, আমি ত বলব

شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

(সাক্ষ্য প্রদানকারী, শুভ সংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহ পথে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ।) আমি বলব يَاۤ اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَاۤ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ وَغَيْرَهٗ (ওহে কম্বল পরিহিত বন্ধু; ওহে চাদরাবৃত বন্ধু) ইত্যাদি ইত্যাদি......। আমিত আপনার মান-সম্মান বাড়াবো, আপনি বিনয় ও শালীনতা প্রকাশের জন্য এ কথাটি বলতে পারেন। অধিকন্তু, এ আয়াতে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেক জীবের ভিন্ন প্রকৃতির জীবের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ থাকে, সেহেতু বলা হয়েছে হে কাফিরগণ, তোমরা আমাকে ভয় পেয়োনা আমি তোমাদেরই মানব জাতিভুক্ত অর্থাৎ মানুষই।

শিকারকারী পশু-পাখীর মত আওয়াজ বের করে শিকার করে। অনুরূপ হুযুর কর্তৃক এরূপ উক্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফিরদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা।

দেওবন্দীগণও যদি সেই কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আয়াতে তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। আর, আমাদের তথা মুসলমানদের জন্য বলা হয়েছে اَيُّكُمْ مِثْلِيْ (তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে?) তোতা পাখীর সামনে আয়না রেখে আমরা আয়নার পেছনে দাঁড়িয়ে কথা বলি, যাতে তোতা আয়নাতে তার প্রতিচ্ছবি দেখে এ ধারণা করে যে, আওয়াজটি স্বজাতীয় কোন পাখীর। আম্বিয়ায়ে কেরাম মহাপ্রভুর আয়না বিশেষ; আওয়াজ ও মুখ তাঁদেরই, কিন্তু কথাগুলি মহাপ্রভু আল্লাহরই। যেমন এ পংক্তিতে বলা হয়েছেঃ

گفت من آینه مصقول دوست

(নবী বলেছেন, আমি হলাম আয়না, যা পরম বন্ধু স্বচ্ছ করে নির্মাণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ مِّثْلُكُمْ পর্যন্ত আয়াতটি শেষ হয়নি, বরং এর পরে আছে يُوْحٰى اِلَيَّ (আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়ে থাকে।) এ বাক্যাংশ দ্বারা উক্ত আয়াতের অর্থ সংকুচিত হয়েছে। যেমন আমরা বলে থাকি, 'যায়েদ অন্যান্য প্রাণীদের মত একটি প্রাণী, তবে সে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন,'বাক্‌শক্তি সম্পন্ন' শব্দটির ফলে অন্যান্য প্রাণীদের সাথে যায়েদের স্বত্ত্বাগত পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। এতে যায়েদ সৃষ্ট জীবের সেরা মানবজাতির অন্তর্ভূক্ত হল, আর অন্যান্য প্রাণীগণ অন্যান্য জীব হিসেবেই রয়ে গেল। অনুরূপ, এ আয়াতেও ওহীর কথা উল্লেখ থাকায় নবী ও উম্মতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচিত হল। প্রাণী ও ইনসানের মধ্যে শুধু একস্তর বিশিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, কিন্তু মানুষের মর্যাদা ও মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মান-মর্যাদার মধ্যে ২৭ স্তর বিশিষ্ট প্রভেদ রয়েছে মানুষ, মুমিন, শহীদ, মুত্তাকী, ওলী, আবদাল, আওতাদ, কুতুব, গাউছ, গাউছুল আযম, তাবেয়ী, সাহাবী, মুহাযির, সিদ্দীক, নবী, রহমাতুল লিল আলামীন ইত্যাদি......। এখানে মর্যাদার তারতম্যের স্তর বিন্যাস সংক্ষিপ্তাকারে করা হলো। আরও বিস্তারিত জানতে হলে আমার রচিত গ্রন্থ 'শানে হাবীবুর রহমান'দেখুন। অতএব, সাধারণ মানুষ ও মুস্তাফার (আলাইহিস সালাম) মধ্যে কোনরূপ তুলনাই হয় না। উভয়ের মধ্যে তুলনা করার ব্যাপারটি হল এ রকম যেমন কেউ বলল 'আল্লাহ আমাদের মত 'অস্তিত্ববান', আল্লাহ আমাদের মত 'শ্রোতা' ও 'দ্রষ্টা'। কেননা, 'মওজুদ' (বিদ্যমান) ও 'আলীম' (জ্ঞানী) শব্দদ্বয় উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আল্লাহর বিদ্যমানতার সাথে যেমন আমাদের বিদ্যমানতার কোনরূপ তুলনা চলে না, তদ্রূপ মাহবুব আলাইহিস সালামের মানবজাতিভুক্তির সাথে আমাদের মানব জাতিভুক্তির কোনরূপ তুলনা হতে পারে না। জনৈক কবি বলেছেনঃ-

اے هزاراں جبرئیل اندر بشر ؛ بهر حق سوئے غریباں ایک نظر

অর্থঃ হে পবিত্র স্বতা! যার মধ্যে হাজার হাজার জিব্রাইলের গুণাবলী নিহিত, আল্লাহর ওয়াস্তে সহায়-সম্বলহীন লোকদের দিকে একটু নজর করুন। অর্থাৎ হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর মানবীয় বৈশিষ্ট্য হাজার হাজার জিব্রাঈলী বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে উত্তম।

তৃতীয়তঃ কুরআনে করীমে আছেঃ- مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

(মহান প্রতিপালকের নূরের উপমা হচ্ছে, যেমন একটি 'তাক, যার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে......।) এ আয়াতেও (মছালু) শব্দটি আছে, যার প্রতিশব্দ হচ্ছে বাংলা ভাষায় 'উদাহরণ', অনুরূপ, 'মত' ইত্যাদি। তাই বলে কি কেউ একথা বলতে পারে যে, খোদার নূর প্রদীপের আলোর মত? এরূপ কুরআনে আরও আছেঃ- যেমন ঃ

وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَاطَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

(ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ও ডানায় ভর করে উড়ে এমন সব পাখী তোমাদের মত 'উম্মত') এখানেও اَمْثَالُ (আমছালুন, যা 'মিছলুন' এর বহুবচন) শব্দটির উল্লেখ আছে। এ থেকে কি একথা বলা ঠিক হবে, প্রত্যেকটি মানুষ গাধা, পেঁচার মত? না, কখনই তা হতে পারে না। আর আলোচ্য আয়াতে যে বিশেষত্ব জ্ঞাপক اِنَّمَا (ইন্নামা) শব্দটি রয়েছে, যদ্দারা আপাতদৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, "আমি মানুষই, অন্য কিছু নই" তা দ্বারা প্রকৃত বিশেষত্ব বোঝানো হয়নি। সেখানে যে 'বিশেষত্ব' নির্দেশিত হয়েছে তা হচ্ছে 'সাপেক্ষ'। সুতরাং, আয়াতের মূল বক্তব্য হয়-'আমি না খোদা, না খোদার পুত্র, এবং তোমাদের মত একজন নিছক বান্দাই। যেমন—হারূত-মারূত এর উক্তি ছিল اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ (আমরা হচ্ছি ফিত্না বা পরীক্ষাই)।

চতুর্থতঃ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম-এর ঈমান, ইবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন মোটকথা কোন ক্ষেত্রেই আমাদের মত নন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আছে তাঁর সাথে আমাদের বিরাট পার্থক্য। তাঁর কালেমা হচ্ছেঃ-اَنَا رَسُوْلُ اللهِ (আমি আল্লাহর রাসুল।) আমরা এরূপ বললে, 'কাফির' হয়ে যাব। তার ঈমান হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত-মহাপ্রভু, বেহেশ্ত দোযখ সবই স্বচক্ষে দেখেছেন। আর আমাদের ঈমান হল শ্রবণ জনিত। ইসলামের আরকান আমাদের বেলায় পাঁচটি, আর হুযুর (আলাইহিস সালাম) ক্ষেত্রে

চারটি, অর্থাৎ তাঁর উপর যাকাত ফরয নয়। (এ প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত 'শামী' গ্রন্থের যাকাতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।) আমাদের বেলায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, আর তাঁর উপর ফরয হচ্ছে ছয় ওয়াক্ত নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযও তাঁর উপর ফরয। কালামে পাকেই আছেঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

(এবং রাতের কিয়দংশে 'তাহাজ্জদের' নামায আদায় করবেন, যা আপনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নামায হিসেবে নির্ধারিত।) আমাদের চারিজন স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি আছে, আর তাঁর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যার বিধান নেই, তিনি যতগুলো চান, বিবাহ করার অনুমতি প্রাপ্ত।

আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের মৃত্যুর পর অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর পবিত্র স্ত্রীগণ হচ্ছেন সমস্ত

মুসলমানদের মাতা। কুরআনেই আছেঃ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ

তার স্ত্রীগণ তাদের (সকল মুসলমান) জননী। তাই তারা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পাত্রী নন। কুরআনেই রয়েছেঃ وَلَاتَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا (তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণকে তোমরা কোন কালেই বিবাহ করবে না।) আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারার বিধান আছে, কিন্তু হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিত হওয়ার বিধান নেই। আমাদের মল-মূত্র অপবিত্র, আর তাঁর শরীর মুবারক থেকে নির্গত মলমূত্র ইত্যাদি সবকিছুই উম্মতের জন্য পাক-পবিত্র। ('শামী' গ্রন্থের باب الانجاس অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 'মিরকাত' গ্রন্থের باب احكام المياه শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছেঃ

وَمِنْ ثَمَّ اَخْتَارَ كَثِيْرٌ مِّنْ اَصْحَابِنَا طَهَارَةَ فُضَلَاتِهٖ

অর্থাৎ-এ জন্যই তো আমাদের হানাফী মতাবলম্বী অনেক মনীষীই তাঁর শরীর নিঃসৃত সব কিছুকেই পাক-পবিত্র বলেই মেনে নিয়েছেন। একই মিরকাতের باب الستر শীর্ষক অধ্যায়ের শুরুতে আছে- وَلِذَا حَجَمَهُ اَبُوْطَيْبَةَ

فَشَرِبَ دَمَهُ অর্থাৎ-আবু তৈইয়াবা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শরীর থেকে শিঙ্গার মাধ্যমে ক্ষরিত রক্ত পান করেছিলেন। 'মদারেজুন' নবুয়াত গ্রন্থ প্রথম খণ্ডের وصل عرق شريف শীর্ষক বর্ণনার ২৫ পৃষ্ঠায়ও সে একই কথা বর্ণিত আছে। এতসব বৈসাদৃশ্য দেখানো হল শুধুমাত্র শরীয়তের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে। না হয়, আরও লক্ষ লক্ষ বিষয়ে তাঁর সাথে আমাদের বিরাট পার্থক্য আছে। সে মহান সত্ত্বার সাথে আমাদের কোন তুলনাই চলে না। এক কথায় বুঝে নিন যে, তিনি হচ্ছেন নজিরবিহীন বান্দা। যেমন জনৈক কবি বলেছেনঃ-

بے مثلی حق کے مظہر ہوپھر مثل تمہارا کیوں کر ہو .

نہیں کوئ تمہارا ہم رتبہ نہیں کوئ تمہارا ہم پایہ

(ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার সত্বা হচ্ছে অদ্বিতীয় আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশস্থল। তাই কেউ আপনার তুল্য হয় কি করে? আপনার সমমর্যাদা সম্পন্ন বা সমকক্ষ কেউ নেই)। অতএব, এত ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্বেও তাঁর সাথে তুলনার কি অর্থ হতে পারে?

পঞ্চমতঃ আলোচ্য আয়াতে بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (বশরুম মিছলুকুম) বলা হয়েছে, اِنْسَانٌ مِثْلُكُمْ (ইনসানুম মিছলুকুম) বলা হয়নি। এ بشر (বশর) শব্দের অর্থ হচ্ছে ذُوْ بَشَرَةٍ (যুবুশরাতিন) অর্থাৎ বাহ্যিক আবরণ ও মুখাবয়ব বিশিষ্ট, আর بَشَرَةٌ 'বুশরাতুন' বলা হয় বহিরাবরণ চামড়াকে। তাহলে بَشَرٌ 'বশরুন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়-আমাকে বাহ্যিক রং-রূপের দিক থেকে তোমাদের মত মনে হচ্ছেশরীরের অঙ্গসমূহ দেখতে একই রকম দেখাচ্ছে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে يُوْحٰى اِلَيَّ অর্থাৎ আমি 'ওহী' প্রাপ্তির অধিকারী। উল্লেখ্য যে, একথাগুলো বলা হল কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। না হয় হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর মুবারক জাহেরী অঙ্গসমূহের সাথে আমাদের জাহেরী অঙ্গসমূহের কোনরূপ তুলনাই চলে না। মহান আল্লাহর কুদরত দেখুন-সেই পবিত্র মুখের থুথু মুবারক লোনাজল বিশিষ্ট কূপে পড়লে বিস্বাদ পানিকে সুপেয় মিঠা পানিতে রূপান্তরিত করে, হুদাইয়িার শুষ্ক কূপে পড়লে পানি শূন্য কূপকে পানিতে ভরে দেয়, হযরত জাবির (রাঃ) এর ডেকচীতে নিক্ষিপ্ত হলে ঝোল ও মাংসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, আটার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে আটাকে বরকত মণ্ডিত করে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর পায়ে লাগলে সাপের বিষক্রিয়া বন্ধ

করে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রাঃ) এর ভাঙ্গা পায়ে লাগলে ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া লাগিয়ে দেয়; হযরত আলী (রাঃ) এর বেদনা বিধুর চোখে লাগলে মূল্যবান পাথরসমূহ থেকে প্রস্তুত বেদনা নাশক সুরমার কাজ করে। বর্তমান যুগের হাজার টাকা মূল্যের ওষুধেও এতটুকু অপূর্ব কার্যকারিতা নেই। হুযুর(আলাইহিস সালাম) এর আপাদমস্তক যাবতীয় মুবারক অঙ্গের বরকত মণ্ডিত বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা থাকলে আমার রচিত 'শানে হাবীবুর রহমান' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গের ছায়া আছে; হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর কোন ছায়া নেই। তাঁর পবিত্র ঘামের মধ্যে মেশক আম্বরের চেয়েও বেশী সুগন্ধি পাওয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ শাইখ আবদুল হক (রহঃ) 'মদারেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থের (১ম খণ্ড) তৃতীয় অধ্যায়ে وصل ازاله شبهات শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলেছেনঃ

در حقیقت متشابهات اند علماء آں رامعانی لائقه تاویلات رائقه کرده راجع بحق ساخته اند،

অর্থাৎঃ আসলে এ ধরনের আয়াতসমূহ 'মুতাশাবিহাত' বা দুর্বোধ্য আয়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কেরাম যথোপযুক্ত তাৎপর্য অনুধাবন ও গ্রহণযোগ্য প্রায়োগিক ব্যাখ্যা করে সত্যের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এ ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, যেরূপ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ (আল্লাহর হাত তাঁদের হাতের উপর বিরাজমান।) مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ (তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত হল যেমন একটি 'তাক'......) ইত্যাদি আয়াত, যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে খোদার শানমান এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হচ্ছে এবং "মুতাশাবিহাত আয়াত" হিসেবে গণ্য, তদ্রূপ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ الخ - (আমি মানুষই.......) ইত্যাদি আয়াতও যেগুলোর শাব্দিক অর্থ মুস্তাফা (আলাইহিস সালাম) এর শান-মানের সাথে বেখাপ্পা ঠেকছে, 'মুতশাবিহাত আয়াত বা দুর্বোধ্য আয়াত হিসেবেই গণ্য। সুতরাং, এসব আয়াতের বাহ্যিক ভাবধারাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা ভুল।

সপ্তমতঃ হুযুর (আলাইহিস সালাম) তাঁর লাগাতার রোযা রাখা প্রসঙ্গে বলেছেন- اَيُّكُمْ مِثْلِىْ অর্থাৎ-তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? বসাবস্থায় নফল নামায পড়া প্রসঙ্গে বলেছেন- لٰكِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ (কিন্তু আমি

তোমাদের কারো মত নই) সাহাবায়ে কেরামও অনেক ক্ষেত্রে বলেছেন اَيُّنَا مِثْلُهٗ (আমাদের মধ্যে হুযুর আলাইহিস সালামের মত কে আছে?) এসব হাদীছ তো পরিস্ফুট করছে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম আমাদের মত নন, আর আলোচ্য আয়াত থেকে আপাতঃ দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি আমাদের মত। তাই এসব পরস্পর বিপরীত কথাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। আর তা আয়াতের তাৎপর্য মণ্ডিত ব্যাখ্যা করেই সম্ভবপর হতে পারে।

অষ্টমতঃ তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' সুরা মারয়ামে' كهيعص প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে, হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর তিন ধরনের আকৃতি প্রকৃতি আছে-সুরতে বশরী (মানবীয় প্রকৃতি), সুরতে হক্কী (আল্লাহ প্রকৃতি) ও সুরতে মলকী (ফিরিশতা প্রকৃতি)। আর اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ الخ আয়াত এ তাঁর মানবীয় প্রকৃতির কথাই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর সুরতে হক্কীর উল্লেখ আছে এ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاٰءَ الْحَقَّ হাদীছটিতে। যেখানে বলা হয়েছে (যে আমাকে দেখেছেন, পরম সত্যকে দেখেছেন)। আর তাঁর সুরতে মলকী'র (ফিরিশতা প্রকৃতি) উল্লেখ আছে এ হাদীছটিতে -

لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَّلَانَبِيٌّ مُرْسَلٌ

(কোন কোন সময় আমি আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের স্তরে উপনীত হই যে, সে স্তরে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য কোন ফিরিশতার বা অন্য কোন 'মুরসাল' নবীরও পৌছার সাধ্য নেই।) মিরাজের রাতে 'সিদরা' পর্যন্ত পৌছলে হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর জিব্রাঈলী শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়, অথচ সে সময়ে ছিল হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর মাননীয় প্রকৃতির সবে মাত্র সূচনা। আলোচ্য আয়াতে তাঁর একটি মাত্র প্রকৃতির কথাই উল্লেখিত হয়েছে।

নবমতঃ আলোচ্য আয়াতে যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ 'আমি তোমাদের মত মানুষ' সেখানে একথা বলেননি যে কোন্ দিক দিয়ে 'তোমাদের মত।' অর্থাৎ, আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে-তোমরা যেমন কেবল বান্দা, না খোদা, না খোদার পুত্র, না খোদার গুণে গুণান্বিত; আমিও তেমনি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহও নই, আল্লাহর পুত্রও নই। ঈসায়ীগণ হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর কয়েকটি অলৌকিক কাণ্ড (মুজিযাসমূহ) দেখে তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত

করেছিল। তোমরাও আমার শত শত অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে সেরূপ কথা বলবে না বরং বলবে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'

'তাফসীর কবীরে'দ্বাদশ পারার শুরুতে আয়াত। فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হযরত নূহ (আঃ) এর কাহিনীতে আছে যে, নবী মানুষরূপে আবির্ভূত হন এজন্য যে, যদি ফিরিশতা হতেন, তাহলে জনগণ তাদের অলৌকিক কার্যাবলীকে ফিরিশতাদের স্বভাবজাত ক্ষমতা বলে ধরে নিতো। কিন্তু যখন মানুষ হয়ে ওসব মুজিযা দেখান, তখন তাঁদের পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মোট কথা, নবীদের মাননীয় আকৃতি-প্রকৃতি হচ্ছে তাঁদের পরিপূর্ণতা জ্ঞাপক বিশেষ গুণ। সুতরাং, আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্য হল আমি তোমাদের মত মানুষ হয়ে এরূপ পরিপূর্ণতা জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখাচ্ছি; তোমরা দেখাও দেখি।

দশমতঃ এমন অনেক শব্দ আছে, যা নবীগণ নিজেদের বেলায় ব্যবহার করতে পারেন এবং এতে তাঁদের পরিপূর্ণতার পরিচয় বিধৃত হয়। কিন্তু অন্য কেউ যদি তাঁদের শানে সে সব শব্দ ব্যবহার করে, তবে তা হবে চরম বে-আদবীর শামিল। দেখুন, হযরত আদম (আঃ) আরয করেছিলেন رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا [প্রভু হে! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি।] হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহর কাছে আরয করেছিলেন اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ [নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি] হযরত মুসা (আঃ) ফিরাউনকে বলেছিলেন فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ [আমি তা' করা মাত্রই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।] এখন অন্য কেউ যদি তাঁদেরকে জালিম বা পথভ্রষ্ট বলে তাহলে সে ঈমানহারা হয়ে যাবে। بشر 'বশর' শব্দটিও সেরূপ একটি শব্দ,যা' নবী নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

২নং আপত্তিঃ হুযুর (আলাইহিস সালাম) নিজের সম্পর্কে বলেছেন- اَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ [তোমরা তোমাদের ভাইকে (আমাকে) শ্রদ্ধা কর।] এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি আমাদের ভাই, তবে ছোট ভাই নন, বড় ভাই।

৩নং আপত্তিঃ কুরআন ইরশাদ করছেঃ-

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا

[মদয়ানে মদয়ানবাসীদের ভাই হযরত শুআইব (আঃ) কে পাঠিয়েছি, ছামুদ নামক জাতির নিকট তাদের ভাই হযরত সালেহ (আঃ) কে পাঠিয়েছি, এবং 'আদ'

গোত্রের নিকট তাদের ভাই হুদ (আঃ) কে পাঠিয়েছি।] এসব আয়াতে মহাপ্রভু আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামকে মদয়ানবাসী, ছামুদ ও আদগোত্রের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই বোঝা যায় যে, নবীগণ উম্মতের ভাই হিসেবে গণ্য।

উত্তরঃ হুযুর (আলাইহিস সালাম) তাঁর সৌজন্যমূলক সম্ভাষণে দয়া পরবশ হয়ে নম্রতা ও বিনয় প্রকাশার্থে নিজেকে اَخَاكُمْ।

অর্থাৎ তোমাদের ভাই বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর একথা থেকে আমরা তাঁকে 'ভাই' বলার অনুমতি পেলাম কিভাবে? রাজা বা বাদশাহ তাঁর প্রজাদেরকে বলেন-আমি আপনাদের একজন খাদেম। তাই বলে প্রজাদের অধিকার নেই তাঁকে খাদেম বলে সম্বোধন করার। তদ্রূপ, মহাপ্রতিপালক বলেছেন যে, হযরত শুআইব, সালেহ ও হুদ (আলাইহিস সালাম) যথাক্রমে মদয়ানবাসী, ছামুদ ও আদ জাতিভুক্ত ছিলেন অন্য কোন জাতির লোক ছিলেন না। একথাটুকু বোঝানোর জন্য اَخَاهُمْ অর্থাৎ 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। এ কথা কোথায় বলা হল যে, ওসব গোত্রের লোকদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল 'ভাই' বলার? বক্ষ্যমান আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, আম্বিয়ায়ে কিরামকে অন্যান্যদের সাথে সমতা নির্দেশক উপাধি দ্বারা সম্বোধন করা 'হারাম'। 'ভাই' কথাটি হচ্ছে সমতাসূচক একটি শব্দ। একথা কোন পিতাও বরদাশত করেন না যে, তার ছেলে তাঁকে 'ভাই' বলে অভিহিত করুক।

৪নং আপত্তিঃ কুরআন ইরশাদ করছেঃ-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ অর্থাৎ-মুসলমানগণ পরস্পর ভাই। হুযুরও (আলাইহিস সালাম) যেহেতু মুমিন, সেহেতু তিনিও মুসলমানদের ভাইরূপে পরিগণিত হলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে 'ভাই' কেন বলা যাবে না?

উত্তরঃ তা'হলে খোদাকেও নিজের 'ভাই' বলুন। কেননা তিনিওতো 'মু'মিন'। কুরআনে আছেঃ- اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ [তিনি বাদশাহ, দোষ-ত্রুটিমুক্ত, শান্তিদাতা ও মুমিন।] প্রত্যেক মুমিন যেহেতু পরস্পর ভাই ভাই, সেহেতু খোদাও মুসলমানদের ভাই (!) খোদা মাফ করুন! অধিকন্তু, ভাই এর স্ত্রীকে বলা হয় 'ভাবী' এবং তার সাথে বিবাহ বৈধ। কিন্তু নবীর স্ত্রীগণ হচ্ছেন মুসলমানদের মা; তাঁদের সঙ্গে বিবাহ হারাম। (কুরআন করীম) এদিক দিয়ে নবী হচ্ছেন আমাদের জন্য পিতার মত। পিতার স্ত্রী হচ্ছেন মা, ভাইয়ের স্ত্রী মা নয়। তারপর, আমরা তো মুমিন, কিন্তু হুযুর (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন স্বয়ং ঈমান।

কসীদায়ে বুর্দা শরীফে আছেঃ

فَا لصِّدْقُ فِى الْغَارِوَالصِّدِّيْقُ لَمْ يُرِيَا

অর্থাৎ- ছউর নামক গুহায় সত্যতাও ছিল, সিদ্দীকও ছিলেন। 'সত্য' হচ্ছে নবী, যাঁকে বিশ্বাস করে হযরত আবু বকর (রাঃ) "সিদ্দীকে" পরিণত হন। 'মুমিন' শব্দটি হুযুর (আলাইহিস সালাম) ও সাধারণ মুসলমান-উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমনি প্রযোজ্য হয় শব্দগত দিক থেকে প্রতিপালক ও সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু মুমিনের স্বরূপ ও প্রকৃতিগত দিক থেকে হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর সাথে সাধারণ মুসলমানদের কোনরূপ মিল নেই, আমরা এক প্রকৃতির, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ভিন্ন প্রকৃতির। এর বিস্তারিত বিবরণ ১নং প্রশ্নের উত্তরে ইতোপূর্বে প্রদান করেছি।

৫নং আপত্তিঃ হুযুর (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন আদম-সন্তান, আমাদেরই মত পানাহার করেন, নিদ্রা যান, ঘুম থেকে জেগে উঠেন, সংসার জীবনযাপন করেন, রোগে ভুগেন, মৃত্যুবরণ করেন। এত কিছুতে পূর্ণ মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁকে 'মানুষ' বা 'নিজের ভাই' বলা যাবে না কেন?

উত্তরঃ সুবিখ্যাত 'মছনবী' শরীফে এর কতইনা চমৎকার মিমাংসা করা হয়েছে, লক্ষ্য করুনঃ

گفت اینک مابشرا یشاں بشر
ما د ایشاں بستہ مسخوابیم وخور

ایں نہ دانستندایشاں ازعمی
ہست فرقے درمیا ں بے انتہا

ہر دوایك گل فی خور د زنبورنحل
زاں یکے شد نسش زاں دیگر عسل

ہر دو گون آہو کیا خور دیندواٰب
زیں یکے سر گین شد وزاں مشك ناب

ایں خور دگر دوپلید ی زیں جدا
داں خورد گرددہم نور خدا

অর্থাৎ-কাফিরগণ বলেছিল, আমরা যেমন মানুষ, পয়গাম্বরও তেমনি মানুষ,

আমরা যেমন খাওয়া-দাওয়া করি, তিনিও করেন, তিনিও আমাদের মত নিদ্রা যান। অন্ধগণ এ সত্য অনুধাবন করতে পারেনি যে, পরিণামের দিক থেকে পয়গাম্বরের সাথে আমাদের অভাবনীয় তফাৎ রয়েছে। ভ্রমর ও মৌমাছি একই ফুল থেকে রসাস্বাদন করে বটে, কিন্তু একটির মধ্যে বিষের ও মধ্যে মধুর সৃষ্টি হয়। দু'টি হরিণ একইদানা-পানি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে কিন্তু একটির পেট থেকে মলমূত্র নির্গত হয়, আর একটিতে মূল্যবান 'মেশক' সৃষ্টি হয়। এরা যা কিছু খায়, তা থেকে সৃষ্টি হয় মলমূত্র-ময়লা, আর নবীর খানা-পিনা থেকে সৃষ্টি হয় ঐশী নূর।

এ প্রশ্নটি ঠিক এ রকম যেমন কেউ বলল, আমার কিতাব ও কুরআন একই রকম। কেননা উভয়টি একই কালি দিয়ে একই কাগজে একই কলম দ্বারা লিখা হয়েছে। একই বর্ণমালা দিয়েই এ দু'টি লিখা হয়েছে। একই প্রেসে ছাপানো হয়েছে একই ব্যক্তি খণ্ড খণ্ড করে বাধাই করেছে এবং একই আলমিরায় রাখা হয়েছে। তাই, কি পার্থক্য আছে এ দু'টির মধ্যে? কিন্তু কোন নির্বোধও বলবে না যে, এত সব বাহ্যিক বিষয়ে মিল আছে বিধায় কিতাবটি কুরআনের সমতুল্য হয়ে গেছে। তা' হলে কুরআনের ধারক যিনি, তাঁর মত আমরা হই কিরূপে? তারা দেখছে না, হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর কলেমা পাঠ করা হচ্ছে, অপূর্ব মিরাজের গৌরব অর্জনে গৌরবান্বিত হয়েছেন তিনি। নামাযে তাঁরই উদ্দেশ্যে আমরা সালাম জানাচ্ছি। তাঁকেই কেন্দ্র করে দরূদ পাঠ করছি; সকল নবী ও ওলীগণ হচ্ছেন তাঁর মহা দরবারের কর্মচারী। আপনারা আমরা কোন্ ছার, ফিরিশতারাও এসব বৈশিষ্ট্যে গৌরব মণ্ডিত হননি। জনৈক কবি কি সুন্দর কথাই না বলেছেন-

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَاكَالْبَشَرْ :- يَاقُوتٌ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرْ

অর্থাৎ-মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মানব বটে, কিন্তু সাধারণ মানব নন; অতি মূল্যবান রত্ন ইয়াকুতও পাথর বটে, তবে সাধারণ পাথর নয়।

কোন কোন দেওবন্দী বলেন যে, যদি হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে 'বশর' (মানব) বলে অভিহিত করা হারাম হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে 'ইনসান' বা 'আবদ' (বান্দা) বলাও হারাম হওয়া চাই, কেননা এ শব্দগুলোর অর্থ প্রায় কাছাকাছি। অথচ আপনারা কলেমা পাঠের সময় আবদুহু ওয়া রসুলুহু' (আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল) কথাটি বলে থাকেন।

উত্তরঃ 'বশর' বা 'মানুষ' শব্দটি কাফিরগণ তাঁর অবমাননার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত; আর মহাপ্রতিপালক তাঁকে ইনসান' বা 'আবদ' বলেছেন সম্মানার্থে। যেমন

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ [আল্লাহ ইনসান (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সৃষ্টি করেছেন; তাঁকে সব কিছু বর্ণনা করার কলা-কৌশল শিখিয়েছেন।] অন্যত্র বলেছেনঃ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا মহা প্রভু রাত্রে তাঁর বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন।] তাই এ শব্দগুলো সম্মানার্থে বলা বৈধ; তবে 'বশর' বা মানুষ বলা হারাম। رَاعِنَا যেমন (আমাদিকের প্রতি লক্ষ্য করুন) এবং اُنْظُرْنَا (আমাদের দিকে নজর দিন) দুইটি সমার্থক শব্দ, কিন্তু নবীর উদ্দেশ্যে رَاعِنَا 'রায়েনা' বলা হারাম, কারণ তা হচ্ছে কাফিরদের প্রচলিত রীতি; আর اُنْظُرْنَا 'উনযুরনা' বলা হারাম নয়। নবীকে 'আবদ' বলা প্রসঙ্গে ডঃ ইকবাল কি সুন্দর কথা বলেছেনঃ-

عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر
اوسراپاانتظار ایں منتظر

অর্থাৎঃ 'আবদ' বলতে যা বুঝায় আবদুহু' বলতে তা থেকে ভিন্ন কথাই বোঝানো হয়। 'আবদ' বলা হয় তাকে, যে মওলার প্রতীক্ষায় থাকে, আর 'আবদুহু' (তাঁর বান্দা) বলা হয় সেই প্রিয়জনকে, যার জন্য স্বয়ং মওলা প্রতীক্ষায় থাকেন।

হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর 'আবদিয়তের' ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর শান প্রকাশ পায় আর মহান প্রতিপালকের মহত্বের ফলে আমাদের 'আবদিয়ত' প্রতিভাত হয়েছে। উজীর ও সিপাহী-উভয়ই রাজ কর্মচারী বটে, কিন্তু উযীরের দ্বারা বাদশাহ এর শান প্রকাশ পায়, আর সিপাহীর মান-সম্মান হচ্ছে রাজকীয় চাকুরী লাভের ভিত্তিতে।

৬নং আপত্তিঃ 'শমায়েলে তিরমীযীতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর একটি রিওয়ায়েত আছে, যেখানে তিনি হুযুর (আলাইহিস সালাম) প্রসঙ্গে বলেছেনঃ كَانَ بَشَرٌ مِّنَ الْبَشَرِ অর্থাৎ-তিনি ছিলেন মানুষদের মধ্যে একজন মানুষ (বশর)। এরূপ, হুযুর (আলাইহিস সালাম) যখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কে স্ত্রী হিসেবে বরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন সিদ্দীক আকবর (রাঃ) বলেছিলেন-আমি আপনার ভাই, আমার মেয়ে কি আপনার জন্য হালাল হবে? দেখুন, হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরকে 'বশর' বলেছেন, আর হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) বলেছেন তাঁকে নিজের ভাই।

উত্তরঃ মানুষ বা ভাই বলে নবীকে আহবান করা বা প্রচলিত ব্যবহারিক রীতি অনুযায়ী মানুষ বা ভাই বলে অভিহিত করা হারাম; তবে আকীদা বর্ণনা ও মসায়েল জিজ্ঞাসা করার হুকুম ভিন্ন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বা হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) কথাবার্তা বলার সময় হুযুরকে (আলাইহিস সালাম) ভাই বা মানুষ বলে অভিহিত করতেন না। এখানে সে শব্দটি ব্যবহার করেছেন বিশেষ প্রয়োজনে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছিলেন, হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর পবিত্র জীবন সাধারণ মুসলমানদের মত কৃত্রিমতা বিবর্জিত, সাদা-সিধে অতিবাহিত হয়েছে, প্রতিটি কাজ তিনি নিজ হাতেই সম্পন্ন করতেন। অনুরূপ হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) জানতে চেয়েছিলেন এ মাসআলাটি যে, হুযুরতো আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন, এ সম্বোধনের ফলশ্রুতি স্বরূপ সহোদর ভাই এর হুকুম আমার উপর বর্তাবে কিনা? এবং আমার কন্যাগণ হুযুরের জন্য বৈধ হবে কিনা? আকীদাহ বর্ণনার সময় আমরাও বলি যে, নবী মানুষ। হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) বিশেষ এক প্রয়োজনে স্বীয় স্ত্রী হযরত সারাহ সম্পর্কে বলেছিলেন–ইনি আমার বোন ; অথচ বিবি সারাহ ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাই এরূপ কথা থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে একথা বোঝা যায় না যে, হযরত সারাহ তাঁকে ভাই বলে ডাকতেন।

এবার উনাদের সাধারণ প্রচলিত ভাষার ব্যবহারিক দিক তুলে ধরছি। একথা সর্বজন বিদিত যে, আত্মীয়তার দিক থেকে হুযুর (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর স্বামী, সাইয়িদুনা হযরত আলী (রাঃ) এর ভাই এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যখনই তাঁরা হাদীছ রিওয়ায়াত করতেন, তখন হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) এরূপ বলতেন না,-'আমার স্বামী বলেছেন,' হযরত আব্বাস (রাঃ) বা হযরত আলী (রাঃ) বলতেন না-'আমার ভাইপো বা আমার ভাই ইরশাদ করেছেন। সবাই বলতেন

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করছেন।] সুতরাং, যাঁরা আত্মীয়তার দিক থেকে ভাই হয়েও তাঁকে ভাই বলতেন না, এমতাবস্থায় আমাদের মত নগণ্য গোলামদের কি অধিকার আছে তাঁকে ভাই বলার? কবির ভাষায়ঃ-

نسبت خود بسگت کردم وبس منفعلم
زانکه نسبت بسگت کوئی تو شدبے ادبے است
هزار بار بشویم دهن بمشك وگلاب
هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

অর্থাৎ-হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার কুকুরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি। আপনার কৃপা লাভের জন্য এরূপ সম্পৃক্ততা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নতুবা আপনার গলির কুকুরের সাথে আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে সম্পর্কযুক্ত করাও বে-আদবীর শামিল। আমার এ অপবিত্র মুখকে হাজার বার গোলাপ জল ও মেশক দ্বারা ধুয়েও আপনার মুবারক নাম উচ্চারণ করা পুরাপুরিই বে-আদবী।

জনাব, ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে এ বিধান ছিল যে, কেউ যদি কোন বিষয়ে হুজুর (আলাইহিস সালাম) এর সমীপে কিছু আরয করতে চাইতেন, তখন তাঁকে কিছু দান করেই আরয করতে হত। এ প্রসঙ্গে কুরআন ইরশাদ করেছেঃ-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَیْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً

অর্থাৎ-ওহে মুমিনগণ, যখন তোমরা রাসুলের কাছে চুপে চুপে কোন কথা আরয করতে চাও, তখন আরয করার আগে কিছু সদকা কর। সাইয়িদুনা হযরত আলী (রাঃ) এ নিয়ম পালন করেছিলেন। (তাফসীরে খাযেনে' সে একই আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এ বিধান পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে বটে, তবে, এতে হুজুর (আলাইহিয়া সালাম) এর মান-মর্যাদার মাহাত্ম্যই ফুটে উঠেছে। নামাযে মহা প্রতিপালকের সাথে কথা বলার জন্য কেবল ওযু করলেই হয়, আর হুযুর সমীপে কিছু আরয করতে চাইলে সদকা করতে হয়। এমতাবস্থায় তাঁকে ভাই বলার অবকাশ রইল কোথায়?

'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে আহ্বান করা বা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' শীর্ষক শ্লোগান প্রসঙ্গে আলোচনা।

হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে দূর বা কাছ থেকে আহবান করা বৈধ-তাঁর পবিত্র ইহ-লৌকিক জীবনে ও তাঁর ওফাতের পরেও। তাই একজন 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে আহ্বান করুক, কিংবা এক দলের সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে 'ইয়ারাসুলাল্লাহ বলে শ্লোগান দিক-এ উভয় ক্ষেত্রে এ আহবান বৈধ। আলোচ্য বিষয় বস্তুকে দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

('ইয়ারাসুলাল্লাহ' বলে ডাকার প্রমাণাদি প্রসঙ্গে')

হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে আহবান করার স্বপক্ষে প্রমাণাদি কুরআন করীম, ফিরিশতা ও সাহাবীদের কর্মকাণ্ড ও উম্মতের বিবিধ কার্যাবলীতে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন করীমের অনেক জায়গায় আছে।

يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

হে নবী, হে রাসুল, ওহে কম্বলাবৃত বন্ধু, ওহে চাদরাবৃত বন্ধু ইত্যাদি বলে। দেখা যায়, উল্লেখিত আয়াতসমূহে তাঁকে আহবান করা হয়েছে। অন্যান্য নবীদেরকে অবশ্য তাদের নাম ধরেই সম্বোধন করেছে কুরআন করীম। যেমন

يَايَحْيٰى يَاإِبْرَاهِيْمُ يَاآدم يَامُوْسٰى يَاعِيْسٰى

হে মুছা, হে ঈসা, হে ইয়াহয়া, হে ইব্রাহীম, হে আদম ইত্যাদি (আলাইহিমুস সালাম)। কিন্তু মাহবুব (আলাইহিস সালাম) কে আহবান করেছে প্রিয় উপাধিসমূহে ভূষিত করে। কবির ভাষায়ঃ-

یا آدم است باپدر انبیاء خطاب
یا ایها النبي خطاب محمد است

অর্থাৎ-নবীগণের জনক হযরত আদম (আঃ) কে ডাকা হয়েছে 'ইয়া আদামু' বলে, আর মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে ডাকা হযেছে 'ওহে নবী' উপাধিতে।

কুরআন করীম বরঞ্চ সাধারণ মুসলমানদেরকেও এভাবে আহবান করেছেঃ- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ)। আর তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছে-মাহবুব আলাইহিস সালামকে আহবান করো সম্মানসূচক উপাধিসমূহের মাধ্যমে। কুরআনই ইরশাদ করছেঃ

لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(তোমরা রাসুলকে এমনভাবে ডেকো না, যেভাবে তোমরা একে অপরকে ডাক।) এখানে তাঁকে ডাকতে নিষেধ করা হয়নি। বরং অন্যান্যদেরকে ডাকার মত না ডাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন অন্যত্র ইরশাদ করেছেঃ-

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ (তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে ডাকা)। এ আয়াতে এ কথাটির অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) কে 'ইবনে হারিছা' অর্থাৎ 'হারিছার পুত্র' বলে ডাক, কিন্তু তাঁকে 'ইবনে রাসুলল্লাহ' বা 'রাসুলুল্লাহর পুত্র' বলে ডেকোনা। এরূপ কাফিরদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের সাহায্যার্থে তাদের সাহায্যকারীদেরকে ডাকারঃ

وَادْعُوْاشُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

অর্থাৎ তোমরা যদি নিজের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তা'হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীদেরকে ডেকো।

'মিশকাত' শরীফের প্রথম হাদীছে আছে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করছিলেনঃ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ 'হে মুহম্মদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন।' এখানে আহবান করার বিধান পাওয়া গেল। সে একই মিশকাত শরীফের 'ওফাতুন্নবী' শীর্ষক অধ্যায়ে আছে, হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর ওফাতের সময় মলকুল মউত আরয করছিলেনঃ

يَامُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ

হে মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। দেখুন, এখানেও 'ইয়া মুহম্মদ' বলে আহবান করা হয়েছে। 'ইবনে মাজা' শরীফের 'সালাতুল হাজত' শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত উছমান ইবন হানীফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক অন্ধ ব্যক্তি হুযুর (আলাইহিস সালাম)এঃ মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে অন্ধত্ব দূরীকরণার্থে দোয়া প্রার্থী হয়েছিলেন, হুযুর (আলাইহিস সালাম) তাঁকে শিখিয়ে দিলেন এ দু'আটিঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتَقْضِىَ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ قَالَ اَبُوْا اِسْحٰقَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

('হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, রহমতের নবী মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মারফত তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি। হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমি আপনার মাধ্যমে আপন প্রতিপালকের দিকে আমার এ উদ্দেশ্য (অন্ধত্ব মোচন) পূরণ করার নিমিত্তে মনোনিবেশ করলাম, যাতে আপনি আমার এ উদ্দেশ্য পূরণ করে দিন। হে আল্লাহ, আমার অনুকূলে হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর সুপারিশ কবুল করুন।) এ হাদীছটির বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে হযরত আবু ইসহাক (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীছটি বিশুদ্ধ (সহীহ)।

লক্ষ্য করুন, দু'আটি কিয়ামত পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য শিক্ষার বিষয় বস্তুতে পরিণত হল। এখানে হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে আহবান করা হয়েছে এবং তাঁর সাহায্যও প্রার্থনা করা হয়েছে।

'ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী' ১ম খণ্ডের 'কিতাবুল হজ্জ' এর 'আদাবু যিয়ারতে কবরিন্নবী আলাইহিস সালাম' শীর্ষক বর্ণনায় উল্লেখিত আছেঃ-

ثُمَّ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

অতঃপর নবীর রওযা যিয়ারতকারী ব্যক্তি বলবে-হে নবী, আপনার প্রতি আমার সালাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসুল। এর পর লিখা হয়েছেঃ

وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْغَارِ

যিয়ারতকারী এর পর বলবে 'ওহে রাসুলাল্লাহর সত্যিকার প্রতিনিধি, আপনার প্রতি সালাম; ওহে রাসুলের গুহার সাথী, (ছউর নামক পাহাড়ের গুহায় সহাবস্থানকারী) আপনার প্রতি আমার সালাম।' এর পর আরও লিখা হয়েছেঃ

ثُمَّ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْاِسْلَامِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ

যিয়ারতকারী তারপর বলবে 'ওহে মুসলমানদের আমীর, আপনার প্রতি সালাম, ওহে ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণাকারী, আপনার প্রতি সালাম, ওহে মূর্তি নিধনকারী আপনার প্রতি সালাম, (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।' এখানে দেখুন, হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কে ডাকা হয়েছে এবং তাঁরই পার্শ্বদেশে শায়িত হযরত সিদ্দীক ও ফারুক (রাঃ) কেও ডাকার বিধান রাখা হয়েছে। এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন ব্যক্তিবর্গ, আওলিয়ায়ে মিল্লাত, মশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীনও তাঁদের দু'আ ও নির্ধারিত পাঠ্য ওয়াযীফাসমূহেও 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে আহবান করে থাকেন। যেমন-'কসীদায়ে বোর্দা' শরীফে আছেঃ-

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِىْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

হে সৃষ্ট জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত সত্ত্বা, আপনি ছাড়া আমার এমন কেউ নেই, যার কাছে ব্যাপক বিপদাপদের সময় আশ্রয় নিতে পারি।

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহঃ) স্বীয় কসীদায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে আহবান করেছেন এভাবেঃ-

يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ اَدْرِكْ لِزَيْنِ الْعَابِدِيْنَ
مَحْبُوْسٌ اَيْدِى الظَّالِمِيْنَ فِىْ مَوْكِبِ الْمُزْدَحِمِ

হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহমতের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), সেই যয়নুল আবেদীনের সাহায্যে এগিয়ে আসুন, যে জালিমদের ভিড়ের মধ্যে তাদের হাতে বন্দী হয়ে কাল যাপন করছে।

স্বনামধন্য আল্লামা জামী (রহঃ) বলেছেনঃ

زمهجورے برامدجان عالم:- ترحم يا نبى الله ترحم
نه اخر رحمة للعالمين :- زمحرو ماں چرافارغ نشينى

আপনার বিরহ বেদনায় সৃষ্টি জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হে আল্লাহর নবী, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, দয়ার ভান্ডার খুলে দিন। কেন, আপনি সারা বিশ্বের

জন্য রহমতস্বরূপ নন কি? আমাদের কত বঞ্চিত ও পাপীদের প্রতি এত বিমুখ হয়ে রয়েছেন কেন?

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) স্বীয় 'কসীদায়ে নু'মানে' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে আহবান করেছেন এভাবে-

يَاسَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا
اَرْجُوْرِ ضَاكَ وَاَحْتَمِىْ بِحِمَاكَ

ওহে সর্দারদের সর্দার, অন্তরে দৃঢ় আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়েছি এবং নিজেকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি।

এসব কবিতার স্তবকসমূহে হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে আহবান করা হয়েছে, তাঁর সাহায্য কামনা করা হয়েছে। এ আহবান করা হয়েছে দূর থেকে তাঁর ওফাতের পর। সকল মুসলমান নামাযে বলেনঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ওহে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও 'বরকতসমূহ' আপনার উপর বর্ষিত হোক! নামাযে তাঁকে এভাবে আহবান করা 'ওয়াজিব' বা আবশ্যিক কর্তব্য। এ 'আততাহিয়াতু' প্রসঙ্গে 'হাযির-নাযির' এর আলোচনায় সুবিখ্যাত 'ফত্ওয়ায়ে শামী' ও 'আশআতুল লমআত' গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতিসমূহ আগেই পেশ করেছি।

এতক্ষণ পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হল এককভাবে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলা প্রসঙ্গে। যদি অনেক লোক একত্রে সমবেত হয়ে সমবেত কণ্ঠে 'নারায়ে-রিসালাত' ধ্বনি তোলে, তা'হলে তা'ও জায়েয। কারণ, যখন এককভাবে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলা জায়েয, তখন এক সাথে সবাই মিলে বলাও জায়েয হবে বৈকি। কয়েকটি 'মুবাহ' (যে সব কাজ করলে কোন ছওয়াব নেই, না করলেও কোন পাপ নেই, সে সব কাজ মুবাহ।) কাজকে একত্রিত করলে সমষ্টিও 'মুবাহ' বলে গণ্য হবে। যেমন- বিরানী 'হালাল'। কেননা তা হচ্ছে কয়েকটি হালাল দ্রব্যাদির সমষ্টি মাত্র।

অধিকন্তু, সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে আহবান করার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে।

'মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে 'হাদীছুল হিজরত' শিরোনামের অধ্যায়ে হযরত বরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (আলাইহিস সালাম) যখন মক্কা ত্যাগ

করে মদীনা শরীফের প্রান্ত সীমায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে কিরূপে স্বাগত জানানো হয়েছিল তার বিবরণ হাদীছের ভাষায় শুনুনঃ

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَامُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُوْنَ يَامُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَامُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

তখন মদীনার নারী-পুরুষ ঘরের ছাদসমূহের উপর আরোহণ করেন, ছোট ছোট ছেলে ও ক্রীতদাসগণ মদীনার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়েন, সবাই 'ইয়া মুহাম্মদ' 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন।

মুসলিম শরীফের এ হাদীছে 'নারায়ে রিসালাত' ধ্বনি তোলার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিধৃত। জানা গেল যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম নারায়ে রিসালতের ধ্বনি তুলতেন। এ হাদীছে হিজরতে একথাও আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম 'জুলুস'ও বের করেছেন। হুযুর (আলাইহিস সালাম) যখনই কোন সফর থেকে মদীনা শরীফে ফিরে আসতেন, তখন মদীনা বাসীগণ তাঁকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানাতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে জুলুস'বের করতেন। (মিশকাত ও বুখারী প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থ দ্রষ্টব্য) উল্লেখ্য যে, আরবী 'জলসা' শব্দের অর্থ হল বৈঠক বা উপবেশন। এ শব্দটির বহুবচন হচ্ছে 'জুলুস', যেমন 'জলদাহ' শব্দের বহুবচন হচ্ছে 'জুলুদ' অর্থ হচ্ছে বেত্রাঘাত তখন দুর্‌রা নামে অভিহিত হত। নামাযও আল্লাহর যিকরের 'জলসা'-একই জায়গায় বসে সম্পন্ন করা হয়। আর হজ্জ্ব হচ্ছে যিক্‌রের 'জুলুস'-এক বৈঠকে সম্পন্ন করা যায় না, বরং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে সম্পন্ন করতে হয়। কুরআন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 'তাবুতে ছকীনা' (বনী ইস্রাঈলের অতি বরকতমণ্ডিত 'সমশাদ' বৃক্ষ নির্মিত একটি বাক্স, যেখানে হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিস সালাম এর লাঠি পাগড়ী, পাদুকা ও কাপড় চোপড় রক্ষিত ছিল) ফিরিশতাগণ 'জুলুস' সহকারে নিয়ে এসেছিলেন। হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর শুভ জন্মক্ষণেও মিরাজের রাতে ফিরিশতাগণ তাঁর সম্মানার্থে 'জুলুস' বের করেছিলেন। সৎ ও পুতঃ মাখলুকের অনুকরণ করাও পুণ্য কাজ। সুতরাং, বর্তমানে জুলুসের যে প্রচলন আছে, তা পূর্বসুরীদের অনুকরণ বিধায় একটি পূণ্য কাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

('ইয়া রাসুলাল্লাহ্' বলা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিবরণ)

১। কুরআন করীম ইরশাদ করছেঃ-

وَلَاتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَايَنْفَعُكَ وَلَايَضُرُّكَ

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ডেকো না, যা' তোমার লাভ বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। এ থেকে জানা গেল যে, খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা নিষেধ। অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَيَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَايَضُرُّهُمْ

(এরা খোদা ছাড়া অন্য কিছুকে ডাকে, যা' তাদের উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না।) সুতরাং, প্রমাণিত হল, খোদা ভিন্ন অন্যকে ডাকা মূর্তি পূজারীদের কাজ।

উত্তরঃ এ ধরনের আয়াতসমূহে যেখানে دُعَا দু'আ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এ দু'আ শব্দ দ্বারা ডাকার কথা বোঝানো হয়নি, বরং শব্দটির লক্ষ্যার্থ হচ্ছে পূজা করা (তাফসীরে জালালাইন ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য।) এখানে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করো না। দ্বিতীয় আয়াতটি এ লক্ষ্যার্থের প্রতি সমর্থন যোগাচ্ছে। প্রতিপালক আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

(যে বা যারা খোদার সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে (পূজা করে).....। এ থেকে বোঝা গেল, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে খোদা মনে করে ডাকাটা 'শিরক'। কেননা এতে খোদা ভিন্ন অন্যের ইবাদত বোঝা যায়। যদি এ সব আয়াতের লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সে সব আয়াত, হাদীছ ও উলামায়ে দ্বীনের উক্তিসমূহ, যা' ইতিপূর্বে পেশ করেছি, যেখানে খোদা ভিন্ন অন্যকে ডাকা হয়েছে, সবই শির্কে পর্যবসিত হবে। জীবিতকে ডাকা হোক, বা মৃতকে ডাকা হোক, সর্বাবস্থায় 'শিরক' বলে গণ্য হবে। প্রত্যহ আমরা ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিদেরকে ডাকাডাকি করি। তাই, পৃথিবীতে কেউ শির্ক থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অধিকন্তু, 'শিরক বলা হয় খোদা ছাড়া অন্য কাউকে খোদার সত্ত্বা ও গুণাবলীতে অংশীদার গণ্য করাকে। কাউকে ডাকলে বা আহবান করলে খোদার কোন্ গুণে অংশীদার করা

হচ্ছে? এবং তা শিরক হবে কেন?

২। কুরআন ইরশাদ করছেঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰي جُنُوْبِكُمْ

(দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় 'আল্লাহকে স্মরণ কর) এ থেকে জানা গেল যে, উঠতে-বসতে খোদা ভিন্ন অন্য কারো নাম জপ করা শিরক; এক মাত্র আল্লাহরই যিক্র করা চাই।

উত্তরঃ এ আয়াত থেকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জিক্রকে হারাম বা শির্ক জ্ঞান করা অজ্ঞানতা মাত্র। উক্ত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে, নামায আদায় করার পর তোমরা যেকোন অবস্থায়, যে কোনভাবে খোদার যিক্র করতে পারবে। অর্থাৎ নামাযে নির্ধারিত নিয়মাবলী পালনের প্রয়োজনীয়তা ছিল-ওযু ছাড়া নামায হবে না, সিজদা, রুকু ও বসা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না এবং বিনা কারণে বসে শোয়ে আদায় করা যাবে না। কিন্তু নামাজের কাজ যখন সমাধা হয়ে যাবে, তখন এত সব নিয়মাবলী পালনের প্রয়োজন আর থাকছে না। এখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় খোদাকে স্মরণ করতে পারবে।

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ এ আদেশাত্মক আয়াতে فَاذْكُرُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে স্মরণ কর) যে আদেশটি দেয়া হয়েছে, তা কাজটির আবশ্যিকতা জ্ঞাপনের নিমিত্তে প্রয়োগ করা হয়নি, কেবল কাজটির বৈধতা জ্ঞাপনার্থে আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নামায ব্যতীত অন্য সময় খোদাকে স্মরণ করা, বা খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে স্মরণ করা কিংবা একদম নিশ্চুপ থাকা সব কিছুর অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আয়াতের এ আদেশটিকে আবশ্যিকতা জ্ঞাপনার্থে ধরে নিলেও খোদা ছাড়া অন্য কারো জিক্র নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে না। কেননা, খোদা ছাড়া অন্য কারো যিকরের সাথে খোদার যিক্রের 'বিরুদ্ধে বিরোধিতামূলক সম্পর্ক নেই; বরং আল্লাহর যিকরের সাথে বিরুদ্ধ বিরোধিতামূলক সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর যিক্র না করার (দু'টি বিরুদ্ধ বিরোধিতামূলক বিষয়ের প্রথমটি সত্য হলে, দ্বিতীয়টি মিথ্যা হবেই। আবার দ্বিতীয়টি মিথ্যা হলে প্রথমটি সত্য হবে অনিবার্যরূপেই।) তৃতীয়তঃ আল্লাহর যিক্র ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের যিকর এ বিষয় দু'টিতে তর্কের খাতিরে যদি বিরুদ্ধ বিরোধিতামূলক সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তা'হলেও বিষয় দু'টির একটি ওয়াজিব হবার কারণে অপরটি বেশীর পক্ষে

হারাম হবে, শির্‌ক হবে না। স্মর্তব্য যে হারাম বা ফরয হওয়া-এগুলো 'কর্মেরই' বৈশিষ্ট্য, কর্মের না বাচক সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য নয়। চতুর্থতঃ হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম) এর যিক্‌র পরোক্ষভাবে খোদার যিক্‌র হিসেবে গণ্য। কুরআন ঘোষণা করছেঃ-

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। কলেমা, নামায, হজ্ব, দরূদ, খুতবা ও আযান মোট কথা সমস্ত ইবাদতে হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর যিক্‌র অন্তর্ভুক্ত ও জরুরী। এমতাবস্থায় নামাযের পরে অন্য যে কোন সময়ে উঠতে বসতে তাঁর যিক্‌র হারাম হবে কেন? যে ব্যক্তি উঠতে বসতে সদা সর্বদা দরূদ শরীফ বা কলেমা পাঠ করে, সে হুযুরেরই যিক্‌র করছে এবং সে জন্য ছওয়াবের ভাগী হচ্ছে।

পঞ্চমতঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ (তব্বত য়াদা আবি-লাহাব) সুরায়ে মুনাফিকুন ও অন্যান্য আয়াত যেখানে কাফিরদের বা তাদের প্রতিমা সমূহের উল্লেখ আছে, সে সব সুরা ও আয়াতের তিলাওয়াত আল্লাহর যিক্‌র কিনা? নির্দ্বিধায় বলা যাবে, তা আল্লাহর যিক্‌র। কারণ সেগুলো কুরআনের আয়াত। কুরআনী আয়াতের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ছওয়াব নির্ধারিত, যদিও বা সেসব আয়াতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু হচ্ছে কাফিরগণ বা তাদের প্রতিমা। কারণ, তা আল্লাহরই বাণী। কিন্তু এ কোন্ ধরনের ইন্‌সাফ, আল্লাহর কালামের যিক্‌র আল্লাহর যিকর হিসেবে গণ্য হবে, আর রহমতে এলাহী বা নূরে এলাহী মুহাম্মদ রাসুলাল্লাহর যিক্‌র আল্লাহর যিক্‌রে গণ্য হবে না? কুরআনে আছেঃ قَالَ فِرْعَوْنُ (কালা ফিরআওনু) অর্থাৎ 'ফিরাউন বলল'। এখানে 'কালা' শব্দটি পাঠ করলে ৩০টি ছওয়াব এবং 'ফিরআউন' শব্দটি পাঠ করলে ৫০টি ছওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে ১০টি ছওয়াব নির্ধারিত। এখন লক্ষ্য করুন, কুরআনে ফেরাউনের নাম পাঠ করা হলে ছওয়াব পাওয়া যায় ৫০, আর মুহাম্মদ রাসুলাল্লাহর নাম নিলে 'মুশরিক' হতে হয়-এ কোন্ ধরনের যুক্তি?

সপ্তমতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বিচ্ছেদ বেদনায় শোকাহত হয়ে উঠতে বসতে সদা হযরত ইউসুফের নাম উচ্চারণ করতেন এবং তাঁরই শোকে এত অধিক কান্নাকাটি করেছেন যে, তার চোখ দু'টি সাদা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ হযরত আদম (আঃ) হযরত হাওয়ার বিচ্ছেদ ব্যথার বিবি হাওয়ার

নাম জপ করতেন, হযরত য়য়নুল আবেদীন (রাঃ) স্নেহময় পিতা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শোকে উঠতে-বসতে পিতার নাম জপ করতেই থাকতেন। আর তাঁর শোকাহত অবস্থা যেন ব্যথাতুর হয়ে ফুটে উঠতঃ

حال من در هجر والد کمتر از یعقوب نیست

اوپسر گم کرده بود ومن پدر گم کرده ایم

অর্থাৎ পিতৃশোকে আমার অবস্থা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর শোকাহত অবস্থার চেয়ে কম নয়। অবশ্যি তিনি হারিয়েছিলেন পুত্র, আর আমি হারিয়েছি পিতাকে।

এখন বলুন, তাঁদের উপর শির্‌ক এর হুকুম প্রযোজ্য হবে কিনা? যদি প্রযোজ্য না হয়, তা'হলে যে আশেকে নবী নিজের নবীর নাম স্মরণ করেন, তিনি মুশরিক হবেন কেন? একজন ব্যবসায়ী দিন রাত তার ব্যবসার কথাই উল্লেখ করে। আর জ্ঞানান্বেষী ছাত্র দিন রাত সর্বদা নিজের পাঠের কথা স্মরণ করে। তারাওতো খোদা ছাড়া অন্য কিছুর নাম জপ করছে, তারা মুশরিক নয় কেন?

বিঃ দ্রঃ-এ 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে ডাকার বৈধতা-অবৈধতা প্রসঙ্গে আমি এক তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম পাঞ্জাবের দীনা নগরে মওলবী ছনাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতটিই (২ নং প্রশ্নে উল্লেখিত আয়াত) পেশ করেছিলেন। আমি কেবল তিনটি প্রশ্ন রেখেছিলাম তাঁর কাছে। এক, কুরআনে আজ্ঞাবাচক শব্দসমূহ কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এখানে আয়াতে উল্লেখিত আজ্ঞাবাচক শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? দুই, এমন দু'টি বিষয়ের, যা'দের মধ্যে 'বিরুদ্ধ-বিরোধিতামূলক' সম্পর্ক রয়েছে, একটি 'ওয়াজিব' হলে অপরটি হারাম হবে কিনা? তিন, আল্লাহর যিক্‌রের সাথে যে বিষয়টির বিরুদ্ধ বিরোধিতা সম্পর্কে আছে, সে বিষয়টি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো যিক্‌র করা, না আল্লাহর যিক্‌র না করা? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি এসব ব্যাপারে 'উসুলে ফিকাহ' ও যুক্তিবিদ্যাকে স্থান করে দিয়েছেন, অথচ এ উভয় বিদ্যাই 'বিদআত'। অর্থাৎ অজ্ঞ থাকাই 'সুন্নাত।' তাহলে 'বিদআতের' এমন এক শুদ্ধ সংজ্ঞা দিন, যাতে মাহফিলে মীলাদ হারাম সাব্যস্ত হয়, আর 'আহলে হাদীছ' এর সংবাদপত্র প্রকাশ সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয়-প্রশ্নাকারে বলেছিলাম আমি। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও দেয়া হল না। আর জীবিতবস্থায় কেউ তাঁকে দিয়ে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করালে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতাম। আফসোস! ছনাউল্লাহ সাহেব উত্তর না

দিয়েই এ ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। আহা! তাঁর অনুরক্ত ও গুণগ্রাহীদের কেউ যদি উত্তর প্রদান করে তার আত্মাকে সন্তুষ্ট করত!

৩। বুখারী শরীফ ২য় খণ্ডে كتاب الاستيذان بحث مصافحة এর باب الاخذباليدين শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আমাদেরকে 'আত্‌তাহিয়াত' তাশাহুদ' পাঠে শিখিয়েছেনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত সমূহ বর্ষিত হোক। এর পরে আছেঃ

فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْهِ يَعْنِىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ-হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর ওফাতের পরে আমরা 'আততাহিয়াত' পড়ার সময় বলেছিঃ নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উক্ত বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আইনী'তে এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

فَظَاهِرُ هَا اَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ بِكَافِ الْخِطَابِ فِىْ حَيَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا مَاتَ تَرَكُوا الْخِطَابَ وَذَكَرُوْهُ بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ فَصَارُوْا يَقُوْلُوْنَ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ হাদীছের অর্থ দাঁড়ায়, সাহাবায়ে কেরাম হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর পবিত্র ইহ্‌কালীন জীবনে সম্বোধন করেই বলতেন 'আসসালামু আলাইকা' অর্থাৎ আপনার প্রতি সালাম। আরও পরিষ্কাররূপে বলতে গেলে,তাঁরা আরবী কর্মবাচক মধ্য পুরুষের শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু যখন নবীর ওফাত হয়ে গেল, তখন তাঁরা মধ্যম পুরুষের কর্মবাচক শব্দটি ব্যবহারের রীতি পরিহার করে তদস্থানে নাম পুরুষের ব্যবহার আরম্ভ করলেন, আর বলতে লাগলেন 'আসালামু আলান নবীয়ে' অর্থাৎ-নবীর প্রতি সালাম।

উক্ত হাদীছ ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থের ইবারত থেকে জানা গেল যে, তাশাহুদ পাঠে 'আস্‌সালামু আলাইকা' বলা হত হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর পবিত্র জীবদ্দশায়।

তাঁর ওফাতের পর তাশাহুদ পাঠে তাঁকে সম্বোধনের রীতি বর্জিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু তাশাহুদ পাঠে নবীকে সম্বোধন করে ডাকার রীতি পরিহার করেছিল, সেহেতু কেউ নামাযের বাইরে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' ইত্যাদি বলে নবীকে সম্বোধন করলে সে পুরোপুরি 'মুশরিকরূপে গণ্য হবে।

উত্তরঃ বুখারী শরীফ ও 'আইনীর উক্ত ইবারত আপনাদের মতেরও পরিপন্থী। কেননা,আজ পর্যন্ত কোন মুজতাহিদ ইমাম 'তাশাহুদ (আত্‌তাহিয়াত) পরিবর্তন করার নির্দেশ দেননি। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) গ্রহণ করেছেন হযরত ইবন মসউদ (রাঃ) এর বর্ণিত তাশাহুদ, আর ইমাম শাফেঈ (রহঃ) গ্রহণ করেছেন হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) এর বর্নিত তাশাহুদ। উভয় তাশাহুদে "আসসালামু আলাইকুম আইয়ুহান নবীইয়ু" ইবারতটুকু উল্লেখিত আছে। লা-মযহাবীরাও ছনায়ী দলভুক্ত হোক বা গজনবী দলভুক্ত-এ সম্বোধন পদ সম্বলিত তাশাহুদ পাঠ করে থাকে। সুতরাং, বুখারী ও আইনীর ইবারত থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোন কোন সাহাবী স্বীয় ইজতিহাদ (গবেষণা) অনুযায়ী 'তাশাহুদ পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু 'হাদীছে মরফু'র মুকাবিলায় সাহাবীর নিজস্ব গবেষণালব্ধ বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। (যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের সূত্র অব্যাহতভাবে হুযুর আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বিস্তৃত, সে হাদীছকে হাদীছে মরফু বলা হয়।) আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা পরিবর্তন করেছিলেন, তারা এজন্য পরিবর্তন করেননি যে অদৃশ্য বা অনুপস্থিত সত্ত্বাকে সম্বোধন করা হারাম। তা' না হলে হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর পবিত্র জীবদ্দশায় দূরে বসবাসকারী সাহাবায়ে কেরাম এ সম্বোধন পদ (হে নবী) সম্বলিত তাশাহুদ পাঠ করতেন না। সুদূর ইয়ামন, খাইবর, মক্কা মুকাররমা, নজদ ও ইরাকের সব জায়গায় নামায পড়া হত। সব জায়গায় সে একই তাশাহুদ পাঠ করা হত। অদৃশ্য বা অনুপস্থিত সত্ত্বাকে সম্বোধন করার প্রচলণ সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। কারণ, হুযুর (আলাইহিস সালাম) হেজাযে বসবাস করছিলেন এবং হেজাযসহ অন্যান্য সব জায়গায় সম্বোধন পদ সম্বলিত তাশাহুদ পাঠ করা হচ্ছিল। সে ব্যাপারে না হুযুর (আলাইহিস সালাম) নিষেধ করেছিলেন, না সাহাবায়ে কেরাম কোন সংশয় প্রকাশ করেছেন। আর হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)ও তাশাহুদের ইবারত শিখানোর সময় একথা বলেননি যে, 'এ তাশাহুদ কেবল আমার পবিত্র ইহকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য; আমার ওফাত শরীফের পর অন্যভাবে তা পাঠ করিও।

'ফত্ওয়ায়ে রশীদিয়াহ' গ্রন্থ প্রথম খণ্ডের কিতাবুল আকায়েদ' এর ১৭ পৃষ্ঠায় আছে-"সুতরাং, সম্বোধন পদ সম্বলিত তাশাহুদের সম্বোধন পদ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এবং এ ব্যাপারে কয়েকজন সাহাবীর অনুসরণও জরুরী নয়। অন্যথায় হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলতেন-"আমার ওফাতের পর আমাকে সম্বোধন করো না।' যে কোন অবস্থায় উক্ত সম্বোধন পদের প্রচলণ রাখাই উত্তম। মূলতঃ সেভাবেই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।"

উত্তরের সারমর্ম হলো, কয়েকজন সাহাবীর এ পরিবর্তনের কাজ দলীল হতে পারে না। অন্যথায় অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হবে যে, হুযুর (আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম) এর পবিত্র যমানায় শিরক হচ্ছিল, কিন্তু তা নিষেধ করা হয়নি। আর পরবর্তীকালে সাহাবীদের কেউ কেউ পরিবর্তন করেছিলেন, সবাই করেননি এ প্রসঙ্গে 'মিরকাত' গ্রন্থের 'তাশাহুদ' শীর্ষক অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদের শেষে বলা হয়েছে-

وَاَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كُنَّا نَقُوْلُ الخ فَهُوَ رِوَايَةُ اَبِيْ عَوَانَةَ وَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ اَصَحُّ فِيْهَا بَيَّنَتْ اَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بَلْ مِنْ فِهْمِ الرَّاوِيْ عَنْهُ وَلَفْظُهَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا سَلَامٌ يَعْنِيْ عَلَي النَّبِيِّ فَقَوْلُهُ قُلْنَا سَلَامٌ يَحْتَمِلُ اَنَّهُ اَرَادَ بِهِ اِسْتَمَرْنَا عَلَي مَاكُنَّا عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ

অর্থাৎঃ ইব্ন মসউদ (রাঃ) যে বলেছেন 'আমরা বলতাম.....সেটি হচ্ছে আবু আওয়ানার রিওয়ায়ত। এ প্রসঙ্গে বুখারীর রিওয়ায়ত অধিকতর বিশুদ্ধ। সেখানে বলা হয়েছে যে, কথাটি ইবন মসউদ (রাঃ) এর উক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা হচ্ছে বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি। ইবন মসউদ (রাঃ) এর বর্ণিত উক্তিটি ছিল এরূপঃ 'যখন হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর ওফাত হয়ে গেল, তখন বলেছিলাম 'সালামুন' অর্থাৎ নবীর প্রতি।' তাঁর এ যে উক্তি 'আমরা বলেছিলাম সালাম, এ উক্তির অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তঃ তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমরা নবীর জীবদ্দশায় যেভাবে পাঠ করতাম। সেভাবে পড়ার রীতি চিরকালের জন্য জারী রাখলাম।

এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম 'তাশাহুদের' ইবারত মোটেই পরিবর্তন করেননি। পরিবর্তনের যে কথাটি বলা হয়েছিল, তা' ছিল হাদীছ

বর্ণনাকারীর নিছক ব্যক্তিগত বোধোদয়, আসল ব্যাপার কিন্তু তা' নয়।

৪। ওহাবী মতাদর্শের কেউ কেউ বলেন যে, নবী কিংবা ওলীকে দূর থেকে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ডাকা যে, তিনি আমার আওয়াজ শুনছেন, 'শিরক'। কেননা, দূরের আওয়াজ শ্রবণ খোদারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য, খোদা ভিন্ন অন্য কারো মধ্যে এ ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করা শিরক। তবে হ্যাঁ, যদি এরূপ ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করা না হয়, তাহলে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' 'ইয়া গাউছ' ইত্যাদি বলা বৈধ, যেমন বায়ুকে সম্বোধন করে বলা হয়ে থাকে "ওহে প্রভাত সমীরণ শুন"। এখানে এরূপ কোন ধারণা করা হয় না যে, বাতাস শুনছে। আজকাল সাধারণ ওহাবী মতাবলম্বীগণ এ অজুহাত খাঁড়া করে থাকেন। 'ফত্ওয়ায়ে রশীদিয়াহ' ইত্যাদি গ্রন্থেও এ কথার জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

উত্তরঃ দূরের আওয়াজ শ্রবণ মোটেই খোদার গুণ নয়। দূর থেকে তো তিনিই শুনেন, যিনি আহবানকারী থেকে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু মহা প্রতিপালক শাহরগের চেয়েও নিকটতর। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ-

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝

আমি তার শাহরগের চেয়েও নিকটতর। আরও বলেছেনঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ

যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দিবেন যে, আমি নিকটে বিরাজমান। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَاتُبْصِرُوْنَ

(আমি এ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাছে তোমাদের চেয়েও অধিকতর নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।) স্পষ্টই বোঝা গেল যে, মহাপ্রতিপালক আল্লাহ নিকটের আওয়াজই শুনেন, তার জন্য প্রতিটি আওয়াজই নিকটের, কারণ তিনি স্বয়ং নিকটেই বিদ্যমান। আর যদি এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, দূরের আওয়াজ শ্রবণ তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাহলেও স্বীকার করতে হয় যে, কাছের আওয়াজ শ্রবণও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই কাছের কাউকে শ্রোতা মনে করে আহবান করা যাবে না, কেননা এতে মুশরিক হয়ে যাবে। তাই সবাইকে বধির মনে করতে হয়।

অধিকন্তু দূরের আওয়াজ শ্রবণ যেমন খোদার গুণ, তেমনি দূরের বস্তু দেখা ও

দূরের ঘ্রাণ পাওয়া খোদার অন্যতম গুণ। 'ইলম গায়ব' ও 'হাযির-নাযিরের' আলোচনায় প্রমাণ করেছি যে, আওলিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দূর ও নিকট এক সমান। তাদের দর্শনেন্দ্রিয় যদি দূরের ও কাছের বস্তুকে একইভাবে দেখতে পায়, তা'হলে তারেদ শ্রবন্দ্রিয়ও দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনলে 'শির্‌ক' হবে কেন? খোদা প্রদত্ত এ গুণ ... তাঁরা লাভ করেছেন। এখন আমি প্রমাণ করছি যে, নবী ও ওলীগণ দূরের আওয়াজ শুনেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) সুদূর কানআনে (লেবানন) বসে হযরত ইউসুফের (আঃ) জামার খুশবু পেয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেনঃ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ আমি হযরত ইউছুফের (আঃ) ঘ্রাণ পাচ্ছি। এখন বলুন, এ শির্‌ক হল কিনা? হযরত উমর (রাঃ) মদীনা পাক থেকে হযরত সারিয়া (রাঃ) কে, যিনি সুদূর নেহাওয়ান্দ নামক স্থানে যুদ্ধরত ছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন, আর হযরত সারিয়া (রাঃ) সে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন (মিশকাত শরীফের 'কারামাত' শীর্ষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে দেখুন।) লক্ষ্য করুন, হযরত ফারুক (রাঃ) এর চোখ দূর থেকে দেখেছে আর হযরত সারিয়া (রাঃ) এর কান দূর থেকে শুনেছে। তাফসীরে রূহুল বয়ান, জালালাইন, মাদারেক ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ সমূহেঃ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ করে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত রূহের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়েছিলেন হে আল্লাহর বান্দাগণ, চলুন। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব রূহ মর্ত্যে আগমন করবে সকলেই সে আওয়াজ শুনেছিল। যেসব রূহ তাঁর ডাকে লব্বাইক (আমি উপস্থিত আছি) বলেছেন, সে সব রূহ অবশ্যই হজ্জ্ব করার গৌরব লাভ করবেন। আর যে সব রূহ সে সময় নিশ্চুপ ছিল, তারা কখনও হজ্জ্ব করতে পারবে না। লক্ষ্য করুন, এখানে শুধু দূর থেকে নয়, বরং ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সবাই হযরত খলীল (আঃ) এর আওয়াজ শুনেছে। এখন ইহা শির্‌ক হল কিনা? অনুরূপ, হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) মহান প্রতিপালকের দরবারে আরজ করছিলেন-হে মওলা, তুমি মৃত্যুকে কিরূপে জীবন দান করবে, তা' আমাকে দেখিয়ে দাও'। তখন আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ আসলো-চারটি পাখীকে যবাই করে এদের মাংসগুলো চারটি পাহাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাওঃ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا এর পর পাখীগুলোকে ডাক, ডাকের সাথেই সেগুলো দৌড়ে এসে যাবে। লক্ষ্য করুন, মৃত পাখীগুলোকে ডাকা হল, পাখীগুলো ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ে এসে গেল, আল্লাহর ওলীগণ কি ওসব প্রাণীর চেয়েও অধম? মৃত প্রাণীগুলো শুনতে পায়, আর আল্লাহর ওলীগণ দূরের আওয়াজ শুনেন না। আজকাল একজন লোক লন্ডনে বসে

টেলিফোনের মাধ্যমে ভারতে অবস্থানরত লোকের সাথে কথা বলতে পারে। সে ভারতীয় লোককে এ বিশ্বাস রেখেই ডাকে যে, ভারতীয় লোকটি উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে তার কথা শুনতে পারে। এর ডাকাটা শির্‌ক কিনা? যদি কোন মুসলমান এ কথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে যে, নাবুয়াতের শক্তি টেলিফোনের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, এবং তাই আম্বিয়ায়ে কিরাম খোদা প্রদত্ত শক্তি বলে প্রত্যেকের আওয়াজ শুনেন, আর এ বিশ্বাসের বলে আল্লাহর রাসুলকে এ বলে আহবান করে-'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আলগিয়াছ' (হে আল্লাহর রাসুল, ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শুনুন ও সাহায্য করুন।) তা'হলে এভাবে ডাকা শির্‌ক হবে কেন? হযরত সুলাইমান (আঃ) একবার এক সফরে যাবার সময় দূর থেকে জঙ্গলস্থিত একটি পিঁপড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। পিঁপড়াদের রানী অন্যান্য পিঁপড়াদের উদ্দেশ্য বলছিলঃ

يَاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ ۝

(ওহে পিঁপড়া সব, তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঢুকে পড়, যাতে হযরত সুলাইমান (আঃ) ও তার লোকজন তাদের অজান্তে অবলীলাক্রমে তোমাদেরকে পদদলিত না করেন (১৯ পারাঃ সুরা নমল) তাফসীরে রূহুল বয়ান ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ সমূহে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে লিখা হয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়ার এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। এখন চিন্তা করুন, একেতঃ পিঁপড়ার আওয়াজ, তাও আবার তিন মাইল দূর থেকে। বলুন, এটা শির্‌ক হল কিনা? মিশকাত শরীফের 'ইছবাতু আযাবিল কবর' শীর্ষক অধ্যায়ে আছে-মৃত ব্যক্তি দাফনের পর কবর থেকে বাহিরের লোকের পদ ধ্বনি শুনতে পায়, যিয়ারত কারীদেরকে দেখে ও চিনতে পারে। এজন্য কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদেরকে সালাম দেয়া চাই। লক্ষ্য করুন, এতটুকু মাটির নিচে থেকে এত ক্ষীণ আওয়াজ শ্রবণ কত দূরের আওয়াজ শুনার সমতূল্য? বলুন, ইহা শির্‌ক হল কিনা? ইলমে গায়ব শীর্ষক আলোচনায় ওলীদের 'ইলম গায়ব' বর্ণনা প্রসঙ্গে 'মিশকাত শরীফের' কিতাবুত দাওয়াত এর একটি হাদীছ আগে উল্লেখ করেছি, যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর ওলীগণ খোদায়ী শক্তিতে দেখেন, শুনেন ও স্পর্শ করেন। যাঁকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দান করেন, তিনি যদি দূর থেকে শুনতে পান, তা' শির্‌ক হবে কেন?

ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিশ্বস্ত, উল্লেখযোগ্য আলেম মওলবী আবদুল হাই সাহেব

লক্ষ্ণৌবী তার 'ফত্ওয়ায়ে আবদুল হাই' গ্রন্থের 'কিতাবুল আকায়িদ' এর ৪৩ পৃষ্ঠায় জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কি বলেছেন, তা শুনুন। প্রশ্নটি ছিল এরূপঃ কোন এক ব্যক্তি বলে যেঃ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (তিনি না জন্ম গ্রহণ করেছে, না কাউকে জন্ম দিয়েছেন) হচ্ছে হুযুরের (আলাইহিস সালাম) শান, আর قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (বলুন, তিনিই আল্লাহ যিনি এক) হচ্ছে হুযুরের (আলাইহিস সালাম) একটি গুণ। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মওলবী আবদুল হাই সাহেব একটি হাদীছের অবতারণা করেছেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) একদা জিজ্ঞেস করেছিলেন-ইয়া রাসুলল্লাহ, চাঁদ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করত, যখন আপনার বয়স ছিল মাত্র ৪০ দিন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান-স্নেহময়ী জননী আমার হাত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রাখছিলেন, এর কষ্টে ফুঁফিয়ে উঠতাম, আর চাঁদ বারণ করত। হযরত আব্বাস (রাঃ) আরয করলেন আপনি তখন ছিলেন ৪০ দিনের শিশু, তাই এ অবস্থা কিরূপে উপলব্ধি করলেন? ইরশাদ করেন-লওহে মাহফুজে কলম চলত, আমি কলম চালনার আওয়াজ শুনতাম অথচ সে সময় আমি ছিলাম মাতৃগর্ভে। আর ফিরিশতাগণ আরশের নিচে তসবীহ পাঠ করতেন, আমি শুনতাম তাঁদের তসবীহের আওয়াজ মাতৃগর্ভ থেকে। এ রিওয়ায়ত থেকে প্রমাণিত হল, হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) শ্রদ্ধেয়া মাতার মাতৃগর্ভ থেকে আরশ-ফরশের সমস্ত আওয়াজ শুনতেন। হাদীছ শরীফে আছে-যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন বেহেশ্ত থেকে হুর স্ত্রীকে ডাক দিয়ে তিরস্কার করে। সুতরাং, জানা গেল যে, ঘরের কুঠরীর অভ্যন্তরে যে বাক বিতণ্ডা চলছে, তা এত দূর থেকেও হুর দেখতে পাচ্ছে ও শুনছে; আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, হুরের এ অদৃশ্য জ্ঞানও আছে যে, সে লোকটির পরিণাম ভাল হবে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূরের বস্তু দেখতে পাই, রেডিও টেলিফোন দ্বারা দূরের আওয়াজ শুনতে পাই। নূরে নাবুয়াত ও বেলায়তের শক্তি কি বিদ্যুত শক্তির চেয়েও দুর্বল? মিরাজের সময় হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বেহেশ্তে হযরত বেলাল (রাঃ) এর পদচারণার আওয়াজ শুনেছিলেন, অথচ সে সময় তো হযরত বেলাল (রাঃ) এর মেরাজ হয়নি, তিনি নিজ ঘরেই ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য তিনি চলাফেরা করছিলেন। আর ওদিকে তার পদচারণার আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। আর যদি হযরত বেলাল (রাঃ) জিসমে মিছালী সহকারে (দুনিয়াবী শরীরের অনুরূপ আকৃতিসম্পন্ন শরীর) বেহেশতে পদার্পণ করে থাকেন, তা'হলে হাযির নাযিরের বিষয়টিও প্রমাণিত হয়।

এসব ব্যাপারে ভিন্নমতবলম্বীগণ একথাই বলবেন যে, আল্লাহ তাদেরকে শুনিয়ে দেন বিধায় তারা শুনেছিলেন। আমরাও তো তাই বলছি-নবী ও ওলীগণকে খোদা দূরের আওয়াজ শুনান, তাই তাঁরা শুনতে পান। খোদা তা'আলার এ শ্রবণ ক্ষমতা সত্ত্বাগত, আর তাদের এ গুণ খোদা প্রদত্ত। খোদার এ গুণ হচ্ছে চিরন্তন, আর তাঁদের এ গুণ অচিরন্তন। খোদার এ গুণ কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, আর ওনাদের এ গুণ খোদার নিয়ন্ত্রণাধীন। খোদা শ্রবণ করেন কান ও অন্য কোন অঙ্গের সাহায্য ব্যতিরেকে আর ওনারা শুনে কান দ্বারা। এ শ্রবণ ক্ষমতার প্রকৃতিতে এতটুকু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'শিরক' হয় কিরূপে? নবীকে সম্বোধন করা প্রসঙ্গে আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট বিধেয় এখানেই সমাপ্ত করা হল।

আল্লাহর ওলী ও নবীগণ থেকে সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গে আলোচনা

আল্লাহর ওলীগণ ও আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ, যদি এ আকীদা পোষণ করা হয় যে, মূলতঃ সাহায্যের উৎস মহান প্রতিপালকই। ওলী ও নবীগণ হচ্ছেন সেই সাহায্যের বিকাশস্থল। মুসলমান এ আকীদাই পোষণ করেন। কোন মূর্খও কোন ওলীকে খোদা মনে করে না। এ আলোচনাকে দু'টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হল।

প্রথম অধ্যায়

(খোদা ভিন্ন অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনার স্বীকৃতিসূচক প্রমাণসমূহ)

খোদা ভিন্ন অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনার স্বীকৃতি সূচক অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় কুরআনী আয়াতসমূহে, বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহে, ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ও হাদীছবেত্তাগণের উক্তিসমূহে, এমনকি স্বয়ং ভিন্নমতাবলম্বীদের উক্তি সমূহেও। এখন এসবের পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

কুরআন করীম ইরশাদ করছেঃ

وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সমস্ত সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা (হে কাফিরগণ) দাবীকৃত বিষয়ে সত্যবাদী হও। এ আয়াতে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে-কুরআনের অনুরূপ একটি 'সুরা' গঠন করে দেখাও, তোমাদের এ কাজে সহায়তাদানের জন্য তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও। দেখুন, খোদা ভিন্ন অন্য কিছু বা অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। কুরআনের অন্যত্র উক্ত হয়েছেঃ

قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, আল্লাহর রাস্তায় আমার সাহায্যকারী কে কে আছ? উত্তরে তাঁর অনুগত 'হাওয়ারী' নামক বিশ্বাসীগণ বলেছিলেন আমরা আল্লাহর ধর্মের সাহায্য করবো। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমার সাহায্যকারী কে কে আছ? সুতরাং, বোঝা যায় যে, তিনি খোদা ভিন্ন অন্যদের সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন। কুরআন আর এক জায়গায় ইরশাদ করছেঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা পরস্পরকে সৎকাজে ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য কর এবং পাপ কাজে ও অহেতুক বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য কর না। এখানে দেখুন, বান্দাগণকে একে অপরের সাহায্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

(যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন।) এখানে স্বয়ং মহান প্রতিপালক, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, নিজ বান্দাদের নিকট সাহায্য চেয়েছেন। আরও লক্ষ্য করুন, মহান প্রভু প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন (ইয়াউমে মীছাক) নবীগণের রূহ থেকে হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেনঃ

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ

আপনারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মেনে নিবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, সেই অঙ্গীকার গ্রহণের দিন থেকে

আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ জারী করা হয়েছে। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেয়া হয়েছে। নামায ও ধৈর্য খোদা ভিন্ন অন্য কিছুইতো। কুরআনের আর এক জায়গায় আছেঃ

وَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ

(আমাকে তোমাদের শক্তি দিয়ে সাহায্য কর।) এ থেকে জানা গেল যে, হযরত যুলকারনাইন লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করার সময় জনগণ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন। মহান প্রতিপালক অন্যত্র ইরশাদ করেছেণঃ

اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

(হে নবী, মহা প্রভু আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুসলমানদের দ্বারা শক্তি যুগিয়েছেন। আরও ইরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে নবী, আপনার জন্য আল্লাহ এবং আপনার অনুসারী মুসলমানগণ যথেষ্ট।) অন্যত্র ইরশাদ করেছেনঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرًا ۝

আল্লাহ তাঁর রাসুলের সহায়ক, হযরত জিব্রাইল (আঃ) ও খোদাভীরু মুসলমানগণ ও এর পরে ফিরিশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। আর এক জায়গায় ইরশাদ করা হয়েছে।-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ۝

হে মুসলমানগণ, তোমাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও সে সব মুসলমান, যারা যাকাত দেয় ও নামায পড়েন। অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করা হয়েছেঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۝

(মুমিন নর-নারীগণ একে অপরের সাহায্যকারী ।) আর এক জায়গায় এরশাদ করা হয়েছেঃ

نَحْنُ اَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاوَفِي الاٰخِرَةِ ۝

আমি/আমরা (আল্লাহ/ফিরিশতা) ইহকালীন জীবনে ও পরকালে তোমাদের সাহায্যকারী। অতএব, জানা যায় যে, মহান প্রতিপালক আমাদের সাহায্যকারী। আবার মুসলমানগণও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী। তবে, মহান প্রতিপালক হচ্ছেন সত্ত্বাগতভাবে সাহায্যকারী, আর অন্যরা হচ্ছেন পরোক্ষভাবে সহায়তাকারী।

হযরত মুসা (আঃ) ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যখন ফিরাউনের কাছে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন তিনি আরয করেছিলেনঃ

وَاجْعَلْ لِّى وَزِيْرًامِّنْ اَهْلِيْ هٰرُوْنَ اَخِى اشْدُدْبِهٖ اَزْرِىْ

হে খোদা, আমার ভাই হারুন (আঃ) কে নবী মনোনীত করে আমার 'ওযীর' নিযুক্ত করে দিন; তাঁর বদৌলতে আমার কোমর মজবুত করে দিন। প্রতিপালক আল্লাহ তখন একথা বলেননি, তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী হচ্ছ, আমি কি যথেষ্ট নই? বরং তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। বোঝা গেল যে, বান্দাগণ যে সাহায্যপ্রার্থী হন, তা' নবীগণের 'সুন্নাত।'

মিশকাত শরীফের باب السجود وفضله শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত রবী'আ ইবনে কা'ব আসলমী থেকে মুসলিম শরীফের রওয়ায়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত আছেঃ হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আমাকে (রবী'আ) বলেনঃ-

سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْغَيْرَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَالِكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশ্‌তে আপনার সঙ্গে থাকার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। এ ছাড়া আরও কিছু তোমার কাম্য আছে কি?" বললাম "না, কেবল এটিই।" ইরশাদ করলেন আত্মসত্ত্বার ঘাড়ে বেশী করে নফল ইবাদতের বোঝা চাপিয়ে আমাকে সহায়তা দান কর।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হযরত রবী'আ (রাঃ) হুযুর (আলাইহিস সালাম)এর কাছে বেহেশ্‌ত লাভের প্রার্থনা করেছেন। হুযুর (আলাইহিস সালাম) একথা বলেননি যে, 'তুমি খোদার কাছে প্রার্থী না হয়ে আমার কাছে বেহেশত তলব করছ; তাই তুমি মুশরিকে গণ্য হয়েছ।' বরঞ্চ বলছেন, 'তোমার প্রার্থনা মন্‌জুর করা হল,

আরও কিছু চাওয়ার থাকলে চেয়ে নাও।' এ ক্ষেত্রে দেখুন, খোদা ভিন্ন অন্যের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) রবী'আ (রাঃ) কে বলেছেন, 'হে রবী'আ, তুমি এ ব্যাপারে আমাকে এতটুকু সাহায্য কর তথা বেশী করে নফল ইবাদত কর। তিনিও খোদা ভিন্ন অপরের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। এ হাদীছের প্রেক্ষাপটে "আশআতুল লমআত" গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ-

واز اطلاق سوال كه فر مود سل وتخصيص نه كرد بمطلوبے خاص معلوم مے شود كه كار همه بدست همت وكرامت اوست هرچه خواهد هر كرا خواهد باذن پر وردگار خود بد هد

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْ مِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

اگر خيريت دنيا وعقبى آرزو دارى
بدرگاهش بياوهر چه مى خواهى تمناكن

অর্থাৎ-প্রার্থিত বস্তুকে বিশেষিত না করে ইরশাদ করা হয়েছে 'চেয়ে নাও'। কোন বিশেষ বস্তু তলব করার কথা বলেননি। এতে বোঝা যায়, সব কিছুই তাঁরই হাতে। তিনি যা' চান এবং যাকে দিতে চান স্বীয় প্রতিপালকের সম্মতিক্রমে দিয়ে দেন। কেননা দুনিয়া ও আখিরাত তাঁর বদান্যতার ফল; আর লওহ ও কলমের জ্ঞানরাশি তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের কিয়দংশ মাত্র। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকামী হলে তাঁর মহান দরবারে আসুন, যা ইচ্ছে চেয়ে নিন।

কা'বা ঘরে তিনশ' ষাটটি প্রতিমা ছিল। সেগুলো তিনশ' বছর থেকে বিদ্যমান ছিল। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) এর বদৌলতে পবিত্র ও মহিমান্বিত হয়েছিল সে কা'বা ঘর। প্রতিপালক আল্লাহ যেন একথাই বলেছিলেন-আমার ঘর কা'বা যখন আমার মাহবুবের সাহায্য ছাড়া পবিত্র হতে পারে না, তোমাদের অন্তরও তাঁর শুভ দৃষ্টি ব্যতীত পবিত্র কালিমামুক্ত হতে পারবে না।

'নুরুল আনওয়ার' গ্রন্থের ভূমিকায় হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আছেঃ- هُوَالْجُوْدُ بِالْكَوْنَيْنِ وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى خَالِقِهَا

দু'জাহান পরিচালনার দায়িত্ব অন্যান্যদেরকে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার দিকে নিবিষ্টচিত্তে মনোনিবেশ করাই হচ্ছে হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, দু'জাহান তিনিই দান করতে পারেন, যিনি হবেন উভয় জাহানের মালিক। সুতরাং, তাঁর মালিকানার স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

শাইখ আবদুল হক (রহঃ) এর এ উক্তি এ বিষয়টির ফায়সালা করে দিল যে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় নিয়ামত সন্তান সন্ততি, ধন-দৌলত বেহেশ্‌ত, নরকাগ্নি থেকে মুক্তি, এমনকি আল্লাহকেও হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর কাছ থেকে চাইতে পারবেন। জনৈক সুফী কবি কি চমৎকার কথাই না বললেনঃ

محمد ازتومی خواهم خدارا"

خدا یا ازتو عشق مصطفی را

ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার কাছে চাচ্ছি খোদাকে। ইয়া আল্লাহ, তোমার কাছে কামনা করছি রাসুলকে পাবার।

হযরত কিবলায়ে আলম মুহাদ্দিছ আলীপুরী (দাঃ বঃ) বলেছেন, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُ وْاللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

এমন লোক, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করেছেন, তারা যদি আপনার মহান দরবারে এসে খোদার কাছে মাগফিরাত কামনা করত, এবং রাসুলও যদি তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতেন, তাহলে তারা আপনার কাছে পেত আল্লাহকে তওবা গ্রহণকারী ও করুণাময়রূপে। আপনার কাছে আসলে তারা খোদাকে পেয়ে যেত। জনৈক কবি সুন্দর কথা বলেছেন এ পংক্তিতে

اللہ کو بھی پایامولٰی تیری گلی میں

অর্থাৎ-হে মওলাঃ আপনার আস্তানায় আল্লাহকেও পেয়েছি। পূর্বোল্লিখিত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'আশআতুল লমআত' গ্রন্থের ভাষ্যের অনুরূপ মিশকাত

শরীফের অপর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাতে' বলা হয়েছে- হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যা'কে যা' দিতে চান, দিয়ে দেন। 'তাফসীরে কবীরে' ৩য় খণ্ডের ৭ম পারার সুরা আনআমের আয়াতঃ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَثَالِثُهَا الْاَنْبِيَاءُ وَهُمُ الَّذِيْنَ اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْمَعَارِفِ مَا لِاَجْلِهٖ يَقْدِرُوْنَ عَلَي التَّصَرُّفِ فِيْ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَاَرْوَاحِهِمْ وَاَيْضًا اَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمُكْنَةِ مَا لِاَجْلِهٖ يَقْدِرُوْنَ عَلَي التَّصَرُّفِ فِيْ ظَوَاهِرِ الْخَلْقِ

এর ৩য় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন নবীগণ, তাঁরা হচ্ছেন সে সব সম্মানিত মহাপুরুষ, যাঁদেরকে মহাপ্রতিপালক আল্লাহ এতটুকু প্রজ্ঞা ও খোদা পরিচিতির জ্ঞান দান করেছেন যে, এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা সৃষ্টিকূলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তাদের রূহ সমূহকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাঁদেরকে এমন কুদরত ও ক্ষমতায় ভূষিত করেছেন যে, এর ফলে সৃষ্টিকূলের বাহ্যিক অবস্থাও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই একই 'তাফসীরে' আয়াতঃ الٓمّٓ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে লিখা আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ কোন বনে-জঙ্গল বিপদে পড়লে যেন বলেঃ

اَعِيْنُوْنِىْ عِبَادَاللّٰهِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ হে আল্লাহর বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে দয়া করবেন। 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' ৬ পারার 'সুরা' মায়েদা'র আয়াত وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা আছে-শাইখ সালাউদ্দিন (রহঃ) বলেছেন, আমাকে প্রতিপালক আল্লাহ এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে, আসমানকে যমীনের উপর ফেলে দিতে পারি; সেই খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ইচ্ছে করলে সারা দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা না করে তাদের সংশোধন ও বিশুদ্ধির জন্য দো'আ করি। সুবিখ্যাত 'মছনবী' শরীফে আছেঃ

اولیاراهست قدر ازاله :- تیر جسته باز گر داندزراه

অর্থাৎ ওলীগণ আল্লাহ থেকে এমন ক্ষমতা লাভ করেছেন, যার ফলে তাঁরা ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর ফিরিয়ে আনতে পারেন।

'আশআতুল লমআত' গ্রন্থে 'যিয়ারাতুল কবুর' শীর্ষক অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছেঃ

امام غزالی گفته هرکه استمداد کرده شود بوے درحیات استمداد کرده می شود بوے بعداز وفات یکے از مشائخ گفته دیدم چهارکس را از مشائخ که تصرف می کنند در قبور خود مانند تسرفها یه ایشان در حیات خودیابیشتر قومےمی گویند که امداد حی قوی تراست ومن مے گویم که امدادمیت قوی تر واو لیاء راتصرف دراکوان حاصل است وان نیست مگرارواح ایشان راو وراح باقی است

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেন, যাঁর কাছ থেকে জীবদ্দশায় সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, আমি চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা তাঁদের কবরে সে একই কাজ বা তার চেয়েও বেশী কাজ করছেন, যা তারা তাঁদের জীবদ্দশায় করতেন। আমাদের এক সম্প্রদায় বলেছেন, জীবিতদের সাহায্য অধিকতর সক্রিয়; আর আমি বলি, মৃতের সাহায্য অধিকতর কার্যকরী। ওলীগণের নিয়ন্ত্রণ সব জগতেই বিদ্যমান। এ ক্ষমতা হচ্ছে তাঁদের রূহসমূহের, রূহসমূহ অবিনশ্বর ও স্থায়ী।" মিশকাত শরীফের 'যিয়ারাতুল কুবুর' শীর্ষক অধ্যায়ের হাশিয়াতে লিখা হয়েছেঃ

وَاَمَّا الاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ فِىْ غَيْرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوِالْاَنْبِيَاءِ فَقَدْ اَنْكَرَهُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ وَاَثْبَتَهُ الْمَشَائِخُ الصُّوْفِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ الاِمَامُ الشَّافِعِىُّ قَبْرُ مُوْسَى الْكَاظِمِ تِرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ لاِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَقَالَ الاِمَامُ الْغَزَّ اِلَى مَنْ يُسْتَمَدُّ فِىْ حَيَاتِهِ يُسْتَمَدُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ

নবী (আলাইহিস সালাম) কিংবা অপরাপর আম্বিয়ায়ে কিরাম ছাড়া অন্যান্য কবরবাসীদের কাছ থেকে দু'আ চাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অনেক ফিকাহ শাস্ত্রবিদ এর স্বীকৃতি দেননি, কিন্তু সুফী মশায়েখ এবং কতিপয় ফিকাহ বিশারদ এ বিষয়টি স্বপ্রমাণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন-মুসা কাযেম (রহঃ) এর কবর দু'আ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিষনাশক অষুধতুল্য, যা বাস্তব অভিজ্ঞতার

আলোকে প্রমাণিত। ইমাম মুহম্মদ গাযযালী (রহঃ) বলেছেন, যার কাছে জীবদ্দশায় সাহায্য চাওয়া যায়, তার থেকে ওফাতের পরেও সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে।' এ ইবারত থেকে জানা গেল যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসালাম) বা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; তবে, আল্লাহর ওলীগণের কবরসমূহ থেকে সাহায্য কামনার ব্যাপারে মতভেদ আছে। স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন উলামা এর স্বীকৃতি দেননি; সুফীয়ায়ে কিরাম ও দিব্যজ্ঞানের অধিকারী ফিক্হবিদগণ তা' জায়েয বলেছেন।

'হিসনে হাসীন' নামক কিতাবের ২০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছেঃ

وَاِنْ اَرَادَعَوْنًا فَلْيَقُلْ يَاعِبَادَاللهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَا عِبَادَاللهِ اَعِيْنُوْنِىْ

কেউ সাহায্যের প্রত্যাশী হলে তার বলা উচিত "হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য করুন।"

উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আল হিরযুছ ছমীন"-এর ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী কারী (রহঃ) উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও বলেছেনঃ

وَاِذَا نَفَلَتَتْ دَابَّةُ اَحَدِ كُمْ بِاَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ يَاعِبَادَ اللهِ اِحْبِسُوْا

যদি অরণ্যে কারো পশু পালিয়ে যায়, তার এ বলে 'আহবান করা উচিত-'হে আল্লাহর বান্দাগণ, একে থামিয়ে দিন।' আল্লাহর বান্দাগণ' বলতে কি বুঝানো হয়, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ

اَلْمُرَادُ بِهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَوِالْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْجِنِّ اَوْرِجَالُ الْغَيْبِ الْمُسَمَّوْنَ بِاَبْدَالٍ

'আল্লাহর বান্দাগণ, বলতে এখানে ফিরিশতা, বা মুসলমান জ্বিন কিংবা 'আবদাল নামে অভিহিত 'রিজালুল গায়বকে বোঝানো হয়েছে। এরপর আরো বলেছেনঃ-

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْمُسَافِرُوْنَ وَاَنَّهُ مُجَرَّبٌ

এ হাদীছটি 'হাদীছে হাসান' এর পর্যায়ভুক্ত (হাদীছ যে 'সহীহ', 'হাসান' ও

'যয়ীফ' এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে 'হাসান' শ্রেণীভুক্ত)। মুসাফিরদের জন্য এ হাদীছটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ হাদীছের সত্যতা পরীক্ষিত।

শাহ আবদুল আযীয সাহেব (রহঃ) তাফসীরে' ফতেহুল আযীরের' ২০ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ

باید فهمید که استعا نت از غیر بوجهے که اعتماد باشد واورا عوان الهی نداند حرام است واگر التفات محض بجانب حق است واورا یکے از مظاهر عون الهی دانسته و بکارخانه اسبابی وحکمت اوتعالی دراں نموده بغیر استعانت ظاهري نماید دور ازعرفان نخواهد بود ودرشرع نیز جائز وروایت وانبیاء واولیاءاین نوع ایتعانت تعبیر کرده اندو ودرحقیقت اینوع استعانت بغیر نیست بلکه استعانت بحضرت حق است لاغیر ،

একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে তাঁর উপর এমনভাবে ভরসা করে সাহায্য ভিক্ষা করা 'হারাম' যেখানে সে ব্যক্তিকে খোদায়ী সাহায্যের প্রতিভুরূপে মনে করা হয় না। আর যদি আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করা হয় এবং সে ব্যক্তিকে আল্লাহর সাহায্যের বিকাশস্থল মনে করে আল্লাহর হিকমত ও কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে তার নিকট বাহ্যিকরূপে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তা'হলে তা খোদা-পরিচিতিমূলক জ্ঞান থেকে দূরে নয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও বৈধ। অপরের কাছ থেকে এ ধরনের সাহায্য ওলী ও নবীগণও চেয়েছেন। মূলতঃ এতে খোদা ভিন্ন অন্য কার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয় না বরং খোদার কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

'তাফসীরে আযীযীতে'তে সুরা 'বকরা'র তাফসীরে ৪৬০ পৃষ্ঠায় শাহ আবদুল আযীয সাহেব বলেনঃ

افعال عادی الهي رامثل بخشیدن فرزند وتوسیع رزق وشفاء مریض وامثال ذلك رامشر کان نسبت به ارواح خبیثه واصنام می نمایند وکافر می شوند از تاثیر الهی یا خواص مخلوقات اومي دانند از ادویه ومقافیر یادعائے صلحاء بندگان اوکه همه از جناب اودر خواسته انجاح مطلب می کنا نند می فهمند در

ایمان ایشان خلل نمی افتد

আল্লাহর সচরাচর কার্যাবলী যেমন-সন্তান দান, রুজি-রোজগার বৃদ্ধিকরণ, রোগীকে রোগ-মুক্তিদান ও এ ধরনের অন্যান্য কার্যাবলীকে মুশরিকগণ দুষ্ট ও পাপী আত্মা ও প্রতিমাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত করে থাকে, যা'র ফলে তারা কাফির বলে গণ্য হয়। আর মুসলমানগণ এসব বিষয়কে খোদার হুকুম বা তাঁর সৃষ্ট জীবের বিশেষত্বের ফলশ্রুতি বলে মনে করেন। যেমন-ওষুধ, গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা ইত্যাদির দ্রব্যগুণ কিংবা তাঁর নেক বান্দাগণের দু'আ। আল্লাহর এ নেক বান্দাগণ মহান প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে জনগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এতে ওসব মুসলিমের ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না।

'বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন' নামক গ্রন্থে শাহ আবদুল আযীয সাহেব (রহঃ) শাইখ আবুল আব্বাস আহমদ যররূক (রহঃ) এর কবিতার এ স্তবকটি উদ্ধৃত করেছেনঃ-

أَنَا لِمُرِيدِي جَامِعٌ لِشَتَاتِهِ – إِذَا مَاسَطَى جَوْرُ الزَّمَانِ بِنَكْبَةٍ
وَإِنْ كُنْتَ فِيْ ضَيْقٍ وَكَرْبٍ وَوَحْشَةٍ – فَنَادِبِيَازَرُّوقُ آتِ بِسُرْعَةٍ

অর্থাৎ শাইখ আহমদ যররূক (রহঃ) বলেছেন, আমার মুরীদ যখন যুগসন্ধিক্ষণে বা যুগের আবর্তন-বিবর্তনের ফলে বিবিধ-বিপদাপদ ও দুর্যোগের শিকার হয়, আমি তাঁর অস্থির চিত্ততা, ব্যাকুলতা, আশা নিরাশার মধ্যে তাঁর দোদুল্যমানতা ইত্যাদি দূরীভূত করি। তাঁর মুরীদগণের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেছেন, তুমি যদি আর্থিক দৈন্য-দশার শিকার হও, কোন দুর্যোগে পতিত হও বা কোন ভয় ভীতির সম্মুখীন হও, তখনই 'ইয়া যররূফ', বলে আমাকে ডাকিও, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার সাহায্যার্থে উপস্থিত হয়ে যাব।

তাফসীরে 'কবীর' রূহুল বয়ান' ও খাযেনে' সুরা ইউসুফের' আয়াতঃ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ প্রসঙ্গে লিখা হয়েছেঃ

اَلاِسْتِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِى دَفْعِ الضَّرَرِ وَالظُّلْمِ جَائِزَةٌ

অর্থাৎ জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য মানুষের সাহায্য প্রার্থী হওয়া বৈধ।

তাফসীরে 'খাযেনে' আয়াতঃ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطٰنُ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالْخَلْوْقِ فِىْ دَفْعِ الضَّرَرِ جَائِزٌ

বিপদাপদ দূরীকরণার্থে সৃষ্টজীবের সাহায্য প্রার্থনা বৈধ। সুপ্রসিদ্ধ 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের ৩য় খন্ডে 'বাবুল লুকাত' শীর্ষক অধ্যায়ের শেষে হারানো জিনিষ অনসুন্ধানের একটি পন্থার কথা উল্লেখিত হয়েছেঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ اِذَاضَاعَ لَهُ شَيْءٌ وَّاَرَادَ اَنْ يَّرُدَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلْيَقِفْ عَلٰى مَكَانٍ عَالٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيَقْرَءُ الْفَاتِحَةَ وَيُهْدِىْ ثَوَابَهَا لِلنَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُهْدِيْ ثَوَابَهَا لِسَيِّدِىْ اَحْمَدَ ابْنِ عَلْوَانٍ يَقُوْلُ يَاسَيِّدِىْ يَااَحْمَدُ ابْنَ عَلْوَانَ اِنْ لَّمْ تَرُدَّعَلَيَّ ضَالَّتِىْ وَالْاَنْزَعْتُكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَوْلِيَاءِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَرُدُّ ضَالَّتَهُ بِبَرْكَتِهِ

কারো কোন জিনিস হারানো গেলে সে যদি এ প্রত্যাশা করে যে, খোদা তা'আলা তার হারানো বস্তুটি ফিরিয়ে দিক, তাহলে তার উচিত কোন উঁচু জায়গায় গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। তথায় সুরা ফাতিহা পাঠ করে তার ছওয়াব নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে ও পরে আমার মাননীয় শাইখ আহমদ ইবন আলওয়ান (রহঃ) কে হাদিয়া স্বরূপ দান করে এ দু'আটি পাঠ করতে হবেঃ

يَاسَيِّدِىْ يَا اَحْمَدُ ابْنَ عَلْوَانَ اِنْ لَّمْ تَرُدَّ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ وَالْاَنْزَعْتُكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَوْلِيَاءِ.

"হে আমার মওলা, হে আহমদ বিন আলওয়ান, আপনি যদি আমার হারানো বস্তুটি ফিরিয়ে না দেন, তাহলে ওলীগণের দপ্তর থেকে আপনার নাম বাদ দিয়ে দেব।" এরূপ বললে খোদা তা'আলা তাঁর (উক্ত ওলী) বরকতে হারানো বস্তুটি ফিরিয়ে দিবেন।

দেখুন, এ দু'আর মধ্যে সৈয়দ আহমদ ইবন আলওয়ান (রহঃ) কে আহবান করা হয়েছে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে হয়েছে, তাঁর থেকে হারানো জিনিসটি তলব করা হয়েছে। আর এ দু'আটির কথা কে বলেছেন? এ দু'আটি শিখাচ্ছেন হানাফীদের শ্রেষ্ঠ ফিকাহ বিশারদ সুবিখ্যাত দুররুল মুখতার' গ্রন্থের রচয়িতা।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) 'কসীদায়ে নু'মান' এ হুযুর (আলাইহিস

সালাতু ওয়াস সালাম) কে লক্ষ্য করে বিনীত প্রার্থনা জানিয়েছেনঃ

يَااَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَاكَنْزَ الْوَرٰي
جُدْلِىْ بِجُوْدِكَ وَاَرْضِنِىْ بِرِضَاكَ
اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ
لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ-'ওহে জ্বীন ও মানবজাতির সর্বাধিক সম্মানিত ও দয়াবান সত্ত্বা, ওহে খোদার নেয়ামত সমূহের ভাণ্ডার, আল্লাহ আপনাকে যে নিয়ামতের বিশাল ভাণ্ডার দান করেছেন, সেখান থেকে দয়া করে আমাকেও কিছু দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সন্তুষ্ট করেছেন। আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করুন। আপনার দান ও করুণার প্রত্যাশী হয়েছি। এ আবু হানীফার জন্য সৃষ্টি জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।' এখানে দেখুন, স্পষ্টতঃ হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর সাহায্যের জন্য বিনীত আবেদন করা হয়েছে। 'কসীদায়ে বুরদা'য় আছেঃ-

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ اَلُوْذُبِهِ
سِوَاكَ عِنْدَحُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

অর্থাৎ-হে সৃষ্টিকূলের সর্বোত্তম সত্ত্বা! আপনি ছাড়া আমার এমন কেউ নেই, যাঁর শরণাপন্ন হতে পারি সর্বব্যাপী বিপদাপদ অবতীর্ণ হবার সময়।

খ্যাতনামা উলামা, ফিকাহ বিশারদ ও মাশাইখের উক্তি সমূহ, যেখানে তাঁরা হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করেছেন, সবগুলো একত্রিত করতে একটি দপ্তরের প্রয়োজন। সুতরাং, এতটুকুই যথেষ্ট বিধায় এখানেই শেষ করছি।

এছাড়া 'কবরসমূহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ' শীর্ষক আলোচনায় 'ফত্ওয়ায়ে শামীর ইবারত উদ্ধৃত কবর, যেখানে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, "যখন আমি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতাম, তখনই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযারে চলে যেতাম; তাঁর রবরকতেই আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেত।" 'নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফি তরজুমাতে সাইয়েদীশ শরীফ আবদিল কাদির" নামক গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী (রহঃ) হুযুর গাউছে আযম (রাঃ) এর একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেনঃ

مَنِ اسْتَغَاثَ بِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِىْ بِاسْمِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ اِلَى اللّٰهِ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ

অর্থাৎ-যে কেউ দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়ে আমার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে, তার দুঃখ দুর্দশা লাঘব হয়ে যাবে; যে কেউ দৈন্য-দশার টানা পোড়নে পড়ে রাহুগ্রস্থ হবে, সে যদি আমার নাম ধরে আমাকে ডাকে, তাহলে তার দুরবস্থা দূরীভূত হয়ে যাবে; আর যে কেউ আমার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইবে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সেই জায়গায় আরো উল্লেখিত আছেঃ হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) 'নামাযে গাউছিয়াহ' পড়ার এ নিয়ম বর্ণনা করেছেন, দু'রাকাত নফল পড়বে, প্রতি রকআতে ১১ বার 'সুরা ইখলাস' পাঠ করবে। সালাম ফিরিয়ে ১১ বার সালাত ও সালাম পাঠ করবে। এর পর বাগদাদের দিকে (উত্তর দিক) বার কদম চলতে থাকবে এবং প্রতি পদে আমার নাম উচ্চারণ পূর্বক স্বীয় মকছুদের কথা ব্যক্ত করবে; আর দু'চরণ বিশিষ্ট এ কবিতার স্তবকটি আবৃত্তি করবেঃ

اَيُدْرِكُنِىْ ضَيْمٌ وَاَنْتَ ذَخِيْرَتِىْ
وَاُظْلَمُ فِى الدُّنْيَا وَاَنْتَ نَصِيْرِىْ
وَعَارٌ عَلٰى حَامِىْ الْحِمٰى وَهُوَ مُنْجِدِىْ
اِذَا ضَاعَ فِى الْبَيْدَاءِ عِقَالُ بَعِيْرِىْ

(আপনি বিশাল ভাণ্ডারের মালিক হয়েও আমি কি দুর্দশাগ্রস্ত হব? আপনার মত সাহায্যকারী থাকতে আমি কি পৃথিবীতে নিগৃহীত হব? চারণভূমির রক্ষক যদি আমার সাহায্যকারী হয়, তথায় বিচরণকারী আমার উটের রসিও যদি খোয়া যায়, তা'হলে সেই চারণ ক্ষেত্রের রক্ষকের জন্য যে এটি লজ্জার বিষয়, তা' বলাই বাহুল্য।) এ নিয়ম বর্ণনা করার পর মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেছেনঃ এ আমলটি বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করে উক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।

দেখুন, হুযুর গাউছে পাক মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন-দুর্দশাগ্রস্থ হলে আমার সাহায্য প্রার্থনা কর। আর হানাফীদের বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য আলিম মোল্লা আলী কারী (রহঃ) উক্ত বক্তব্য খণ্ডন না করে হুবহু উদ্ধৃত করে বলছেন অভিজ্ঞতার আলোকে এর সত্যতা যাচাই করে দেখা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল-বুজর্গদের কাছ থেকে তাঁদের ওফাতের পরেও সাহায্য চাওয়া জায়েয ও ফলপ্রসূ।

এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করার স্বপক্ষে কুরআনী আয়াত, হাদীছ ও খ্যাতনামা ফিকাহবিদ, উলামা ও মাশায়েখের উক্তি সমূহ থেকে

প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি। এখন খোদ ভিন্নমতাবলম্বীদের মাননীয় আলিমদের বক্তব্যসমূহ থেকেও প্রমাণাদি উপস্থাপন করছি।

দেওবন্দীদের শায়খুল হিন্দ মওলবী মাহমুদুল হাসান সাহেব স্বীয় তরজুমায়ে কুরআনে' اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয়াত এর প্রেক্ষাপটে বলেছেনঃ "হ্যা, যদি কোন প্রিয় বান্দাকে রহমতে ইলাহীর মাধ্যম মনে করে, তাঁকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সত্ত্বাগতভাবে সাহায্যকারী জ্ঞান না করে তাঁর কাছ থেকে বাহ্যিক সাহায্য ভিক্ষা করা হয়, তাহলে তা বৈধ। কেননা তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া· মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার নামান্তর।" এ বক্তব্য যা ফায়সালা করে দিল তা'ই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। কোন মুসলমান কোন ওলী বা নবীকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র জ্ঞান করেনা, কেবল মাধ্যম বলেই বিশ্বাস করে।

'ফত্ওয়ায়ে রশীদিয়াহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় 'কিতাবুল খত্রে ওয়াল ইবাহাতে' শীর্ষক আলোচনায় আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর লিপিবদ্ধ আছে।

প্রশ্নঃ কোন কোন কবিতায় আছে-

یارسول کبر یافریادهے
یامحمد مصطفیٰ فریاد هے
مدد کر بهرخدا حضرت محمد مصطفیٰ
میرے تم سے هر گهر ی فریاد هے

(ওহে রাসুলে কিবরিয়া, আপনার কাছে আমার ফরিয়াদ আছে। হে মুহাম্মদ মুস্তফা, আমার ফরিয়াদ আছে। হে হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা,আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। আপনার কাছে প্রতিনিয়ত আছে আমার ফরিয়াদ।) এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাসমূহ পাঠ করা প্রসঙ্গে আপনার মত কি?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (রসুল) এ বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করবেন এ ধারণার বশবর্তী হয়ে এককভাবে মনে মনে কিংবা প্রকাশ্যে এ ধরনের শব্দাবলী সম্বলিত কবিতা পাঠ করা বা কোনরূপ ধারণা ব্যতিরেকে কেবল আন্তরিক মহব্বত সহকারে এ ধরনের শব্দাবলী উচ্চারণ করা বৈধ।

উক্ত 'ফত্ওয়ায়ে রশীদিয়ার ৩য় খণ্ডের ৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছেঃ জনৈক ব্যক্তি মওলবী রশীদ আহমদ সাহেবের কাছে এ প্রশ্নটি রেখেছিলেন-একটি কবিতায়

আছেঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُنْظُرْ حَالَنَا :- يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْمَعْ قَالَنَا
اِنَّنِىْ فِى بَحْرِهَمٍّ مُغْرَقٌ :- خُذْبِيَدِىْ سَهِّلْ لَنَا اَشْكَالَنَا

অর্থাৎঃ-ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন; ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের আবেদন শুনুন। আমি দুঃচিন্তা, দুর্ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি, আমার হাত ধরুন আমাদের জটিল সমস্যাদি সহজ করে দিন। কিংবা 'কছীদায়ে বুর্দায় আছেঃ

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِيْ مِنْ اَلُوْذُبِهٖ
سِوَاكَ عِنْدَحُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

অর্থঃ-ওহে সৃষ্টিজীবের সর্বাধিক সম্মানিত ও করুণাময় সত্তা, ব্যাপক আকারে সংকট ও বিপদাপদ অবতীর্ণ হবার সময় আমার এমন কেউ নেই, যা'র নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারি।

এসব চরণগুলো জপ করা বা 'ওযীফা' হিসাবে পাঠ করা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে মওলবী রশীদ আহমদ বলেছেন এসব শব্দাবলী গদ্যাকারে বা পদ্যাকারে জপ করা 'মকরূহ তনযীহী', কুফর কিংবা কবীরা গুনাহ নয়। (মকরূহ তানযীহী হচ্ছে, যে সব কাজ করা শরীয়তের পছন্দনীয় নয়, কিন্তু করলে পরে কোন শাস্তি হবে না।) এ দু'টি ইবারতে হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাকে কুফর ও শিরক বলে অভিহিত করা হয়নি, খুব বেশী হলে 'মকরূহ তানযীহী বলা হয়েছে, যা অনেকটা বৈধতার কাছাকাছি বা বৈধ বললেই চলে।

'কছায়েদে কাসেমী'তে ভিন্ন মতাবলম্বীদের মহামাননীয় আলেম মওলবী কাসেম সাহেব বলেছেনঃ-

مدد کرای کرم احمدی کہ تیری سوا
نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئ حامی کار

অর্থঃ-ওহে করুণাময় আহমদ, আমাকে সাহায্য করুন। আপনি ছাড়া এ সহায় ও সম্বলহীন কাসেমের আর কোন সাহায্যকারী নেই। এখানে লক্ষ্য করুন, তিনি হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন, আরয করছেন-আপনি ছাড়া আমার আর কোন সহায়ক নেই। অর্থাৎ-খোদাকেও ভুলে গেছেন তিনি। উর্দু ভাষায়

অনূদিত 'সিরাতে মুস্তাকীম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৩য় উপকারী বিষয়ের' বর্ণনায় মওলবী ইসমাইল সাহেব (ভারতে ভিন্নমত প্রচার ও প্রসারের অগ্রদূত) বলেন-"এরূপ উচ্চ মরতবা সম্পন্ন ও উচ্চ পদস্থ বুযুর্গগণ অদৃশ্যসূক্ষ্ম জগত (আলেম মিছাল যেখানে এ জগতের দৃশ্যমান সবকিছুরনমুনা আছে) ও দৃশ্যমান জগতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অবাধ এখতিয়ার ও অনুমতি প্রাপ্ত হন।"

ভিন্ন মতাবলম্বী অনেক আলেমের পীর হাজী ইমদাদুল্লা সাহেব বলেছেনঃ-

جہاز امت کا حق نے کردیا ہے آپکے ہاتھوں
تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یارسول الله"

অর্থঃ-ইয়া রাসুলাল্লাহ! উম্মতের জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ভার আল্লাহ তা'আলা আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আপনি ইচ্ছা করলে সেটি ডুবিয়ে দিতে পারেন, কিংবা রক্ষাও করতে পারেন। 'ফত্ওয়ায়ে রশীদিয়া' ১ম খণ্ডে 'কিতাবুল বিদআত' শীর্ষক আলোচনার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে, কোন কোন রিওয়ায়াতে যে বলা হয়েছেঃ- হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য করুন, এতে আসলে কোন মৃতব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার কথা বলা হয়নি, বরং যেসব আল্লাহর বান্দা বিজন বনে বিদ্যমান আছেন,তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহতা'আলা তাঁদেরকে সে সব কাজের জন্যই সেখানে নিযুক্ত করেছেন।

এ ইবারত থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহর কিছুসংখ্যক বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে বন-জঙ্গলে নিয়োজিত থাকেন, যাতে তাঁরা মানুষের সাহায্য ও উপকার করতে পারেন। তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ। এখন বাকী রইল এ কথার ফয়সালা করা-নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহায্য করতে পারেন কিনা? এ প্রসঙ্গে অনেক কিছু উপস্থাপন করেছি এবং সামনে যুক্তি নির্ভর প্রমাণাদির বর্ণনায়ও এর বিশদ আলোচনা করব। মওলবী মাহমুদুল হাসান সাহেব 'আদিল্লায়ে কামিলাহ' নামক গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ 'আসলে খোদার পরে এ বিশ্বের মালিক হচ্ছেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। জড় পদার্থ হোক বা প্রাণীকূল, মানব জাতি হোক বা অন্য কোন জাতি হোক, মোট কথা সবকিছুর মালিক তিনিই। এ কারণেই তো তাঁর স্ত্রীগণের সহিত সহাবস্থানের ব্যাপারে ন্যায়নুগ আচরণ ও তাঁদের মুহরানা আদায় তাঁর উপর অত্যাবশ্যকীয় বা ওয়াজিব ছিল না।" "সিরাতে মুস্তাকীম" গ্রন্থের '২য় হিদায়েত' এর '১ম ইফাদাহ' এর ৬০ পৃষ্ঠায়

মওলবী ইসমাইল সাহেব বলেছেন, হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) এর ফযীলত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর তুলনায় এক দিক দিয়ে বেশী প্রমাণিত। ফযীলতের এ আধিক্যের কারণ হচ্ছে, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য এবং বেলায়তের স্তরসমূহ এবং কুতবিয়াত, গাউছিয়াত ও আবদালিয়ত এবং এ জাতীয় অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড তাঁর সময়কাল থেকে পৃথিবীর সমাপ্তিলগ্ন পর্যন্ত তাঁরই মাধ্যমে সম্পন্ন হয় ও হতে থাকবে। আর রাজা-বাদশাগণের বাদশাহী ও শাসকবর্গের শাসনেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, যা' 'আলমে মালাকুত' বা ফিরিশতা জগতে ভ্রমণকারীদের কাছে গোপন নয়।"

এ ইবারত থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, অন্যান্য লোকগণ বাদশাহী, আমিরী, বেলায়াত ও গাউছিয়ত হযরত আলী (রাঃ) থেকে লাভ করেন।

দেওবন্দীদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব স্বীয় গ্রন্থ 'যিয়াউল কুলুব' এ লিখেছেনঃ

'এ স্তরে উপনীত হয়ে বান্দা খোদার প্রতিনিধিরূপে খোদার পথের যাত্রীদের ঐস্তরে পৌছান এবং বাহ্যিকরূপে বান্দা থাকলেও বাতেনী জগতে খোদা হয়ে যান। একেই বলা হয় 'বরযখ্'। এখানে অপরিহার্যতা ও সম্ভাবনা এক সমান-একটির উপরে অন্যটির প্রাধান্য নেই। এস্তরে পৌছে আরেফ (খোদার পরিচয় প্রাপ্ত) জগত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী হয়ে যান। (যিয়াউল কুলুম গ্রন্থঃ (দেওবন্দের রাশেদ কোম্পানীর আশরাফিয়া কুতুব খানা কর্তৃক মুদ্রিত)-২৯ পৃষ্ঠায় 'মরাতেব কা বয়ান' শীর্ষক বর্ণনা দেখুন।

বিঃ দ্রঃ এখানে যে 'অপরিহার্যতা ও সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে এ গুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। আল্লাহকেই বলা হয় 'ওয়াজিবুল উযুদ' অর্থাৎ তার অস্তিত্ব একান্ত অপরহির্য। আর আল্লাহ ছাড়া সমগ্র সৃষ্টি জগতকে 'মুমকিনুল উযুদ' নামে অভিহিত করা হয় অর্থাৎ এর অস্তিত্ব সম্ভবপর, অপরিহার্য নয়। সুতরাং, 'অপরিহার্য' ও সম্ভাবনা কথা দু'টি যথাক্রমে খোদার ও মাখলুকের অস্তিত্বের প্রকৃতি নির্ণয় করে।

সুধী পাঠকবৃন্দ,এখন গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, পীর সাহেব বান্দাকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে খোদা মেনে নিয়েছেন এবং সেই বান্দাকে জগৎ পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে তৎপর বলে স্বীকার করেছেন।

১৯৬১ ইংরেজী সনের ৯ই জুলাই, রবিবার রাওয়াল পিণ্ডির 'জংগ' পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়-পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইয়ুব খান সাহেব

আমেরিকা সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছেন। তখন মৌলানা ইহতেশামুল হক সাহেব দেওবন্দী প্রেসিডেন্টের বাহুতে 'ইমাম যামেন' বেঁধে দেন। ১০ই জুলাই, ১৯৬১ সোমবারের 'জংগ' পত্রিকায় মৌলানার ছবিও ফলাও করে ছাপানো হয়। ছবিতে তাকে প্রেসিডেন্টের বাহুতে-'ইমাম যামেন' বাঁধতে দেখা যায়। 'ইমাম যামেন' কি, হয়ত বুঝতে পারেন নি। 'ইমাম যামেন' হচ্ছে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর নামাঙ্কিত মুদ্রা (রুপিয়া) যা' ভ্রমণকারীর বাহুতে এ উদ্দেশ্যেই বেঁধে দেওয়া হয় যে, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তার জিম্মাদার হবেন। অর্থাৎ ইমামের জিম্মাদারীতে ভ্রমণকারীকে অর্পণ করা হয়। ভ্রমণকারী যখন সফর থেকে নিরাপদে ফিরে আসে, তখন ঐ টাকার ফাতিহাখানী করা হয়। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর নামে, যাঁর জিম্মাদারীতে এ ভ্রমণকারীকে অর্পণ করা হয়েছিল। এবার দেখুন, এখানে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর সাহায্যও নেয়া হল; জনাব প্রেসিডেন্টকে তাঁর জিম্মদারীতে অর্পণ করা হল। সুবহানাল্লাহ! কেমন ঈমান উদ্দীপক কাজ! খোদার শুকরিয়া যে, দেওবন্দীগণও এর সমর্থক হয়ে গেছে।

মওলবী আশরাফ আলী সাহেব রচিত 'ইমদাদুল ফত্ওয়া' নামক গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের 'কিতাবুল আকায়েদে ওয়াল কালাম' শীর্ষক আলোচনার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছেঃ "খোদা ভিন্ন অপরের থেকে যে সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া হয়, তা' যদি এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চাওয়া হয় যে, যাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সত্ত্বাগত জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী, তাহলে এটি 'শির্ক'। আর যদি তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রদত্ত বিশ্বাস করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়,তা' হলে তাঁর সাহায্য প্রার্থী হওয়া জায়েয। যাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে তিনি জীবিত হোক বা ওফাত প্রাপ্ত, তাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং তিনি ফায়সালা করে দিলেন যে, সৃষ্ট জীবকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সত্বাগত ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস না করলে তার কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করা জায়েয, যদিও ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে সাহায্য ভিক্ষা করা হয়। আমরাও তাই বলছি।

সে একই মওলবী সাহেব তার রচিত কিতাব 'নশরুত তীব' এর শেষে 'শমীমুল হাবীব' নামক কাব্য গ্রন্থের আরবী কবিতার উর্দু অনুবাদ করেছেন এবং অনূদিত অংশের নামকরণ করেছেন 'শম্মুত তীব'। সেখানে তিনি বিনা দ্বিধায় হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। সেই আরবী কবিতার চরণগুলি ও সাথে সাথে উর্দুতে পদ্যাকারে অনূদিত চরণগুলিও এখানে উল্লেখিত হল।

يَا شَفِيْعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِىْ :- اَنْتَ فِى الْاِضْطِرَا رِ مُعْتَمِدِىْ

دستگیری کیجے میری نبی ‌- کشمکش میں تم ہی ہو میری ولی

لَيْسَ لِىْ مَلْجَا سِوَاكَ اَنْتَ مُسْتَنَدِىْ اَلضُّرُّ مُحْتَسِبِىْ سَنَدِىْ

جز تمهاری هے کهاں میری پناه :- فوج کلفت مجه په اغالب هوئ

غَشَّنِى الدَّهْرُ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ :- كُنْ مُغِيْثًا فَاَنْتَ لِىْ مَدَدِىْ

ابن عبدالله زمانه هے خلاف :- ای میرے مولی خبر لیجے میری

نام احمد چوں حصینے شد حصینی :- پس چه باشد ذات آں روح الایمن

(نشر الطیب فی ذکر الحبیب)

বঙ্গানুবাদঃ নবী হে আমার, আমার হাত ধরে রক্ষা করুন। আশা-নিরাশার দোদুল্যমান অবস্থায় যখন কিং কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি, সে সময় আপনিই আমার অভিভাবক ও সাহায্যকারী, আপনার আশ্রয় ছাড়া আমি কার আশ্রয় নিব। আশ্রয় দিন। সংকট, দুঃখ-দুর্দশার সৈন্য-সামন্ত আমাকে পরাভূত করে দিয়েছে। ওগো ইব্‌ন আবদুল্লাহ, কালের বিবর্তন চলছে আমার প্রতিকূলে, হে আমার মওলা, আমার খবর নিন।

হযরত আহমদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র নাম যেখানে সুরক্ষিত দুর্গের মত রক্ষাকারী হতে পারে, স্বয়ং সেই পবিত্র সত্ত্বার ক্ষমতা কতটুকু তা' প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহর ওলীগণ থেকে সাহায্য প্রার্থনার স্বীকৃতি সূচক যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদি

মর্ত্যজগত হচ্ছে পরকালের নমুনা। এখানকার কাজ কারবার থেকে ঐ জগতের কাজ কারবার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এ জন্যই কুরআন করীম কিয়ামত, পুনরুত্থান ও মহা প্রতিপালকের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিষয়কে পার্থিব দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা প্রমাণ করছে। যেমন-কুরআন বলছে, শুকনা ভূমিতে বারিপাত হলে, তা' পুনরায় শস্য-শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত হয়। এভাবে নিষ্প্রাণ দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করা হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে, তোমরা বরদাশত করবে না যে, ক্রীতদাসদের উপর তোমাদের মালিকানায় অন্য কেউ অংশীদার হোক; এমতাবস্থায় আমার সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিমা ইত্যাদিকে অংশীদাররূপে স্বীকার করছ কেন? এক কথায় বলতে গেলে, এ দুনিয়া হচ্ছে পরকালের নমুনা। এখানে

দেখতে পাচ্ছেন, রাজা-বাদশাহ প্রত্যেকটি কাজ নিজ হাতে করেন না, বরং রাজ্য পরিচালনার জন্য যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করেন, প্রত্যেক বিভাগে বিভিন্ন স্তর ও গুণের অধিকারী লোক নিয়োগ করেন, কাউকে অফিসার আবার কাউকে তার অধীনস্থ হিসেবে নিযুক্ত করেন। আবার ওই সব বিভাগের উপর কর্তৃত্বকারী বা সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসেবে প্রধান মন্ত্রীকে নির্বাচিত করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে বাদশাহের মর্জি মাফিক সব কাজই সম্পন্ন করা হয়, সরাসরি বাদশাহ নিজে করেন না। এর কারণ এ নয় যে, বাদশাহ বাধ্য হয়ে কিংবা অপারগতা বশতঃ সব কাজের জন্য কর্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত করেন। বাদশাহ নিজে পানি পান করতে পারেন, নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কাজ নিজেই সমাধান করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা ও প্রতাপের সাথে মানানসই আচরণ হচ্ছে প্রত্যেক কাজ সেবকদের দ্বারা সম্পন্ন করা। প্রজা সাধারণকে নির্দেশ দেয়া হয়-তারা যেন তাদের প্রয়োজনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শরণাপন্ন হয়। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসালয়ে গিয়ে ডাক্তারকে বলুন, মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে কোর্টে গিয়ে উকিলের মাধ্যমে জজকে বলুন ইত্যাদি। এসব সংকটের সময় প্রজাগণের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে যাওয়া বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচায়ক নয়, বরং তাঁরই মর্জি এতে প্রতিফলিত হয়; তিনিই তো সব কাজের জন্য ওনাদেরকে নিযুক্ত করেছেন। তবে হ্যাঁ, প্রজাগণ যদি অন্য কাউকে বাদশাহ মনোনীত করে তার সাহায্য প্রার্থী হয়; তাহলে তারা বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ তারা বাদশাহের মনোনীত কর্মচারীদের বাদ দিয়ে অন্যকে নিজেদের প্রশাসকরূপে মেনে নিচ্ছে। এসব কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। তাহলে এবার বুঝে নিন যে, আল্লাহর বাদশাহীরও পদ্ধতিগত নিয়ম এরূপ। তিনি ছোট বড় যাবতীয় কাজ নিজ ক্ষমতা বলে নিজেই সম্পন্ন করতে পারেন, কিন্তু তা' করেন না। বরং জগতের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ফিরিশতা ইত্যাদিকে নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁদের হাতে পৃথক পৃথক বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। প্রাণহরণকারী ফিরিশতাদের একটি বিভাগ রয়েছে, যাঁর প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন হযরত আযরাইল (আঃ)। অনুরূপ মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ, রুজি-রোজগার বণ্টন, বৃষ্টিবর্ষণ, মাতৃগর্ভে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন, তকদীরের লিখন, দাফনকৃত মৃতদের পরীক্ষা গ্রহণ, শিঙ্গা ফুঁকে মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করন, কিয়ামত বা সবাইকে একত্রিকরণ, তারপর কিয়ামতে বেহেশত--দোযখের ব্যবস্থাপনা মোট কথা দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কাজকর্ম ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। এভাবে তাঁর প্রিয়

বান্দাদের হাতেও জগতের ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করেছেন। তাঁদেরকে বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বাধিকার প্রধান করেছেন। তাসাউফের কিতাব পাঠ করলে জানা যায় আল্লাহর ওলীদের কয়টি স্তর আছে এবং কার দায়িত্বে কোন্ কোন্ ধরনের কাজ রয়েছে। এ দায়িত্ব বন্টনের কারণ এ নয় যে, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা উনাদের মুখাপেক্ষী। বরং জগত পরিচালনায় নির্ধারিত বিধি-বিধানের চাহিদা হচ্ছে তাই। এ জন্যই তো তাঁদেরকে বিশেষত্বমূলক ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন, যদ্দুরুন তাঁরা বলে থাকেন, 'আমরা এ কাজ করতে পারি'। এ কথাগুলো শুধু যে আমার তুলনামূলক ধারণা প্রসূত, তা নয় বরং কুরআন-হাদীছই এর যথার্থ সাক্ষী। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মরয়ম (আঃ) কে বলে ছিলেনঃ-

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

ওহে মরিয়ম, আমি তোমারই প্রতিপালকের বার্তাবাহক; তোমাকে একটি পবিত্র সু-সন্তান দান করার জন্য এসেছি। একথা থেকে বোঝা গেল যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সন্তান দান করেন। হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ-

وَاَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ

আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে পাখীর আকৃতি সর্বস্ব বস্তু তৈরী করে তাতে ফুঁক দিই, অমনি তা খোদার হুকুমে পাখী হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ঈসা (আঃ) খোদার হুকুমে নিষ্প্রাণকে প্রাণ দান করেন। কুরআনের বলা হয়েছে-

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ

আপনি বলে দিন যে, মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, যা'কে তোমাদের এ কাজের জন্য ভার দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হযরত আযরাঈল (আঃ) প্রাণীদেরকে নিষ্প্রাণ করেন। এ রকম আরও অনেক আয়াত পাওয়া যাবে, যেখানে আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলীতে বান্দাদেরকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। মহা প্রভু আল্লাহ হুযুর (আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম) এর শান-মান প্রকাশার্থে বলেছেনঃ-

وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

আমার মাহবুব তাঁদেরকে পবিত্র করেন এবং তাঁদেরকে কিতাব ও হিকমত

শিখান। কুরআনে অন্যত্র আছেঃ- اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ

আল্লাহ ও রসুল অনুগ্রহ করে তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন। সুতরাং, বোঝা গেল যে, হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সব ধরনের অপবিত্রতা দূরীভূত করে উম্মতকে পুত পবিত্র করে দেন, আর নিঃস্ব দারিদ্র্য পীড়িত লোকদেরকে ঐশ্বর্যশালী করেন। আরও বলা হয়েছেঃ-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা উসুল করুন এবং এ কাজের দ্বারা তাদেরকে পুত পবিত্র করে দিন। এ থেকে জানা গেল যে, খোদার কাছে সে আমলই গৃহীত হয়, যা রসুলের মহান দরবারে অনুমোদিত হয়। আরও বলা হয়েছেঃ-

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ

কতই না উত্তম হত, যদি তারা আল্লাহ ও রসুল যা দিয়েছেন, তা'তে সন্তুষ্ট হত। আর এ কথা বলতো, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট; তখন আল্লাহ মেহেরবাণী করবেন এবং তাঁর রসুলও দান করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, রসুল (আলাইহিস সালাম) দান করেন।

এসব আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি এ কথা বলে আমাদেরকে আল্লাহ রসুল ইজ্জত সম্মান দেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেন, তাহলে এরূপ বলা বিশুদ্ধ; কারণ কুরআনের আয়াতই তো তা' বলছে। কিন্তু এরূপ বক্তব্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্থ হবে, ওসব প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহর রাজ্যের প্রশাসক। প্রতিপালক আল্লাহ তাঁদেরকে দিয়েছেন, ওনারা আমাদেরকে দেন। নানাবিধ সংকট ও বিপদের সময় আল্লাহর ওলীগণ ও আম্বিয়ায়ে কিরামের কাছ হতে সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারটিও ঠিক এরূপ, যেরূপ অসুখ-বিসুখের সময় কিংবা মামলা-মুকাদ্দমার ক্ষেত্রে বাদশাহর প্রজাগণ ডাক্তার বা বিচারকদের দ্বারস্থ হয়ে সাহায্য প্রার্থী হয়ে থাকে। কুরআন বলছেঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

ওসব পাপী নিজেদের প্রতি অবিচার করে যদি (হে মাহবুব) আপনার কাছে

আসত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হত, আর,হে মাহবুব, আপনিও যদি তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতেন, তাহলে তারা আল্লাহকে তওবা গ্রহণকারী ও মেহেরবানরূপে পেত। সুবিখ্যাত 'ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী'তে 'কিতাবুল ইজ্জত এর 'বাবু আদাবে যিয়ারাতি কবরিন নবী' শীর্ষক অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "এখনও যদি কোন যিয়ারতকারী সেই রওযা পাকে উপস্থিত হয়, তার উক্ত আয়াতটি পাঠ করা চাই।" এতো গেল ইহজীবনের কথা। কবরে মুনকার-নকীর নামক ফিরিশ্তাদ্বয় মৃতব্যক্তির কাছে তিনটি প্রশ্ন রাখেন। এর প্রথমটি হলো-তোমার প্রতিপালক কে? উত্তরে বান্দা বলে "আল্লাহ"। এর পর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার ধর্ম কি?' উত্তরে বান্দা বলে 'ইসলাম'। এ প্রশ্ন দুটির মধ্যে 'ইসলামের' সবকিছুই এসে গেছে, কিন্তু মৃত ব্যক্তি এখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। বরং সবশেষে প্রশ্ন করা হবে,ঐ যে সবুজ গুম্বদ বিশিষ্ট রওযার অধিকারী মওলা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? যখন সুস্পষ্টভাবে মৃতব্যক্তির মুখ থেকে বের হবে-হ্যাঁ, আমি উনাকে চিনি, উনি হচ্ছেন আমার নবী মুহাম্মদ রসুলল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনই প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হবে। তার পরেই সেই রসুলের নামের বদৌলতে তার নাজাত হবে। কিয়ামতের সুবিশাল মাঠে মানুষ বিচলিত হয়ে তাদের সুপারিশকারীকে হন্যে হয়ে তালাশ করতে থাকবে। যখন হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর দ্বারস্থ হবে, তখন হিসাব-নিকাশ শুরু হবে; তা'ও হুযুরের সুপারিশের বদৌলতে। জানা গেল যে, প্রতিপালক আল্লাহর একান্ত ইচ্ছা যে, সমগ্র জগতব্যাপী হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর মুখাপেক্ষী থাকুক-এখানে,কবরে ও হাশরের ময়দানেও। এ জন্যই মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেনঃ- وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

তোমরা আল্লাহর কাছে যেতে মাধ্যম বা ওসীলার অন্বেষণ কর। অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গায় মুস্তাফা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর ওসীলার প্রয়োজন আছে।

এখানে যদি 'ওসীলা' বলতে সৎকার্যাবলীর ওসীলা বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের মত পাপী, অসৎ কর্ম সম্পাদনকারী, মুসলমানদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে, পাগল, আর যারা ঈমান আনার সাথে সাথেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়-তারা সবাই বে-ওসীলা থেকে যাবে। তাছাড়া সৎকার্যও হুযুর (আলাইহিস

সালাম) এর মাধ্যমে অর্জিত হবে। তাহলে বুঝা যায় যে, অন্তত পরোক্ষভাবে হুযুরের ওসীলার প্রয়োজন হচ্ছে। কাফিরগণও নবীর ওসীলার বিশ্বাসী ছিল। কুরআনেই আছেঃ-

وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

তারাও (পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মত) কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভের জন্য হুযুর (আলাইহিস সালাম) এর নামের ওসীলায় প্রার্থনা করত। মক্কা মুয়াজ্জমাও হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর ওসীলায় অপবিত্র প্রতিমা সমূহ থেকে পুত পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছে, তাঁরই মাধ্যমে 'কিব্লা' মনোনীত হয়েছে। কুরআন ঘোষণা করছেঃ-

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

অচিরেই আপনাকে সেই কিবলার দিকে মুখ ফিরানোর ব্যবস্থা করছি, যা' আপনি পছন্দ করেছেন। বরং হুযুর (আলাইহিস সালাম) মাধ্যমেই কুরআন 'কুরআন' নামে অভিহিত হয়েছে।

শয়তান যখন নবীগণের মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি মহা প্রতিপালক পর্যন্ত পৌছতে চায়, তখনই তার দিকে উল্কাপিণ্ড ছুঁড়ে মারা হয়। যদি মদীনার রাস্তা হয়ে যেত, কখনও তাকে মারা হত না। সে একই পরিণতি তাদেরও হবে, যারা বলেন, 'খোদাকে মান, খোদা ছাড়া আর কাউকে মান না।'

আমার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এতটুকু বোঝা গেল যে, নবী ও ওলীগণের কাছ হতে সাহায্য প্রার্থনা করা ও তাঁদেরকে হাজত পূরণকারী জ্ঞান করা শিরকও নয়, খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও নয়, বরং তা' হবে যথার্থ ইসলামী কানুনের অনুসরণ ও খোদার অভিপ্রায় অনুযায়ী চলন। জনাব, মেরাজে প্রথমতঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। পরে হযরত মুসা (আঃ) এর বারংবার আরয করার ফলে কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তই নির্ধারিত হয়। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, শেষ পর্যন্ত এটি হল কেন? এটা এজন্য যে, মাখলুক যেন জানতে পারে যে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে যে পাঁচ ওয়াক্তই নির্ধারিত হল, তা'তে হযরত মুসা (আঃ) এর হাত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর মকবুল বান্দা ওফাতের পরেও সাহায্য করেন। মুশরিকদের

প্রতিমা সমূহের কাছে থেকে সাহায্য প্রার্থনা পুরোপুরি 'শিরক'। এর কারণ দু'টি। প্রথমত তারা মূর্তিসমূহকে খোদায়ী প্রভাবের ধারক ও ঐগুলোকে ছোট খোদা জ্ঞান করেই ওদের কাছে থেকে সাহায্য চায়। এ জন্যই তারা সেগুলোকে 'উপাস্য' বা 'অংশীদার' বলে অভিহিত করে। অর্থাৎ এসব মূর্তিকে আল্লাহর বান্দা ও একই সাথে তাঁর অংশীদার বলে বিশ্বাস করে। যেমন-ঈসায়ীগণ হযরত ঈসা (আঃ) কে 'বান্দা' বলে বিশ্বাস করে বটে, তবে একই সাথে তাঁকে আল্লাহর পুত্র তিন খোদার একজন বা খোদ আল্লাহ বলে মনে করে। মুমিনগণ ওলী ও নবীগণকে কেবল 'বান্দা' জ্ঞান করেন। তাঁদেরকে এরূপ হাজত পূরণকারী হিসাবে জ্ঞান করেন, যেরূপ দেওবন্দীগণ ধনীদেরকে মাদ্রাসার শুভাকাঙ্খী ও সাহায্যকারী এবং ডাক্তার কিংবা শাসককে সরকার থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ প্রতিপালক আল্লাহ মূর্তিদেরকে ওসব ক্ষমতার অধিকার করেননি, তারা নিজেরাই ঐগুলোকে স্বাধিকার প্রাপ্ত মনে করেই সেগুলোর কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা করে। তাই তারা অপরাধী, বরং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী বান্দা। এ সম্পর্কে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত একটু আগেই পেশ করেছি। মুশরিকদের মূর্তির কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার সাথে মুমিনদের ওলী/নবীর কাছ হতে সাহায্য প্রার্থনার সুস্পষ্ট পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করেই শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) ফায়সালা করে দিয়েছেনঃ সাদৃশ্য প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, একজন মূর্তিপূজারী পাথরের দিকে সিজদা করে, সে মুশরিক; কারণ তার এ কাজটি হচ্ছে তার নিজস্ব উদ্ভাবন। পক্ষান্তরে, মুসলমান কা'বার দিকে সিজদা করে সেখানেও পাথর নির্মিত সৌধ রয়েছে। কিন্তু সে মুশরিক নয়, কারণ কা'বাকে সিজদা করা তার উদ্দেশ্য নয়। সে আসলে খোদাকেই সিজদা করছে, কাবাকে নয় বরং তাও খোদার আদেশনুযায়ী করা হচ্ছে। আর মুশরিক খোদার আদেশকে লঙ্ঘন করে পাথরকেই সিজদা করছে। এ পার্থক্যটুকু অনুধাবন করা প্রয়োজন। গঙ্গার জলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কুফর; কিন্তু যমযমের পানির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, গঙ্গাজলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিজস্ব উদ্ভাবন, আর যমযমের পানির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শরীয়তের নির্দেশ প্রসূত। এরূপ মন্দিরের পাথরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন শিরক। কিন্তু 'মকামে ইব্রাহীম' নামক পাথরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, অথচ সেটিও একটি পাথর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(আল্লাহর ওলীগণের কাছ হতে সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের বিবরণ)

এ বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বীগণ কর্তৃক কয়েকটি বহুল প্রচারিত আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে, যা' তারা সব জায়গায় উত্থাপিত করে থাকেন।

১নং আপত্তিঃ সুবিখ্যাত মিশকাত শরীফে 'বাবুল ইনযার ওয়াত তাহযীর' শীর্ষক অধ্যায়ে আছে, হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ لَا اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

(আমি তোমাকে সাহায্য করে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দিতে পারি না।) যখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা হযরত ফাতিমা যুহরার (রাঃ) উপকার সাধিত হচ্ছে না, এমতাবস্থায় অন্যান্যদের বেলায় তাঁর কীই বা করার আছে?

উত্তরঃ এ উক্তিটি ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকের ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ হাদীছের গূঢ়ার্থ হচ্ছে, হে ফাতিমা (রাঃ), তুমি যদি ঈমান না আন, তাহলে আমি খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তোমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারব না। হযরত নুহ (আঃ) এর পুত্রের ঘটনার কথা স্মরণ করুন। এ জন্যই তো এখানে 'মিনাল্লাহ' (আল্লাহর তরফ থেকে) কথাটি বলেছেন। মুসলমানগণকে তিনি সব জায়গায় সাহায্য করবেন। মহা প্রতিপালক ইরশাদ করেছেনঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ০

শেষ বিচারের দিন খোদা ভীরু লোক ব্যতীত সমস্ত বন্ধু-বান্ধব পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সেদিন বড় বড় পাপীদেরও (শরীয়তের পরিভাষায় যে সব পাপ কাজ 'কবীরাহ গুনাহ' বলে অভিহিত হয়, সে সব পাপ কর্ম সম্পাদনকারী) সুপারিশ করবেন; পতিতদেরকে রক্ষা করবেন। সুপ্রসিদ্ধ 'ফত্ওয়ায়ে শামী'গ্রন্থের 'বাবু গোসলিল মাইয়েতি' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযুর (আলাইহিসসালাতু ওয়াস সালাম) ইরশাদ করেছেন, শেষ বিচারের দিন আমার বংশের সাথে সম্পৃক্ততা ও আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়া অন্য সব আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আসলে হুযুর (আলাইহিস সালাম)

দেওবন্দীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবেন না। আমরা যেহেতু খোদার ফজলে মুসলমান, সেহেতু আমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

২নং আপত্তিঃ কুরআনে আছেঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ০

(আমরা তোমরাই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।) এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, ইবাদতের মত সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারটিও খোদার জন্য 'খাস'। খোদা ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত কারা যেমন 'শিরক', অন্য কারো কাছ হতে সাহায্য প্রার্থনা করাও তেমনি 'শিরক।'

উত্তরঃ এখানে সাহায্য বলতে যতার্থ প্রকৃত সাহায্যের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মূলতঃ তোমাকেই প্রকৃত সাহায্যকারী হিসেবে বিশ্বাস করি তোমার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি। এখন রইল বান্দার কাছ হতে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারটি। বান্দার কাছ হতে সাহায্য ভিক্ষা করা হয় তাঁদেরকে ফয়যে ইলাহী লাভের মাধ্যমরূপে বিশ্বাস করে। যেমন কুরআনে আছেঃ- اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম করার অধিকার নেই। অন্যত্র আছেঃ

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আসমান-যমীনে বা কিছু আছে, সবকিছু আল্লাহরই। তার পরেও আমরা শাসকবর্গের আদেশ মান্য করি, নিজেদের জিনিসের উপর মালিকানা দাবী করি। সুতরাং, বোঝা যায় যে, উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে হুকুম ও মালিকানা বলতে প্রকৃত হুকুম ও প্রকৃত মালিকানাকে বুঝানো হয়েছে। বান্দাদের হুকুম ও মালিকানা খোদা প্রদত্ত।

তাছাড়া আপনার উপস্থাপিত আয়াতে যে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে, এ দু' এর মধ্যে সম্পর্ক কি তা' নির্ণয় করুন। এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্কটুকু আছে,তা হচ্ছে, আল্লাহকে প্রকৃত সাহায্যের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করে সাহায্য প্রার্থনা করাও ইবাদতের একটি শাখা। মূর্তি পূজারীগণ মূর্তি-পূজার সময় সাহায্যের আবেদন সম্বলিত শব্দাবলীও উচ্চারণ করে থাকে। যেমন-"মা কালী,তোমার দোহাই ইত্যাদি। এ উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ আল্লাহকে প্রকৃত সাহায্যের উৎস জ্ঞান করার জন্য আয়াতে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা-কথা দু'টির একত্রে সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্যার্থ যদি এ হয়ে থাকে-খোদা ভিন্ন অন্য কারো কাছ হতে যে কোন ধরনের সাহায্য প্রার্থনা 'শিরক', তাহলে পৃথিবীর

বুকে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না, না সাহাবায়ে কিরাম, না কুরআন অনুযায়ী আমলকারী, না স্বয়ং ভিন্নমতাবলম্বীগণ। এর প্রমাণাদি আমি আগেই সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছি। এখনও মাদ্রাসার চাঁদার জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ভিক্ষা করা হয়। মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকে কবরস্থ হওয়া পর্যন্ত; এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত বান্দাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। ধাত্রীর সাহায্যে জন্মগ্রহণ করেছে, মাতা-পিতার সাহায্যে লালিত-পালিত হয়েছে, শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে। ধনীদের অনুকূল্যে জীবন অতিবাহিত করেছে, আত্মীয়-স্বজনদের তলকীনের ফলে (মৃত্যুর সময় কলেমা শাহাদতের তলকীন) ঈমান রক্ষা করে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছে। তারপর গোসলদাতা ও দর্জির সাহায্য নিয়ে যথাক্রমে গোসল করানো ও কাফন পরানো হচ্ছে। কবর খননকারীর সাহায্যে কবর খনন করা হচ্ছে, অপরাপর মুলমানদের সহায়তায় মাটির নিচে সমাহিত হচ্ছে। এরপর আবার আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যে তার রুহের উপর ছওয়াব রসানী করা হচ্ছে। আমরা কোন্ মুখে বলতে পারি যে, আমরা কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই? উক্ত আয়াতে তো বিশেষ কারো সাহায্য বা বিশেষ কোন সময়ের সাহায্যের কথা বুঝানোর জন্য বিশেষত্ব জ্ঞাপক কোন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়নি।

৩নং আপত্তিঃ মহা প্রতিপালক ইরশাদ করেছেনঃ-

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَانَصِيْرٍ ০

(তোমাদের একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই।) এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

উত্তরঃ এ আয়াতে আল্লাহর ওলীগণকে অস্বীকার করা হয়নি, বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি বা বস্তুর অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হয়েছে, যাদেরকে/যেগুলোকে কাফিরগণ নিজেদের সাহায্যকারী ও হিতসাধনকারীরূপে মেনে নিয়েছে অর্থাৎ এ আয়াতে প্রতিমা ও শয়তানদের কথা বলা হয়েছে, আল্লাহর ওলীদের কথা বলা হয়নি এখানে। আল্লাহর ওলী হচ্ছেন তিনি, যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সাহায্যকারী মনোনীত করেছেন। ব্রিটিশ আমলে ভাইসরয় লন্ডন থেকে মনোনীত হয়ে ভারত শাসন করতে আস্তেন। যদি কেউ নিজে অন্য কাউকে শাসক মনোনীত করে নিত, তাহলে সে অপরাধী বলে গণ্য হত। কারণ সম্রাটের নির্দেশ ছিল-সরকারী শাসকবর্গকে মেনে চল, নিজেদের মনোনীত

শাসকগণ থেকে দূরে থাক। এরূপ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-খোদার মনোনীত শাসকগণের দ্বারস্থ হও, নিজের গড়া তথাকথিত সাহায্যকারীদের থেকে দূরে থাকো। হযরত মুসা (আঃ) কে মহান প্রতিপালক নির্দেশ দিলেন। اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ফিরাউনের কাছে যান, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। হযরত মুসা (আ:) আরয করলেনঃ

وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هٰرُوْنَ اَخِى اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ

(মওলা, আমরা ভাই হারুন (আঃ) কে আমার উযীর মনোনীত করে আমার বাহুবল বাড়িয়ে দিন।) হযরত মুসা (আঃ) এর এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহাপ্রভু একথা বলেননি-আপনি আমি ছাড়া অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হচ্ছেন কেন? বরং তাঁর আবেদন মনজুর করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আওলিয়ার সাহায্য গ্রহণ নবীগণের অনুসৃতনীতি বা সুন্নাত।

৪নং আপত্তিঃ প্রসিদ্ধ 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের 'বাবুল মুরতাদ্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে 'কারামাতুল আউলিয়া' শিরোনামের বর্ণনায় আছেঃ- شَيْئًا لِلّٰهِ قِيْلَ يَكْفُرُهٗ আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দাও--এরূপ উক্তি কুফর। তাইঃ يَا عَبْدَ الْقَادِرْ جِيْلَانِىْ شَيْئًا لِلّٰهِ

হে আবদুল কাদির জ্বিলানী (রহঃ) আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দিন এরূপ বলাও কুফর।

উত্তরঃ-এখানে 'শাইয়ান লিল্লাহ' এর অর্থ হল, 'আল্লাহর অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে কিছু দাও, মহাপ্রভু তোমার মুখাপেক্ষী।' যেমন বলা হয়ে থাকে ইয়াতীমের জন্য কিছু দিন। এ ধরনের ভাব প্রকাশক কথা বাস্তবিকই কুফর। এ কথাটির ব্যাখ্যায় স্বনামধন্য আল্লামা শামী (রহঃ) বলেছেনঃ

اَمَّا اِنْ قَصَدَ الْمَعْنَى الصَّحِيْحَ فَالظَّاهِرُ اَنَّهٗ لَابَاسَ بِهٖ

যদি এ উক্তি দ্বারা এর বিশুদ্ধ মর্মার্থের নিয়ত থাকে আল্লাহর ওয়াস্তে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কিছু দিন, তাহলে এরূপ বলা জায়েয হবে বৈকি। আমাদের 'শাইয়ান লিল্লাহ' এর লক্ষ্যার্থও এটিই।

৫নং আপত্তিঃ এ আপত্তিটি উর্দু ভাষায় পদ্যাকারে উত্থাপিত হয়ে থাকেঃ

وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے
جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے

(খোদার কাছে পাওয়া যায় না এমন কি আছে, যা তোমরা আল্লাহর ওলীগণের কাছ থেকে ভিক্ষা করছ?)

উত্তরঃ এর উত্তরও উর্দু পদ্যাকারে দেয়া হলঃ

وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے
جسے تم مانگتے ہو اغنیاء سے
توسل کر نہیں سکتے خدا سے
اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

(আল্লাহর কাছে যা পাওয়া যায় না তা' হচ্ছে চাঁদা, যা' আপনারা ধনীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নেন। খোদাকে ওসীলারূপে গ্রহণ করতে পারি না; তাই এ ওসীলাই ওলীগণ থেকে ভিক্ষা করি।)

৬নং আপত্তিঃ 'খোদার বান্দা হয়ে অপরের কাছে কেন যাব? আমরা যেহেতু তারই বান্দা, তাঁর কাছ হতেই আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করা চাই আমাদের নানাবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।' (তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থ।)

উত্তরঃ আমরা খোদার বান্দা, তাঁরই হুকুমে তাঁর মনোনীত ও প্রিয় বান্দাদের শরনাপন্ন হই। কুরআনই আমাদেরকে তাঁদের কাছে পাঠাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করুন। আর খোদা তা'আলাই এ উদ্দেশ্যেই তো তাঁদেরকে পাঠাচ্ছেন। কি সুন্দর কথাই না বলা হয়েছে কবিতার এ চরণটিতেঃ

حاکم حکیم داد ودوادیں یہ کچھ نہ دیں
مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے

(বিচারক সুবিচার দিয়ে হিতসাধন করেন, হাকীম/ডাক্তার অষুধ দিয়ে সুস্থতা দান করেন; আর ওনারা কিছুই দেন না? ওহে মরদুদ! একথা কোন্ আয়াতে বা কোন্ হাদীছে বলা হয়েছে?

৭নং আপত্তিঃ কুরআন কাফিরদের কুফর সম্পর্কে এও উল্লেখ করেছে যে, এরা মৃতদের কাছ হতে সাহায্য চায়। ওরা মূর্তিদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছে বলেই মুশরিকে পরিণত হয়েছে। তাই আপনারাও ওলীগণ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেন বিধায় মুশরিক হয়ে গেছেন।

উত্তরঃ তা'হলে তো আপনারাও পুলিশ, ধনী ও শাসকের সাহায্য চান বিধায়

মুশরিক হয়ে গেছেন। ওলীগণের কাছ থেকে চাওয়া আর মূর্তির কাছ হতে চাওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে, সে প্রসঙ্গে আমি আগেই আলোকপাত করেছি। (সাহায্য প্রার্থনার যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ।

(আল্লাহ যা'র উপর অভিসম্পাত করেন, তাঁকে সাহায্য করার মত কাউকে পাবে না।) মুমিনদের উপর খোদার রহমত আছে, তাই মহাপ্রতিপালক তাঁদের জন্য অনেক সাহায্যকারী নিযুক্ত করেছেন।

৮নং আপত্তিঃ 'শরহে ফিক্‌হ আকবর' গ্রন্থে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবার প্রাক্কালে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হয়েও হযরত জিব্রাইল (আঃ) থেকে কোনরূপ সাহায্য চাননি। বরং বলেছেন, ওহে জিব্রাইল, আপনার কাছে আমার 'হাজত' নেই। যদি খোদা ভিন্ন অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া বৈধ হত, তা'হলে এহেন বিপদের সময়ও হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর নিকট তিনি সাহায্য চাননি কেন?

উত্তরঃ তখন ছিল পরীক্ষার সময়। আশংকা ছিল, কোন অভিযোগের কথা মুখ থেকে বের করলেই প্রতিপালক অসন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারেন। সে জন্য ঐ সময় তিনি আল্লাহর কাছেও কোন দু'আ করেননি; বরং তিনি বলেছিলেন, ওহে জিব্রাইল, আপনার কাছে আমার চাওয়ার মত কিছুই নেই; যার কাছে চাওয়ার আছে, তিনিই তো নিজেই ওয়াকিবহাল আছেন। যেমন, হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদত বরণের ভবিষ্যৎবাণী করলেন, কিন্তু তখন সেই মুসীবৎ থেকে তার পরিত্রাণ লাভের জন্য কেউ প্রার্থনা করলেন না-না মুস্তাফা (আলাইহিস সালাম), না হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) এমনকি হযরত ফাতিমা যুহরাও (রাঃ) না।

৯নং আপত্তিঃ জীবিতদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া জায়েয, কিন্তু মৃতদের কাছ থেকে জায়েয নয়। কেননা, জীবিতদের মধ্যে সাহায্য করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু মৃতের সে ক্ষমতা নেই, 'অতএব তা' শির্‌ক।

উত্তরঃ কুরআনে আছেঃ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

(আমরা তো'মা থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করি।) এখানে জীবিত ও মৃতের

পার্থক্য কোথায়? তাহলে কি জীবিতের ইবাদত জায়েয আর মৃতের ইবাদত করা না জায়েয? খোদা ভিন্ন অন্য কারো জীবিত হোক বা মৃত হোক,ইবাদত যেরূপ নিঃশর্তভাবে শির্‌ক, তদ্রুপ সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারও শর্তহীনভাবে শির্‌ক হওয়া চাই।

হযরত মুসা (আঃ) তাঁর ওফাতের আড়াই হাজার বছর পর উম্মতে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এতটুকু সাহায্য করেছেন যে, মিরাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের স্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই নির্ধারণ করিয়েছেন। মহাপ্রতিপালক জানতেন যে, পাঁচবার নামাযই ধার্য হবে, কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীনের অবদানের উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য পঞ্চাশবার নামায নির্ধারণ করেন। আল্লাহর ওলীদের কাছ হতে সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারটি যারা অস্বীকার করেন, তাঁদের উচিত দিনে পঞ্চাশবার নামায পড়া। কারণ পাঁচবার নামায ধার্যকরণের ক্ষেত্রে খোদা ভিন্ন অন্যের সাহায্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কুরআন করীমতো ইরশাদ করছে, আল্লাহর ওলীগণ জীবিত, তাঁদেরকে মৃত বল না ও মৃত মনে কর না।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۔ (আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত বল না, তাঁরা বরং জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।) যেহেতু ওলীগণ জীবিত, সেহেতু তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনাও বৈধ হবে। কেউ কেউ আবার বলেন, আয়াতে উল্লেখিত বক্তব্য ওসব শহীদের বেলায় প্রযোজ্য, যাঁরা খোদার রাস্তায় তরবারীর আঘাতে নিহত হন। কিন্তুএরূপ উক্তি অহেতুক বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, আয়াতের মধ্যে লৌহনির্মিত তরবারীর উল্লেখ নেই। সুতরাং, যাঁরা ইশকে ইলাহীর তরবারীতে নিহত হয়েছে তাঁরাও শহীদের অন্তর্ভুক্ত (তাফসীরে 'রুহুল বয়ান' দ্রষ্টব্য)। এ জন্য হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, যে পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে; যে স্ত্রী প্রসবকালে মারা যাবে; বিদ্যান্বেষী, মুসাফির প্রভৃতি সবাই শহীদ বলে গণ্য হবে। আর যদি কেবল তরবারী দ্বারা নিহত ব্যক্তিই শহীদ তথা জীবিত হন এবং বাকী সব মৃত হন, তাহলে নবী করীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ও হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) কেও 'মাআযাল্লাহ' অবশ্যম্ভাবীরূপে মৃত মানতে হবে। অথচ সর্বসম্মত আকীদা হচ্ছে তাঁরা পরিপূর্ণ জীবনের বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবিত আছেন। এ ছাড়া জীবিত ও মৃতদের কাছ হতে সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে সাহায্য প্রার্থনার স্বীকৃতি জ্ঞাপক

প্রমাণাদির বর্ণনায় আগেই বলেছি, হযরত ইমাম গায্যালী (রঃ) বলেছেনঃ যার কাছে জীবিতাবস্থায় সাহায্য চাওয়া যায়, ওফাতের পরেও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে। এর আরও কিছু বিশ্লেষণ করা হবে ইনশাল্লাহ 'তবাররুকাত চুম্বন' ও 'কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর' প্রসঙ্গের অবতারণায়।

তাফসীরে সা'বীতে সুরা কসস' এর শেষের আয়াতঃ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ এর তাফসীরে আছেঃ

وَحِيْنَئِذٍ فَلَيْسَ فِى الْاٰيَةِ دَلِيْلٌ عَلٰى مَا زَعَمَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ اَنَّ الطَّلَبَ مِنَ الْغَيْرِ حَيًّا اَوْمَيِّتًا شِرْكٌ فَاِنَّهُ جَهْلٌ مُرَكَّبٌ لِاَنَّ سُوَالَ الْغَيْرِ مِنْ اَجْزَاءِ اللّٰهِ النَّفْعَ اوالضَّرَّ عَلٰى يَدِه قَدْيَكُوْنُ وَاجِبًا لِاَنَّهُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْاَسْبَابِ وَلَايُنْكِرُ الْاَسْبَابَ اِلَّاجُحُوْدًا اَوْجَهُوْلًا.

এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'পূজা কর না।' সুতরাং, আয়াতে সেই খারেজীদের বদ্ধ মূল ধারণার অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই-যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, খোদা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হোক না সে জীবিত বা মৃত, সাহায্য চাওয়া 'শিরক'। খারেজীদের এ বাজে প্রলাপ তাদের অজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। কেননা, খোদা ছাড়া অন্য কারো কাছ হতে এ মর্মে সাহায্য প্রার্থনা করা যে, প্রতিপালক তার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থীর কোন উপকার বা অপকার করবেন, কোন সময় অত্যাবশ্যকীয় বা 'ওয়াজিব' হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এরূপ সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক উপকরণসমূহই তলব করা হয়ে থাকে। এ উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা একমাত্র অজ্ঞ ও কট্টর অস্বীকারকারী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবে না।এ ইবারত থেকে তিনটি বিষয় জানা গেল। (১) খোদা ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া শুধু যে জায়েয তা নয় বরং কখনও তা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। (২) মকসুদ হাসিলের সহায়ক উপকরণসমূহ তালাশ করার প্রয়োজনীয়তা খারেজী মতাবলম্বীরাই অস্বীকার করে। (৩) لَاتَدْعُ 'লাতাদউ' শব্দ দ্বারা পূজা করার অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হয়েছে, কাউকে আহবান করা বা কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়নি উক্ত আয়াতে।

১০ নং আপত্তিঃ বুজুর্গানে দ্বীনকে দেখা যায়, তাঁরা বার্ধক্যে উপনীত হলে বার্ধক্যজনিত কারণে চলাফেরা করতে পারেন না; আর ওফাতের পরতো অবশ্যই হাত-পা বিহীন হয়ে যাবেন। তাই এরূপ দুর্বল ব্যক্তিদের কাছ হতে প্রার্থনা করা মূর্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়ার মতই অর্থহীন। প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা এর অক্ষমতাই পরিস্ফুট করেছেনঃঃ-

وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّايَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ

(মাছি যদি ওদের থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তাহলে মাছির কাছ থেকেও

তা পুনরুদ্ধার করতে পারে না।) এ ওলীগণও তাঁদের কবরের উপর থেকে মাছিকেও তাড়াতে পারেন না। এমতাবস্থায় আমাদের কীই বা সাহায্য করবেন?

উত্তরঃ বুড়ো বয়সে মাটির শরীরে ওসব দুর্বলতা এজন্যই দেখা যায় যে, রুহের সাথে এর সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। রুহের মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতা নেই, বরং ওফাতের পর রুহের শক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কবরের ভিতর থেকে বাহিরের সবাইকে দেখতে পান, পায়ের আওয়াজ শুনতে পান। বিশেষ করে নবীগণের রূহ সমূহের বেলায় এ গুণাবলী আরও ব্যাপক আকারে প্রযোজ্য। প্রতিপালক বলছেনঃ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى -

আপনার জীবনের পূর্ববর্তী মুহূর্তগুলোর তুলনায় পরবর্তী মুহূর্তগুলো অধিকতর উত্তম। এ যে সাহায্য চাওয়া হয়, তা' ওলীর রূহ থেকে চাওয়া হয়, তার পার্থিব শরীর থেকে নয়। কাফিরগণ যাদের কাছ হতে সাহায্য চাওয়া চায়, ওদের রূহানী শক্তি বলতে কিছুই নেই। অধিকন্তু তারা পাথরগুলোকেই তাদের সাহায্যকারী বলে বিশ্বাস করে, যা'র রূহ বলতে কিছুই নেই

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' ১০ম পারার আয়াত-يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে হযরত খালিদ (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) বিষ পান করেছিলেন। হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) খায়বরে বিষ পান করেছিলেন। কিন্তু শুধু ওফাতের সময়ই বিষের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল। এর কারণ হল, তাঁরা 'মকামে হাকীকাতে' (প্রকৃত সত্বার স্তর) থেকেই বিষ পান করেছিলেন; 'হাকীকতের উপর বিষের প্রতিক্রিয়া হয়না। আর ওফাতের সময় মানবীয় প্রকৃতিই বিকশিত ছিল, কারণ মানবীয় প্রকৃতির সাথেই মৃত্যুর সম্পর্ক। তাই, ওফাতের সময় বিষক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল। আর এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবরে মাছি কেন, সমগ্র পৃথিবীকে উলটিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সে দিকে মনোযোগ নেই। কাবা ঘরে তিনশ' বছর যাবৎ মূর্তি বিদ্যমান ছিল, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা এগুলির অপসারণ করেন নি। তিনিও কি এত দুর্বল ছিলেন যে নিজের ঘর থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করতে পারলেন না? আল্লাহ ওদের মধ্যে শুভবুদ্ধি উদয় করুন-এই কামনা করি।

১১নং আপত্তিঃ হযরত আলী (রাঃ) ও ইমাম হুসাইনের (রাঃ) যদি কোন ক্ষমতা থাকত,তাহলে তাঁরা নিজেরাই কেন দুশমনের হাতে শহীদ হলেন? ওনারা যখন নিজেদের বিপদ দূর করতে পারেননি, তখন আপনাদের বিপদাপদ কিরূপে দূরীভূত করবেন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "ওদের কাছ থেকে মাছি কিছু ছিনিয়ে নিলে ওরা মাছির কাছ থেকে তা পুনরুদ্ধার করতে পারে না।"

উত্তরঃ তাঁদের বিপদ নিবারণের ক্ষমতা ছিল,কিন্তু তা'প্রয়োগ করেননি। কারণ আল্লাহর মর্জি ছিল সেরূপ। হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠি ফিরাউনকে গিলে

ফেলতে পারত, কিন্তু সে উদ্দেশ্যে লাঠি ব্যবহার করেননি। হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এরও এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, কারবালা প্রান্তরে ফোরাত নদীর নয়, হাউজে কাউছরের পানিও আনয়ন করতে পারতেন। কিন্তু তা' না করে খোদার ইচ্ছাতেই রাযী ছিলেন। দেখুন রমজানের সময় আমাদের কাছে পানি থাকে, কিন্তু খোদার নির্দেশের কারণে দিনের বেলায় তা পান করি না। আর মূর্তিদের বেলায় কোনরূপ ক্ষমতার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং, উক্ত আয়াতটিকে নবী ও ওলীগণের ব্যাপারে প্রয়োগ করাটাই ধর্মহীনতা। তা কেবল মূর্তিসমূহের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশ সমাপ্ত।